# শব্‌নম

সৈয়দ মুজতবা আলী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ : মাঘ, ১৩৬৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৮৯
তৃতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ১৯৯৪
চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট, ২০০০

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
আর্কটিক প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
১বি, রামকৃষ্ণ দাস লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : খালেদ চৌধুরী

বাদশা আমান্নুল্লার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। না হলে আফগানিস্থানের মত বিদকুটে গোঁড়া দেশে বল্-ডান্সের ব্যবস্থা করতে যাবেন কেন? স্বাধীনতা দিবসে পাগমান শহরে আফগানিস্থানের প্রথম বল্-ডান্স হবে।

আমরা যারা বিদেশী তারা এ নিয়ে খুব উত্তেজিত হই নি। উত্তেজনাটা মোল্লাদের এবং তাদের চেলা অর্থাৎ ভিশ্‌তী, দর্জী, মুদী, চাকর-বাকরদের ভিতর।

আমার ভৃত্য আব্দুর রহ্‌মান সকালবেলা চা দেবার সময় বিড়বিড় করে বললে, 'জাত ধম্মো আর কিছু রইল না।'

আব্দুর রহ্‌মানের কথায় আমি বড় একটা কান দিই নে। আমি শ্রীকৃষ্ণ নই; 'জাত ধম্মো' বাঁচাবার ভার আমার স্কন্ধে নয়।

'ধেড়ে ধেড়ে হনোরা ডপ্‌কি ডপ্‌কি মেনীদের গলা জড়িয়ে ধেই ধেই করে নৃত্য করবে।'

আমি শুধালুম, 'কোথায়? সিনেমায়?'

আর আব্দুর রহ্‌মানকে পায় কে? সে তখন সেই হবু ডান্সের যা একখানা সরেস রগরগে বয়ান ছাড়লে, তার সামনে রোমান কুকর্ম কুকীর্তি শিশু। শেষটায় বললে, 'রাত বারোটার সময় সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপর কি হয় সে-সব আমি জানি নে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার তাতে কি, ভেটকি-লোচন?'

আব্দুর রহ্‌মান চুপ করে গেল। 'ভেটকি-লোচন', 'ওরে আমার আহ্লাদের ফুটো ঘটি' এসব বললেই আব্দুর রহ্‌মান বুঝতে পারত বাবু বদমেজাজে আছেন। এগুলো আমি মাতৃভাষা বাংলাতেই বলতুম। আব্দুর রহ্‌মান বাঘু লোক; বাংলা না বুঝেও বুঝত।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার সময় বেরিয়েছি। পাগমানের ঝোপে ঝাপে হেথা হোথা বিজলি বাতি জ্বলছে। পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে পিচ-ঢালা রাস্তা। আমি আপন মনে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, এটা হল ভাদ্দোর মাস। কাল জন্মাষ্টমী গেছে। আমার জন্মদিন। মা'র মুখে শোনা। এখন সিলেটে নিশ্চয়ই জোর বৃষ্টি হচ্ছে। মা দক্ষিণের ঘরের উত্তরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসে আছে।

তার কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে চম্পা তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর হয়তো বা জপ করছে, 'ছোট মিয়া ফিরবে কবে ?'

দেশে বর্ষাকাল আবার কাল। কাবুল কান্দাহার জেরুজালেম বার্লিন কোথাও মনস্থন নেই। ভাদ্দোর মাসের পচা বিষ্টিতে মা অস্থির। তাঁর নাইবার শাড়ি শুকোচ্ছে না, ভিজে কাঠের ধুঁয়োয় তিনি পাগল, আর আমি দেখছি হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে আসছে, খানিকক্ষণ পরে আবার রোদ। আঙিনায় গোলাপ গাছে, রান্নাঘরের কোণে শিউলি গাছে, পিছনের চাউর গাছের পাতায় পাতায় কী খুশির ঝিলিমিলি।

এখানে সে শ্যামল-সুন্দরের দর্শন নেই।

সর্বনাশ। পথ হারিয়ে বসেছি। রাত ন-টা। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। কাকে পথ শুধোই।

ডান দিকে ঢাউস ইমারতে নাচের ব্যাণ্ডো বাজছে।

ওঃ। এটা তাহলে আমার ভৃত্য আব্দুর রহমান খান বর্ণিত সেই ডান্স-হল। এ বাড়ির খানসামা-বেয়ারা তা হলে আমাকে হোটেলের পথটা বাতলে দিতে পারবে। পিছনের চাকর-বাকরদের দরজার কাছে যাই।

গেলুম।

এমন সময় গটগট করে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী।

প্রথম দেখেছিলুম কপালটি। যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র। শুধু, চাঁদ হয় চাঁপা বর্ণের, এর কপালটি একদম পাগমান পাহাড়ের বরফের মতই ধবধবে সাদা। সেটি আপনি দেখেন নি ? অতএব বলব, নির্জলা দুধের মত। সেও তো আপনি দেখেন নি। তা হলে বলি, বন-মল্লিকার পাপড়ির মত। ওর তুলনা এখনও হয় নি।

নাকটি যেন ছোট বাঁশী। ওইটুকুন বাঁশীতে কি করে ফুটো ফুটো হয় জানি নে। নাকের ডগা আবার অল্প অল্প কাঁপছে। গাল দুটি কাবুলেরই পাকা আপেলের মত লাল টুকটুকে, তবে তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রঙ দিয়ে তৈরী নয়। চোখ দুটি নীল না সবুজ বুঝতে পারলুম না। পরনে উত্তম কাটের গাউন। জুতো উঁচু হিলের।

রাজেশ্বরী কণ্ঠে হুকুম হাড়লে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খানের মোটর এদিকে ডাক তো।'

আমি থতমত খেয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলুম।

মেয়েটি ততক্ষণে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে আমি হোটেলের চাকর নই। তারপর বুঝেছে, আমি বিদেশী। প্রথমটায় ফরাসীতে বললে, 'জ্য তু দমাঁদ্ পার্দোঁ, মঁসিয়ো—মাপ করবেন—' তারপর বললে ফার্সীতে।

আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফার্সীতেই বললুম, 'আমি দেখছি।'

সে বললে, 'চলুন।'

বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। বয়স এই আঠারো উনিশ।

পার্কিঙের জায়গায় পৌঁছনর পূর্বেই বললে, 'না, আমাদের গাড়ি নেই।'

আমি বললুম, 'দেখি, অন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না।'

নাসিকাটি ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে মুখ বেঁকিয়ে অত্যন্ত গাঁইয়া ফার্সীতে বললে, 'সব ব্যাটা আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে বেলাল্লাপনা দেখছে। ড্রাইভার পাবেন কোথায়?'

আমার মুখ থেকে অজানতে বেরিয়ে গেল, 'কিসের বেলাল্লাপনা?'

মেয়েটি ঘুরে আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে এক লহমায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিলে। তারপর বললে, 'আপনার কোনও তাড়া না থাকলে চলুন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।'

আমি 'নিশ্চয় নিশ্চয়' বলে সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম।

মেয়েটি সত্যি ভারি চটপটে।

চট করে শুধালে, 'আপনি এদেশে কতদিন আছেন?—পার্দোঁ—আমার ফ্রেঞ্চ প্রফেসর বলেছেন, অজানা লোককে প্রশ্ন শুধাতে নেই?'

আমি বললুম, 'আমারও তাই। কিন্তু আমি মানি নে।'

বোঁ করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'একজাক্‌ৎমঁ। একদম খাঁটি কথা। আপনার সঙ্গে চলছি, কিংবা মনে করুন আমার আব্বা-জান আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, আর আপনি আমায় কোন প্রশ্ন শুধালেন না, যেন আমি সাপ-ব্যাঙ কিছুই নই, আমিও শুধালুম না, যেন আপনার বাড়ি নেই, দেশ নেই। আমাদের দেশে তো জিজ্ঞাসাবাদ না করাটাই সখৎ বেয়াদবী।'

আমি বললুম, 'আমার দেশেও তাই।'

ঝপ্ করে জিজ্ঞেস করে বসলে, 'কোন্ দেশ?'

আমি বললুম, 'আমাকে দেখেই তো চেনা যায় আমি হিন্দুস্থানী।'

বললে, 'বা রে। হিন্দুস্থানীরা তো ফ্রেঞ্চ বলতে পারে না।'

আমি বললুম, 'কাবুলীরা বুঝি ফ্রেঞ্চ বলে।'

মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে গিয়ে হঠাৎ যেন পা মচকে বসল। বললে, 'আমি আর হাঁটতে পারছি নে। উঁচু-হিল জুতো পরা আমার অভ্যাস নেই। চলুন, ওই পাশের টেনিস কোর্টে যাই। সেখানে বেঞ্চি আছে।'

জমজমাট অন্ধকার। ওই দূরে, সেই দূরে বিজলি-বাতি। সামান্য এক-ফালি পথ দিয়ে টেনিস কোর্টের দিকে এগুতে হল। একটু অসাবধান হওয়ায় তার বাহুতে আমার বাহু ঠেকে যাওয়াতে আমি বললুম, 'পার্দোঁ—মাফ করুন।'

মেয়েটির হাসির অন্ত নেই। বললে, 'আপনার ফ্রেঞ্চ অদ্ভুত, আপনার ফার্সীও অদ্ভুত।'

আমার বয়স কম। লাগল। বললুম, 'মাদমোয়াজেল—'

'আমার নাম শব্‌নম।'

তদ্দণ্ডেই আমার দুঃখ কেটে গেল। এ রকম মিষ্টি নামওয়ালী মেয়ে যা-খুশি বলার হক ধরে।

বেঞ্চিতে বসে হেলান দিয়ে পা দুখানা একেবারে হিন্দুকুশ পাহাড় ছাড়িয়ে কাতাখান্‌-বদখ্‌শান্‌ অবধি লম্বা করে দিয়ে বাঁ পা দিয়ে হুট্‌স্‌ করে ডান জুতো এক লাথে তাশকন্দ অবধি ছুঁড়ে মেরে বললে, 'বাঁচলুম।'

আমি বললুম, 'আমার উচ্চারণ খারাপ সে আমি জানি। কিন্তু ওটা বলে মানুষকে দুঃখ দেন কেন?'

চড়াক্‌সে একদম খাড়া হয়ে বসে. মোড় নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বললে, 'আশ্চর্য। কে বললে আপনার উচ্চারণ খারাপ। আমি বলেছি 'অদ্ভুত'। অদ্ভুত মানে খারাপ? আপনার ফার্সী উচ্চারণে কেমন যেন পুরনো আতরের গন্ধ। দাঁড়ান, বলছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠাকুরমা সিন্দুক খুললে যে রকম পুরনো দিনের জমানো মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। অন্য হিন্দুস্থানীরা কি রকম যেন ভোঁতা ভোঁতা ফার্সী বলে।'

আমি বললুম, 'ওরা তো সব পাঞ্জাবী। আমি বাঙলাদেশের লোক।'

এবারে মেয়েটি প্রথমটায় একেবারে বাক্যহারা। তার পর বললে, 'বা-ঙ্গা-লা মুল্লুক! সেখানে তো শুনেছি পৃথিবীর শেষ। তার পর নাকি এক বিরাট অতল গর্ত। যতদূর দেখা যায়, কিছু নেই, কিছু নেই। সেখানে তাই রেলিঙ লাগানো আছে। পাছে কেউ পড়ে যায়। বাঙালীরাও নাকি তাই বাড়ি থেকে বেরয় না।'

আমি জানতুম, ভারতবর্ষে যে-সব কাবুলী যায় তারা বাঙলা-দেশের পরে ব
কোথাও একটা যায় নি। এ সব গল্প নিশ্চয়ই তারা ছড়িয়েছে। আমি হেে
বললুম, 'কি বললেন ? বাঙালীরা তাই বাড়ি থেকে বেরয় না ? যেমন আমি
না ?'

এই প্রথম মেয়েটি একটু কাতর হল। বললে, 'দেখুন, মঁসিয়ো— ?'

আমি বললুম, 'আমার নাম মজনূন।'

'মজনূন !!!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'মজনূন মানে তো পাগল। জিন্ যখন কারো কাঁধে চাপে তখন 'জিন্' শব্দে
পাস্‌ট্ পার্টিসিপ্‌ল্ মজনূন দিয়েই তো পাগল বোঝানো হয়। এ নাম আপনাকে
দিলে কে ?'

আমি বললুম, 'আমার বাবার মুরশীদ। দেখুন শব্‌নম বানু, সকলেরই বি
আপনার মত মিষ্টি নাম হয়। শব্‌নম মানে তো শিশিরবিন্দু, হিমকণা ?'

'খুব ভোরে আমার জন্ম হয়েছিল।'

আমি গুনগুন করে বললুম,

"আমি তব সাথী
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির সিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদ বেদনা।"

'বুঝিয়ে বলুন।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। কি
বলছেন, শরৎ-নিশি সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখেছে শিউলি ফোটাবার—আর ভোর হতেই
গাছকে বিচ্ছেদ-বেদনা দিয়ে ঝরে পড়ল সেই শিউলি।'

শব নমের কবিত্ব-রস আছে। বললে, 'চমৎকার! একটি ফুল সমস্ত রাতে
স্বপ্ন। আচ্ছা, আমার নাম যদি শব্‌নম শিউলি হয় তো কি রকম শোনায় ?'

আমি বললুম, 'সে আপনি ধারণাই করতে পারবেন না, বাঙালীর কানে
কতখানি মিষ্টি শোনায়।'

হেসে বললে, 'ফুল সম্বন্ধে কবি কিসাঈ কি বলেছেন জানেন ?'

'আমি হাফিজ, সাদী আর অল্প রুমী পড়েছি মাত্র।'

'তবে শুনুন,

"গুল্ নিমতীস্ত্ হিদ্‌য়া কিরিস্তাদে মাজ্ বেহেশৎ,

'মরহুম্ করীম্ তর্ শওদ্ আন্দর্ নইম্-ই-গুল্ ;
আর গুল্-করূশ গুল্ চি করূশী বরায়ে সীম ?
ওয়া আজ্ গুল্ অজীজ্ তর চি সিতানী বি-সীম-ই-গুল ?"

'অমরাবতীর সওগাত এই ফুল এল ধরাতলে,
ফুলের পুণ্যে পাপী-তাপী লাগি স্বরগের দ্বার খোলে।
ওগো ফুলওয়ালী, কেন ফুল বেচো তুচ্ছ রূপার দ'রে ?
প্রিয়তর তুমি কি কিনিবে, বলো, রূপো দিয়ে তার তরে ?'

আমি বললুম, 'অদ্ভুত সুন্দর কবিতা। এটি আমার বাঙলাতে অনুবাদ করতে হবে।'

'আপনি বুঝি ছন্দ গাঁথতে জানেন ?'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ। আমি মাস্টারি করি।'

'সে আমি জানি। এদেশে দু'রকমের ভারতীয় আসে। হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, না হয় পড়াতে। তবে আপনাকে এর পূর্বে আমি কখনও দেখি নি। আচ্ছা, বলুন তো, আমানউল্লা বাদশার সব রকম সংস্কারকর্ম আপনার কি রকম লাগে ?'

'আমার লাগা-না-লাগাতে কি ? আমি তো বিদেশী।'

'বিদেশী হলেও প্রতিবেশী তো। আমি ফ্রান্স থেকে ফেরার সময়—'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'ফ্রান্স থেকে—'

'ইংরেজের কল্যাণে বাবাকে নির্বাসনে যেতে হয়। আমার জন্ম প্যারিসে। সেখানে দশ বছর আর এখানে ন' বছর কাটিয়েছি। যাক্ গে সে-কথা। দেশে ফেরার সময় বোম্বাই পেশাওয়ার হয়ে আসি। দাঁড়ান, ভেবে বলছি। ঠিক এই আগস্টেই আমরা এসেছিলুম। সে কী বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বোম্বাই থেকে লাহোর পর্যন্ত। ঝপ্ ঝপ্ ঝুপ্ ঝাপ। গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিলে গিয়ে চমৎকার শোনায়। তা সে যাকগে। কিন্তু ওই বোম্বাই থেকে এই পেশাওয়ার—এর সঙ্গে তো আমাদের কোনো মিল নেই। মিল আফগানিস্থানের সঙ্গে। দুটোই সুন্দর দেশ। আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইরানী কবি কি বলেছেন, জানেন ?'

'হাফিজ যেন কি বলেছেন ?'

'না। আলীকুলী সলীম। বলেছেন:

"নীস্ত্ দর্ ইরান জমীন্ সামান-ই তহসীল কামাল

তা নিয়ামদ্ দু-ই হিন্দুস্তান হিনা রঙ্গীন্ ন্ শুদ্।"

'পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা ইরান দেশের ছুঁয়ে,
মেহ্দির পাতা কড়া লাল হয় ভারতের মাটি ছুঁয়ে।'

আমি শুধালুম, 'এদেশের হেনাতে কি কড়া রঙ হয় না?'

'বাজে। ফিকে। হলদে।'

আমি বললুম, 'আপনি কথায় কথায় এত কবিতা বলতে পারেন কি করে?'

হেসে বললে, 'বাবা আওড়ান। আর ন' দশ বছরেও আমার আত্মসম্মানটি ছিল অত্যুগ্র। প্যারিসে ক্লাসে ফরাসী কবিতা কেউ আওড়ালে আ সঙ্গে সঙ্গে ফার্সী শুনিয়ে দিতুম।'

তারপর বললে, 'বড় রাস্তায় তো জন-মানব নেই। শুধু মনে হচ্ছে একখা মোটর বার বার আসা-যাওয়া করছে। নয় কি? আপনি লক্ষ্য করেছেন?'

আমি বললুম, 'বোধ হয় তাই।'

বললে, 'তবে আমাকে বলেন নি কেন?'

আমি এক-মাথা লজ্জা পেয়ে বললুম, 'আমার ভালো লাগছিল বলে।'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

আমি শুধালুম, 'ওটা কি আপনাদের গাড়ি? আপনাকে খুঁজছে?'

'উঁ।'

'তবে চলুন।'

'না।'

'আচ্ছা। কিন্তু আপনার বাড়ির লোক আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না?'

'তবে চলুন।' উঠে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'শব্নম বানু, আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'তওবা! আপনাকে ভুল বুঝব কেন?'

রাস্তায় যেতে যেতে বেশ কিছু পরে সেই কথার খেই ধরে বললে, 'বিদেশী সঙ্গে আলাপ করতে ওই তো আনন্দ। তার সম্বন্ধে কিছু জানি নে। সে কিছু জানে না। সেই যে কবিতা আছে,

"মা আজ্ আগাজ্ ওয়া আন্জামে জাহান্ বে-খবরীম্
আওওল ও আখির-ই ঈন কুহ্নে কিতাব ইফ্তাদে অস্ৎ।"

'গোড়া আর শেষ এই ক্ষুদ্র জানা আছে, বলো, কার ?
প্রাচীন এ পুঁথি গোড়া আর শেষে পাতা কটি ঝরা তার।'

এমন সময় এই অজন্মে আলোওলা পোড়ারমুখো মোটর এসে সামনে দাঁড়াল। শব্‌নম বানু বললে, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।'

এতক্ষণ দুজনাতে বেশ কথাবার্তা হচ্ছিল। এখন ওই ড্রাইভারের সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। প্যারিস থেকে এসে থাক, আর খাস কাবুলওলীই হোক, এরা যে কট্টর গোঁড়া সে কি কারও অজানা ? বললুম, 'থাক্। আমার হোটেল কাছেই।'

শব্‌নম বানু বুদ্ধিমতী। বললে, 'বেশ। তবে, দেখুন আগা, আপনি কোন কারণে কণামাত্র সঙ্কোচ করবেন না। আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

পরোয়া শব্দটি আসলে ফার্সী। শব্‌নম ওই শব্দটিই ব্যবহার করেছিল।

'আদাব আরজ।'

'খুদা হাফিজ।'

হোটেলে ঢোকবার সময় পিছনে শব্দ হওয়াতে তাকিয়ে দেখি, আব্দুর রহ্‌মান। নিজের থেকেই বললে, 'একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম !'

আমি তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলুম ইনি একটি হস্তীমূর্খ না মর্কটচূড়ামণি ?

সমস্ত রাত ঘুম এল না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আদম-সুরৎ—কালপুরুষ। অতি প্রসন্ন বদনে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আকাশের পরিপূর্ণ শান্তি যেন তাঁর অঙ্গের প্রতিটি তারায় সঞ্চিত করে আমার দিকে বিচ্ছুরিত করে পাঠাচ্ছেন।

একটি ফার্সী-কবিতা মনে পড়ল।

ইরানের এক সভাকবি নাকি চাঁড়ালদের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মদ্যপান করেছিলেন। রাজা তাই নিয়ে অনুযোগ করাতে তিনি বলেছিলেন,

'হাজার যোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ওই তারা
গোষ্পদে হ'ল প্রতিবিম্বিত ; তাই হ'ল মানহারা ?'

শেষরাত্রে কালো মেঘ এসে আকাশের তারা একটি একটি করে নিবিয়ে দিতে লাগল। আমার মন অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠতে লাগল। বিবেকানন্দ ইংরিজী

কবিতায় লিখেছিলেন, 'দি স্টার্‌স্‌ আর্‌ ব্লাটড্‌ আউট।' সত্যেন দত্ত অনুবাদ করেছেন 'নিঃশেষে নিবেছে তারাদল।' কেমন যেন, কি-হবে কি-হবে একটা ভাব মনকে আচ্ছন্ন করে দিল।

শেষ রাত্রে নামল খাঁটি সিলেটি বৃষ্টি।

প্রসন্নাস্ত, প্রসন্নাস্ত আমার অন্ত সন্ধ্যার সবিতার!

খুদাতালা বেহদ মেহেরবান। আমার শেষ মনস্কামনা পূর্ণ করে দিলেন। কী মূর্খ আমি! আমার প্রত্যাশা যে করুণাময়ের অফুরন্ত দান ছাড়িয়ে যেতে পারে, এ-দম্ভ আমি করেছিলুম কোন গবেটামিতে?

## ॥ দুই ॥

ঘুম-ভাঙা-ঘুম-লাগা কল্পনা-স্বপ্নে-জড়ানো রাতের শেষ হল সূর্যোদয়ের অনেক পর। কাল রাত্রে তো পারিই নি, আজ সকালেও বুঝতে পারলুম না, কাল রাত্রে কি হয়ে গেল। এ কি আরম্ভ, না এই শেষ! এ কি অন্ধকার রাত্রে চন্দ্রোদয়ের মত আমার ভুবন প্রসারিত করে দেবে, না এ হঠাৎ চমক-মারা বিদ্যুল্লেখা শুধু ক্ষণেকের তরে সুদূর আকাশপটে আমার ভাগ্যের ব্যঙ্গচিত্র এঁকে লোপ পাবে!

আচ্ছন্নের মত জানলার ধারের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল চেয়ারে ঝোলানো আমার কোটের কাঁধের উপর এক গাছি লম্বা চুল।

কি করে এসে পৌঁছল? কে জানে, এ জগতে অলৌকিক ঘটনা কি করে ঘটে?

কিংবা এ ঘটনা কি অতিশয় দৈনন্দিন নিত্য প্রাচীন? যে বিধাতা প্রতিটি ক্ষুদ্র কীটেরও আহার জুগিয়ে দেন, তিনিই তো তৃষিত হিয়ার অপ্রত্যাশিত মরূদ্যান রচে দেন। কিন্তু তার কাছে তখন সেটা অলৌকিক।

কুবেরের লক্ষ মুদ্রা লাভ অলৌকিক নয়, কিন্তু নিরন্নের অপ্রত্যাশিত মুষ্টি-ভিক্ষা অলৌকিক। কিংবা বলব, সরলা গোপিনীদের কৃষ্ণলাভ অলৌকিক—ইন্দ্রসভায় কৃষ্ণের প্রবেশ দৈনন্দিন ঘটনা।

অথবা কি এই হঠাৎ লটারি-লাভ আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ করে দেবে! অন্ধকার রাতের দুশ্চিন্তা তার কালো চুলকে ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সাদা করে দেবে?

কি করি? কি করি?

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি অল্প অল্প বৃষ্টি। এই বৃষ্টিকেই কাল রাত্রে কত

সোহাগের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলুম। এখন কোন-কিছুর সন্ধা
বাইরে যেতে পারব না বলে সেই সোহাগের ধন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কোথায় সন্ধান ?

সর্দার আওরঙ্গজেবের বাড়ি খুজে আমি পাব নিশ্চয়ই ; সেই সুদূর বাঙলাদে
থেকে যখন কাবুল পৌছতে পেরেছি তবে এ আর কতটুকু। কিন্তু পেয়ে লাভ
সেখানে তো আর গট্‌গট্‌ করে ঢুকে গিয়ে বলতে পারব না, 'শব্‌নম বানুর সা
দেখা করতে এসেছি।' এ দেশের ছেলেই এটা করতে পারে না। আমি যে
বিদেশী। আমি তো এমন কিছু স্বর্ণভাণ্ড নই যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মা
চাপা পড়ে গেলেও লোকে জানতে পারলে খুঁড়ে বের করবে ? বরঞ্চ শব্‌নম
স্বর্ণ-পাত্র। আমি ভিখারী তার দিকে নিষ্কাম হৃদয়ে তাকালেও সর্দার আমা
গর্দান নেবেন।

তা তিনি নিন। রাজারও একটা গর্দান, আমারও একটা। অথচ আশ্চর্
রাজার গর্দান গেলে বিশ্বজোড়া হইহই পড়ে যায়—আমার বেলা হবে না। কি
ওই কিশোরীকে জড়ানো ?

এ তো বুদ্ধির কথা, যুক্তির কথা, সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের কথা, কিন্তু হায়, হৃদয়ের
তো আপন নিজস্ব যুক্তিরাজ্য আছে, সে তো বুদ্ধির কাছে ভিখিরীর মত তার যুি
ভিক্ষা চায় না। আকাশের জল আর চোখের জল তো একই যুক্তি-কার
ঝরে না।

আব্দুর রহ্‌মান এসে খবর দিলে, আজ দুপুরে হোটেলে মাছ। অন্যদিন হ
আনন্দে আমি তাকে বখশিশ দিতুম—এ দেশে এই প্রথম মাছের নাম শুনত
পেলুম। আজ শুধু অলস নয়নে তাকিয়ে রইলুম।

খেতে গিয়েছিলুম। এদিক ওদিক তাকাই নি। কারণ, কাবুল পাগমা
এখনও মেয়েরা রেস্তরাঁতে বেরয় না। অনেক সর্দারই খেতে এসেছিলেন
হয়তো সর্দার আওরঙ্গজেবও ছিলেন।

হঠাৎ মৃদু গুঞ্জরন আরম্ভ হল। তারপর সবাই ধড়মড় করে ছুরি-কাঁটা ফেল
উঠে দাঁড়াল। ব্যাপার কি ? 'বাদশা, বাদশা' আসছেন।

আমার বুকের রক্ত হিম। এই সর্বনেশে দেশে কি স্বয়ং বাদশা বেরন মজনূ
—অর্থাৎ পাগলদের কিংবা আসামীর সন্ধানে।

না। এটা সরকারী হোটেল। লাভ হচ্ছে না শুনে তিনি স্বয়ং এসেছে

বড় ভাই মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে পেট্রোনাইজ করতে। রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীনও তা হলে তীর্থ দরশনে আসতে পারে। রাজার সঙ্গে গেলে দীনের রাহা-খরচাটা বাদ পড়ে বটে কিন্তু সেও তো পুরুত-পাণ্ডাকে দু পয়সা বিলোয়। পরে দেখা গেল তাঁর হিসেবটা ভুল নয়।

অনেক রকম খাবারই সেদিনছিল। এমন কি সদ্য ভারতবর্ষ থেকে আগত এক পেশাওয়ারী সদাগর পাতি নেবু পর্যন্ত বিলোলেন। অন্যান্য ঠাণ্ডা দেশের মত কাবুলেও কোন টক জিনিস জন্মায় না। আমারটা আমি গোপনে পকেটে পুরেছিলাম। পরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার গন্ধ শুঁকব বলে। দেশের গন্ধ কত দিন হল পাই নি! যে মাছটি খেলুম সেটি ভালো হলেও তাতে দেশের গন্ধ ছিল না।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাবুলীদের অবশ্য-কর্তব্য ঢেকুরটি তুললেন না। আমরাও উঠলুম। আমার খাওয়া অনেকক্ষণ হল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজা না ওঠা পর্যন্ত প্রজাকে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে ভান করতে হয়, যেন তার খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। রাজা তো প্রজার তুলনায় গোগ্রাসে গিলতে পারেন না। গিললে প্রজাকে আরও বেশী গেলবার ভান করতে হয়।

ইরান-তুরানে অতিথি নিমন্ত্রিত বাড়ি এলে গৃহস্থকে ওই ভান করতে হয়।

এসব আমার চিন্তা-ধারা নয়। আমার সঙ্গে বসেছিলেন তিনজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। এঁরাই গুনগুন করে এসব কথা উর্দুতে বলে যাচ্ছিলেন।

বেরিয়ে এসে দেখি বৃষ্টি থেমেছে। রোদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতা রোদের আলোতে ঝলমল করছে।

এখন বেরনো যায়। কিন্তু যাব কোথায়? সে চিন্তা তো আগেই করা হয়ে গিয়েছে! হলে কি হয়! পাগলামির প্রথম চিহ্ন, পাগল একই কথা বার বার বলে, একই গ্রাস বার বার চিবিয়ে চলে, গিলতে পারে না।

আর বেরতে গেলেই এই তিন ব্যবসায়ী দুশ্‌মন সঙ্গ নেবে। এরা এসেছে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কাবুলের ডাস্ট্‌বিনের ছবি তোলে, হ্যাট-পিনের পাইকারী দর শুধোয়।

আর আমার ঘরে তো রয়েছে আমার সেই অমূল্য নিধি! আজ সকালের সওগাত।

এদেশের সবুজ-চা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তিনটের সময় পা টিপে টিপে নিচে

নামলুম। সেখানে চা খেয়েই বেরিয়ে যাব। এ সময় আর সবাই আপন আপন ঘরে চা খায়।

টী-রূমে ঢুকেই এক কোণে এক সঙ্গে অনেক-কিছু দেখতে এবং শুনতে পেলুম। দেখি, আধ ডজনের বেশী কাবুলী তরুণী মাথার উপরকার হ্যাট থেকে ঝোলানে নেট্ বা বোরকার উত্তর-প্রান্ত—যাই বলা যাক না কেন—নামিয়ে, গোল টেবিল ঘিরে বসে কিচিরমিচির লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, এ সময় হোটেলের নিচের তলাটা নির্জন থাকে বলে এই সুবাদে বেচারীরা ফুর্তি করতে, নূতন কিছু-একটা করতে এসেছে। এবং এঁদের বুদ্ধিদায়িনীটি কে সেটা বুঝতেও বিলম্ব হল না। শব্‌নম বানু স্বয়ং দাঁড়িয়ে ওয়েটারকে তম্বিতম্বা করছেন ঝড়ের বেগে—'পেস্ট্রি নেই! কেন? কেক্ আছে। সে তো বলেছ। অর্ডারও তো দিয়েছি! ডিমের স্যাণ্ডউইচ! কেন? শামী কাবাব দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাতে পার না? মাথায় খেলে নি? যত সব—'

আমার দিকে পাশ ফিরে কথা বলছিলেন। হঠাৎ কেন জানি নে আমার দিকে তাকাতেই তাঁর মুখের কথা আমাকে দেখার সঙ্গে কলিশন লেগে থেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে চক্কর খেয়ে বারান্দায়। রওয়ানা দিলুম গেটের দিকে।

সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিছন থেকে কি একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি, সেই ওয়েটার।

'আপনাকে একটি বানু ডাকছেন।'

এসে দেখি, তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হাসি মুখে বললে, 'পালাচ্ছিলেন কেন? দাঁড়ান।'

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলতে খুলতে বললে, 'আজ সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, বাঙলাদেশ কোথায়? তিনি বললেন, ওদেশের এক রাজা নাকি আমাদের মহাকবি হাফিজকে তার দেশে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যেতে না পেরে একটি কবিতা লিখে পাঠান। সেটি আমি টুকে নিয়েছি। এই নিন।'

আমি তখন কিছুটা বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছি। ধন্যবাদ জানিয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে সেই নেবুটায় হাত ঠেকল।

হঠাৎ আমার কি হল? কোন চিন্তা না করে এই সামান্য পরিচিতা বিদেশিনীর হাতে কি করে সেটা তুলে ধরলুম?

'এটা কি? ও! নেবু? লীমূন। লীমূন-ই-হিন্দুস্তান!' নাকের কাছে তুলে ধরে শুঁকে বললে, 'পেলেন কোথায়? কী সুন্দর গন্ধ! কিন্তু ভিতরটা

টক। না?' বলে আবার হাসলে।

ওয়েটার চলে গেছে। চতুর্দিক নির্জন। দূরে দূরে মালীরা কাজ করছে মাত্র।

তবু আমার মুখে কথা নেই।

মেয়েটি একবার আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে।

আমি তাকিয়ে মাথা নিচু করলুম।

আস্তে আস্তে ভিতরে চলে গেল।

কী আহাম্মুখ! কী মূর্খ আমি!

প্রথম বারে না হয় বে-আদবী হত, কিন্তু এবারে এরকম্ অবস্থায়ও আমি শুধাতে পারলুম না, আবার দেখা হবে কি না? এবারে তো সে-ই ডেকেছিল। কবিতা দিলে। সেই কবিতাটি পড়ার ভান করে, ওই প্রশ্নটা ভালো করে বলার ধরনটা ভেবে নিলেই তো হত। না, না। ভালোই করেছি। যদি সে চুপ করে যেত তা হলেই তো সর্বনাশ। 'না' বললে তো আমি খতম হয়ে যেতুম। কিন্তু তবু কী মূর্খ আমি! এই যে আঠারো ঘণ্টা একই চিন্তায় বার বার ফিরে এসেছি তার ভিতর একবারও ভেবে নিতে পারলুম না, হঠাৎ যদি দৈবযোগে আবার দেখা হয়ে যায় তা হলে কি করতে হয়, কি বলতে হয়, সে-ই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—আবার দেখা হবে কি?—সেইটে কি করে ভদ্রভাবে শুধাতে হয়?

ওরে মূর্খ! দিলি একটা নেবু!

তাও শুনতে হল ভিতরটা টক!

না, সে মৌন করে নি।

আলবাৎ করেছে।

না।

## ॥ তিন ॥

আমি জানি, কাবুলের শেষ বল্-ডান্স কাল রাত্রেই হয়ে গিয়েছে। তবু সন্ধ্যার পর সেই অন্ধকার ভূতুড়ে বাড়ির চতুর্দিকে ঘোরপাক খেলুম। জানি, আজ আর টেনিস কোর্টে কেউ আসবে না। তবু সেখানে গেলুম। শুধু, সেই বেঞ্চিটিতে বসতে পারলুম না। বসলুম, একটা দূরের বেঞ্চিতে ওইদিকে তাকিয়ে। হায় রে,

নির্বোধ মন। তোমার কতই না দুরাশা! যদি,'যদি কেউ মনের ভুলে সেখানে এসে বসে।

টেনিস খেলার ছলে পৃথিবীর সর্ব টেনিস-কোর্টেই বহু নরনারী আসে প্রিয়জনের সন্ধানে, তার সঙ্গ-সুখ মোহে। এই কোর্টেও আসে দেশী বিদেশী অনেক জন। আমিও আসতে পারি। কিন্তু আমার এসে লাভ? কাবুলী মেয়েরা তো এখনও বাইরে এসে কোন খেলা আরম্ভ করে নি।

আমার বন্ধু আসে যখন সব খেলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এ খেলাতে তার শখ নেই। দিনের আলোতে খেলা তো সহজ—সবাই সবাইকে দেখতে পায়। তাতে আর রহস্য কোথায়? অন্ধকারের অজানাতে ঠিক-জনকে চিনে নিতে পারাই তো সব চেয়ে বড় খেলা। শিশু যেমন গভীরতম অন্ধকারে মাতৃস্তন খুঁজে পায়। তাই বুঝি মৃত্যুর ওপারে আমাদের জন্য সব চেয়ে বড় খেলা লীলাময় রেখেছেন।

মিথ্যা, মিথ্যা, সব মিথ্যা। কেউ এল না।

অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সে রাত্রি বাড়ি ফিরেছিলুম। তীর্থযাত্রী যে রকম নিষ্ফল তীর্থ সেরে বাড়ি ফেরে।

ডিনার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আব্দুর রহমান কিছু স্যাণ্ডউইচ সাজিয়ে রাখছিল। তাড়াতাড়ি বললে, 'এখনও কিচেন বোধ হয় বন্ধ হয় নি; আমি গরম স্যুপ নিয়ে আসি।'

আমি বললুম, 'না।'

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আব্দুর রহমান আমার কোট পাতলুন ব্রুশ করতে করতে কথায় কথায় বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান কাল সন্ধ্যায়ই বিবি বাচ্চা-বাচ্চী সমেত কাবুল চলে গেছেন। তাঁর পিসী গত হয়েছেন।'

অন্য সময় হলে হয়তো শুনেও শুনতুম না, কিংবা হয়তো অলস কণ্ঠে নীরস প্রশ্ন শুধাতুম, 'সর্দারটি কে?'

এখন আমি আব্দুর রহমান কি জানে,'কি করে জানে, কতখানি জানে, এসবের বাইরে। একদিন হয়তো আরও অনেকে জানবে, তাতেই বা কি? সেই যে ইরানী কবি বলেছেন,

> "কত না হস্ত চুমিলাম আমি অক্ষমালার মত,
> কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল আমার গ্রন্থি যত!"

'দস্ত-ই হর্-কস্‌রা ব্‌সানে সবহৎ বুসীদম্ চি সুদ
হীচ্ কস্ ন্ কশওদ আখির অক্‌দয়ে কারে মরা।'

অক্ষমালার মত পূতপবিত্র হয়ে সাধুসজ্জনের মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্যকর্মে লেগেও যদি তার 'গেরো' থেকেই যায়, তবে আব্দুর রহ্‌মানের হাতে দু পাক খেতেই বা আপত্তি কি ?

প্রথমটা সত্যিই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলুম।

অথচ দিনের আলো যতই ম্লান হতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল এই জঙ্গলী পাগমান শহরটা বড়ই নোংরা। দুনিয়ার যত বাজে লোক জমায়েৎ হয়ে খামকা হই-হুল্লোড় করে। এর চেয়ে কাবুল ঢের ভালো।

দেখি, আব্দুর রহ্‌মানেরও ওই একই মত। অথচ এখানে সাত দিনের ছুটি কাটাবার জন্য সে-ই করেছিল চাপাচাপি। এখনো তার তিন দিন বাকি!

সকালে দেখি, আব্দুর রহ্‌মান বাক্স প্যাটরা গোছাতে আরম্ভ করেছে। মনস্থির করাতে সে ভারী ওস্তাদ।

হিন্দুস্থানী সদাগররা দুঃখিত হলেন। বললেন, 'কাবুলে আবার দেখা হবে।'

বাস্ পাগমান ছাড়তেই মনে হল, সর্বনাশ!

শব্‌নম বানু যদি আবার পাগমানে ফিরে আসে ?

আর ভাবতে পারি নে রে, বাবা!

## ॥ চার ॥

পুরাতন ভৃত্যকে ছেড়ে বাড়ি ফেরা পীড়াদায়ক হলেও, সে সঙ্গে থাকলেই যে গৃহ মধুময় হয়ে ওঠে তার কোন প্রমাণ আমি পেলুম না। সেই নিরানন্দ নির্জন গৃহ। খান কয়েক বই। এগুলো প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

আচমকা একটা বুদ্ধি খেলল মাথায়। এক দোর বন্ধ হলে দশ দোর খুলে যায়; বোবার এক মুখ বন্ধ হলে দশ আঙুল তার ভাষা তর্জমা করে দেয়। আমার যদি সব দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়ে মাত্র একটি খুলে যায় তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সে দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আমি কোথায় পৌঁছব তার খবরও আমি জানতে চাই নে। দিগন্তের কাবা'র ছবি আমি দেখতে চাই নে, হে প্রভু! তুমি শুধু একটি কদম্ ওঠাবার মত আলো ফেলো।

ফার্সী শিখব—যে ফার্সীকে এত দিন অবহেলা করেছি।

তরুণরা এটা শুনে নিরাশ হবে। তারা ওই সময়ে স্বপ্ন দেখে অসম্ভব অসম্ভব বিষয়ের। প্রিয়ার ঘরে যদি আগুন লাগে, দমকলের লোকও তাকে বাঁচাবার জন্যে সাহসে বুক বেঁধে না এগোয়, সে তখন কি রকম লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্য। ইংরেজকে খুন করে প্রিয়া ধরা পড়েছে; ফাঁসির জন্য তৈরি হয়ে সে সব দোষ আপন স্কন্ধে তুলে নিল—প্রিয়া জানতে পর্যন্ত পারলে না।

প্রবীণরা এসব স্বপ্নের কথায় হাসেন। আমি হাসি নে।

ধন্য হোক তাদের এ সুখ-স্বপ্ন। মৃত্যুঞ্জয় হোক তাদের এ দুরাশা! এগুলোই তো তপ্ত ভূতলকে সরস শ্যামল করে রেখেছে। নন্দন-কাননের যে হাসি মুখে নিয়ে শিশু মায়ের কোলে আসে, তরুণের সেই নন্দন-কানন থেকেই আকাশ-কুসুম চয়নে তার শেষ রেশ।

তার তুলনায় ফার্সী শেখা কিছুই নয়। বজ্র-নির্ঘোষে ঝিঁঝির নূপুর-নিক্বণ!

প্রবীণরা অবশ্য এটাকেই প্রশংসা করতেন। আজ যদি আমি শব্‌নম বানুকে চিঠি লিখতে যাই? আমার ফার্সী কাঁচা, ফরাসী দড়কচ্চা।

বেরলুম ফার্সী বইয়ের সন্ধানে, কাবুলী বন্ধুদের বাড়িতে। তারা খুশী হবে। নিরপরাধা অকারণে বর্জিতা প্রথমা প্রিয়ার সন্ধানে নির্গত প্রণয়ীর নব অভিসার প্রিয়জন প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করে। ফার্সীকে আমি অকারণে বর্জন করেছিলুম।

এই বেরনোর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এ কথা বলব না।

আজ কেন, সেদিনও আমার মাতৃভূমিতে ক্ল্যাসিক্‌স্ অনাদৃত। অনুন্নত কাবুলে তা নয়। সেদিনও স্বয়ং মাইকেল যদি কলেজ স্ট্রীটে এসে নিজের বইয়ের সন্ধান করতেন তবে সেগুলো বের করা হত পিছনের গুদোম থেকে। তিনি তখন ইরানী কবির মতই দুঃখ করে বলতে পারতেন,

> "রাজসভাতে এসেছিলেম বসতে দিলে পিছে,
> সাগর জলে ময়লা ভাসে, মুক্তো থাকে নিচে।"

মাইকেলের দুঃখ বেশী। পুস্তক-সভাতেও তিনি পিছনে।

এখানে হাফিজ সাদী কলীম পয়লা শেল্‌ফে। কিছু বই কিনলুম। ধারের বইয়ে নাকি বিদ্যার্জন হয় না।

ফেরার পথে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে দেখা। তারা চেপে ধরলে, কাবুল নদীতে সাঁতারে যেতে। মনে মনে বললুম, ওখানে যা জল তা দিয়ে কাশীরাম দাসের জলের তিলকও ভালো কাটা যায় না। শেষটায় ঠিক হল তিন দিন পর, ছুটির শেষ দিনে।

তীব্র আবেগে ফল আসন্ন। তিন দিনেও অনেকখানি ফার্সী শেখা যায়।

তিন দিন পরে সাঁতারে এসেছি।

খানিকক্ষণ পরেই ছেলেরা আমার কথা ভুলে গিয়ে আপন আনন্দে মেতে উঠল। আমি আস্তে আস্তে ভাটির দিকে বুকজল ঠেলে ঠেলে, কখনও বাঁ দিক থেকে নুয়ে পড়া গাছের পাতা চোখের সামনে থেকে হাত দিয়ে ঠেলে এগুতে লাগলুম। সামনে একটু গভীর জল। সাঁতার কেটে ডান পায়ে উঠে গাছের ঝোপে জিরোতে বসলুম। যত মন্দমন্থরই হোক, স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে সম্মোহন আছে।

পিছন থেকে শুনি, 'এই যে!'

তাকিয়ে দেখি, শবনম!

এক লম্ফে জলে নামলুম। ভেবে নয়, চিন্তা করে নয়—সাপ দেখলে মানুষ যে রকম লাফ দেয়। আমার পরনে সাঁতারের কস্ট্যুম। কত যুগ যুগ সঞ্চিত প্রাচ্যভূমির এ সংস্কার।

'উঠে আসুন, উঠে আসুন, এখ্‌খুনি উঠে আসুন।'

কোন উত্তর নেই।

'উঠবেন না? আচ্ছা, তবে দেখাচ্ছি।' বলেই হাণ্ডব্যাগ হাতড়াতে লাগল।

মেরেছে! না—মারবে—পিস্তল খুঁজছে নাকি?

কাতর কণ্ঠে বললে, 'দেখুন, আপনি মীন্ এডভেন্‌টেজ নেবেন না। আমার পিস্তলে গুলি নেই।' একটু ভেবে বললে, 'ও, বুঝেছি। পরনে কস্ট্যুম। তা, উঠে আসুন। এই নিন আমার গায়ের ওড়না। এইটে জড়িয়ে বসবেন।'

এ তো আরও মারাত্মক। কাবুলিনীবেশে ওড়না শুধু অঙ্গাভরণ নহে, কিছুটা অঙ্গাবরণও বটে।

ততক্ষণে আমার বেশ বিষয়ের সংস্কার কেটে গিয়েছে। তার চেয়েও যে প্রাচীন সংস্কার সেইটে এসে সোনার বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছে। সে সংস্কারের সোহাগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্রলোক আপন গতি খুঁজে পায়।

'আপনি আমাকে কি করে খুঁজে পেলেন?'

প্রথমটায় চুপ করে গেলুম। মিথ্যে উত্তর দিতে যে একেবারেই ইচ্ছে যায় নি এ কথা বলব না।

শব্‌নম চুপ করে থাকতে পারে না। উত্তর না দিলে শাসায়। এবারে কিন্তু নীরব প্রতীক্ষায় বসে রইল।

ভালো ভাবেই বুঝে গেলুম এবারে সে উত্তর না নিয়ে ছাড়বে না। বললুম, 'আপনাকে আমি সবখানেই খুঁজছি।'

মুখ খুশিতে ভরে উঠল। হঠাৎ আবার আকাশের এক কোণে মেঘ দেখা দিল। শুধালে, 'আমাদের বাগানবাড়ি কাছেই, জানতেন?'

কেন জানি নে, বলতে ইচ্ছে হল না যে, তাদের কাবুলের বাড়ি বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যায় তার সবটুকু ওর বানানেওলা রাজমিস্ত্রির চেয়েও আমি বেশী জানি। বললুম, 'না।'

এবারে যেন তার কান্না পেল। বললে, 'ওঃ! বুঝেছি। সাঁতার কাটবার ফূর্তি করতে এসেছিলেন।'

এই এত দিনে আমার সত্যকার বাজল!

আজ না হয় ঠাট্টা-মস্করা, রঙ্গ-রসিকতা করে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব অসম্ভব স্বপন-চয়ন, তার বদ্ধ পাগলামি যতখানি পারি ঢেকে চেপে বলছি কিন্তু তখন, হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়?

বললুম, 'দেখুন, শব্‌নম বানু, আমি বিদেশী। বিদেশে অনেক মনোবেদনা। তার উপর যখন মানুষ ভালবাসে—'

সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে শব্‌নম তার হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল।

আমি ভয়ে লজ্জায় মারা গেলুম। ছি, ছি! আমি কী করে এ কথাটা বলে ফেললুম? কোথা থেকে আমার এ সাহস এল? কিন্তু আমি তো সাহসে বুক বেঁধে এ-কথা বলি নি। এ তো নিজের থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য, শব্‌নম আমার মুখের উপর তার হাতের চাপও ছাড়ছে না।

'বলো না, বলো না। আমি ঠিক করেছিলুম ও কথাটা আমি আগে তোমাকে বলব।'

দু জনাই অনেকক্ষণ চুপ।

শব্‌নমই প্রথম কথা বললে।

বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, আমি প্রথম বলব, আর তুমি আমাকে অবহেলা করবে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি?'

তাড়াতাড়ি বললে, 'থাক্, থাক্। আজ এসব না। আরেক দিন এসব কথা হবে আজ শুধু আনন্দের কথা বল। সব প্রথম বল, তুমি কখন আমাকে ভালবাসলে?'

আমি বললুম, 'সে কি করে বলি? তুমি কখন বাসলে বল?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'সে অতি সহজ। হোটেলের বারান্দায় যখন তোমাকে ডেকে পাঠালুম। তুমি যখন কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছিলে না, তখন। জান না ইস্‌ফাহানী কবি সাঈব্‌ কি বলেছেন,

"হ·ণী হুজ্জতে নাতিক্‌ বুদ্‌ জুইআই-ই-গওহর্‌হা,
কি আজ গওওয়াস্‌ দর্‌ দরিয়া নফ্‌স্‌ বীরূন নমীআয়দ্‌॥"

'গভীরে ডুবেছে, যে জন জানিবে মুক্তার সন্ধানে,
বুদ্বুদ হয়ে তার প্রশ্বাস ওঠে না উপর পানে॥'

আমি বললুম, এ কবি সত্যই জীবন দেখেছিলেন; কাবুলে এ কবি কিন্তু জন্মাতে পারত না।'

'কেন?'

'ডুব দেবার মত জল এখানে কোথায়?'

'সে কথা থাক্। আমার কিন্তু ভারী দুঃখ হয়, তুমি আমার বয়েতের পাল্টা বয়েৎ দিতে পার না বলে।'

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'সে কি। আমার হয় না।'

'চুপ। আবার ভুল করেছি। বলেছিলুম দুঃখের কথা তুলব না।'

'আমি কিন্তু জোর ফার্সী শিখতে আরম্ভ করেছি।'

'কী আনন্দ। বাবার মজলিসে কত বিদেশী আসে, কেউ ভালো ফার্সী বলতে পারে না। তুমি শিখলে আমার গর্ব হবে। তুমি আমারই জন্য শিখছ। সে আমি জানি।'

'তোমার মুখে 'তুমি' বড় সুন্দর শোনায়।'

বাধা পড়ল। কার যেন গলার আওয়াজ।

তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে বললে, এবার তুমি এস। তোমাকে খুদার আমানতে দিলুম।'

আমি জলে নামতে নামতে বললুম, 'আর কিছু বল।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

## ॥ পাঁচ ॥

"ঠেকেছিল মনোতরীখান
প্রাণনাশা সংশয়-চড়ায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।

ছিল ঠেকে মনোতরীখান—
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে ?
কে গো তুমি দুর্জ্ঞেয় মহান ?
কে দেবতা এলে আজি চিতে ?"

যে চার্বাক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, তিনি নাকি মঞ্জুভাষা'র কাছ থেকে তাঁর প্রেমের প্রতিদানের আশা পেয়ে একদিনের তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন।

"সেই একদিন শুধু জীবনে চার্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন—
সে যে আনন্দের দিন—সে যে প্রত্যাশার ॥"

( সত্যেন দত্তের কবিতা। )

আমি ছেলেবেলা থেকেই আল্লাকে ভয় করতে শিখেছি, কৈশোরে কাব্য পড়েছি, তাঁকে নাকি ভালবাসাও যায়, আর এই যৌবনপ্রদোষে এক লহমায় তিনি যেন হঠাৎ এক নবরাজ প্রেমরাজ হয়ে আমাকে ডেকে তাঁর সিংহাসনের পাশে বসালেন। শুধু তাই! ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রেম নিবেদনেরও প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর চোখেও যেন পাব-কি-পাব-না'র ভয়। আশ্চর্য! আশ্চর্য!

"জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমের ভিখারী
দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি।"

সব দ্বার ছেড়ে তিনি যেন একমাত্র আমারই দ্বারে এসেছেন।

না, তিনি দ্বারে আসেন নি। মৌলা—প্রভু—যখন আসেন, তখন তিনি বলে
'ছপ্পর ফাড়কে আতে হ্যায়'—তিনি ছাত ভেঙে আসেন।
করবে।'

আমি অবাক

একটি কথা, দুটি চাউনি, তাতেই দেহের ক্ষুধা, হৃদয়ের তৃষ্ণা, মনের আকাঙ্ক্ষা সব ঘুচে যায়, সব পরিপূর্ণ হয়ে যায় !

ঘরে ফিরে দেখি সেখানে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার রামধনু, তার-ই নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেবেলাকার নর্মসখী গ্রামের ছোট নদীটি, এবং সমুখে এক গাদা শিউলি ফুল—সেই প্রথম সন্ধ্যার শিউলি ফুল—শব্‌নম শিউলি। আর না, আর না ! থামো ! থামো ! আর আমার সইবে না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় যখন আরাম-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভানুমতীমন্ত্র দিয়ে সেই স্বপ্নকে সঞ্জীবিত করছি এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন আপাদ-মস্তক ভারী কালো বোরকায় ঢাকা এক মহিলা।

আমি ভালো করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বোরকা এক ঝটকায় সরে গেল।

শব্‌নম !

হাত দু'খানি এগিয়ে দিল।

আমি ছুটে গিয়ে তার হাত দু'খানি আপন হাতে তুলে নিলুম। তার পর কাবুলী ধরনে রাজা-বাদশা, গুরু-মুর্শীদের হাত দুটি যে ভাবে চুমো খাওয়া হয় সেই চুমো খেলুম।

বললে, 'হাঁটু গাড়ো।'

'জো হুকুম।'

'বল, "আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে সর্বকাল তোমার সেবা করব" ।'

'আমি সব দেহ মন হৃদয় দিয়ে সেবা করব।'

খিলখিল করে হেসে উঠল।

ভানুমতীমন্ত্র নিশ্চয়ই মাত্রাধিক করা হয়ে গিয়েছিল। সে মন্ত্রে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়। এ যে সত্যজাল—না, সত্যের দৃঢ় ভূমি।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে আমার মাথার দু'দিক চেপে ধরে হাসতে হাসতে বললে, 'আমি ভেবেছিলুম তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করে চিৎকার করে বলবে, "না, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর" ।'

আমি বললুম, 'আমাদের বাউল গেয়েছেন—একটু বদলে বলছি—

"কোথায় আমার ছত্র-দণ্ড কোথায় সিংহাসন ?

প্রেমিকার পায়ের তলায় লুটায় জীবন।"

'বেশ তো। তুমি ফার্সী শিখছ; আমি তা হলে বাঙলা শিখব।'

'সর্বনাশ! অমন কর্মটি করো না।'

'কেন?'

'তিন দিনে ধরে ফেলবে, আমি কত কম বাঙলা জানি।'

যেন আমার কথা শুনতে পায় নি। বললে, 'তুমি মুসাফির, কিন্তু ঘরটি সাজিয়েছ বেশ।' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেশ ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক দেখলে। তারপর সোফাতে বসে বললে, 'এস।' আমি পাশে বসতে যেতেই বললে, 'না, চেয়ারটা সামনে টেনে এসে বোস।' আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলুম। বললে, 'মুখোমুখি হয়ে বোস। তোমার মুখ দেখব।' তদ্দণ্ডেই মনটা খুশী হয়ে গেল—মানুষ কত সহজে ভুল মীমাংসায় পৌঁছয়।

আমি কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললুম, 'তুমি ওই তাম্বু, মানে বোরকা পর কেন?'

'স্বচ্ছন্দে যেখানে খুশী আসা-যাওয়া করা যায় বলে। আহাম্মুখ ইউরোপীয়ানরা ভাবে, ওটা পুরুষের সৃষ্টি, মেয়েদের লুকিয়ে রাখবার জন্য। আসলে ওটা মেয়েদেরই আবিষ্কার—আপন সুবিধের জন্য। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে পরি, এ-দেশের পুরুষ এখনও মেয়েদের দিকে তাকাতে শেখে নি বলে—হ্যাটের সামনে পর্দায় আর কতটুকু ঢাকা পড়ে?' তারপর বললে, 'আচ্ছা, বল তো, তুমি পাগমান থেকে পালিয়ে এলে কেন?'

বললুম, 'আমি তো খবর পেলুম, তুমি কাবুল চলে এসেছ।'

'আমি তার পরদিনই পাগমান গিয়ে শুনি, তুমি কাবুলে চলে এসেছ।'

আমি শুধালুম, 'আচ্ছা, বল তো, আমাদের বন্ধুত্ব এত তাড়াতাড়ি হল কি করে?'

'আজব্ বাৎ শুধালে। তবে কি বন্ধুত্ব হবে যখন আমার বয়স ষাট আর তোমার বয়স একশ তিরিশ?'

আমি শুধালুম, 'আমাদের বয়সে কি এতই তফাত?'

'তোমার গম্ভীর গম্ভীর কথা শুনে মনে হয় তারও বেশী। আবার কখনও মনে হয়, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু সেটা আসল উত্তর নয়। আসল উত্তর আরেক দিন বলব।'

'বলবে তো ঠিক!'

'নিশ্চয়।'

'আচ্ছা, এবারে তোমাকে একটা শেষ প্রশ্ন শুধাই। তুমি এত সাহস কোথায় পেলে? এই যে স্বচ্ছন্দে বল, কোন কিছুর পরোয়া তুমি কর না, সোজা আমার বাড়িতে চলে এলে—?'

'তুমি আমাকে ভালবাস—আমি তোমার বাড়িতে আসব না তো যাব কি গুল্-ই বাকাওলীর পরিস্তানে? জান, আমরা আসলে তুর্কী। আমাদের বাদশা আমানুল্লার গায়েও তুর্কী রক্ত আছে। আর তুর্কী রমণী কি জিনিস সেটা জানতেন আমানুল্লার বাপ শহীদ হবীবুল্লা। আমানুল্লার মায়ের প্যাচে তিনি পর্যন্ত হার মেনেছিলেন, জান? আমানুল্লার তো রাজা হওয়ার কথা ছিল না।'

'কিছু কিছু শুনেছি।'

'ভালো। গওহর্ শাদের নাম শুনেছ? ওই সুন্দর হিরাত শহরের চোদ্দ আনা সেই তুর্কী রমণীর তৈরি। তোমার আপন দেশে নূরজাহান বাদশা জাহাঙ্গীরকে চালাত না? মোমতাজ—আরও যেন কে কে? হারেমের ভিতরেই তুর্কী রমণী যে নল চালায় সেটা কতদূর যায় তার খবর রাখে কটা লোক?'

'তুমি অত ইতিহাস পড়লে কোথায়?'

'আমি পড়ি নি। আমি ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল এ-সব পড়ি নে। আমার আনন্দ শুধু কাব্যে। স্কুলে বাধ্য হয়ে 'তুর্কী রমণীর ইতিহাস' পড়তে হয়েছিল—তার থেকে বলছি। কিন্তু তাই বলে ভেবো না আমি আমার বে-পরোয়া ভাব ইতিহাস থেকে পেলুম। আর জান না, কবি কামালুদ্দীন কি বলেছেন—

"মরণের তরে দুটি দিন তুমি করো নাকো কোনো ভয়,
যেদিন মরণ আসে না; সেদিন আসিবে সে নিশ্চয়।"

আমি বললুম, 'মৃত্যু ছাড়া অন্য বিপদও তো আছে।'

'কী আশ্চর্য! মৃত্যুর ওষুধই যখন পাওয়া গেল তখন অন্য ব্যামোর ওষুধ মিলবে না? তোমার বিপদ, আমার বিপদ, আমাদের দুজনের মেলানো বিপদ—তার দাওয়াই আমার কাছে আছে। কিন্তু বলব না।'

'কেন?'

'ওষুধের রসায়ন (প্রেস্‌ক্রিপশন) জানাজানি হয়ে গেলে রোগী সারে না—হেকিমদের বিশ্বাস।' তার পর সোফার কুশনগুলো জড়ো করে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ে বললে, 'তুমি পাশে এসে বোস।' একপাশে একটু জায়গা করে দিয়ে

বললে, 'ওসব কথা কেন তোল? এখন বল, তুমি আমায় কোথায় কোথায় খুঁজলে? আমার শুনতে বড় ভালো লাগে।'

আমি বললুম, 'শব্‌নম বানু—'

'উহুঁ। হল না।'

'কি?'

'শব্‌নম শিউলি।'

এ নামে কত মধু ধরে। তাই বুঝি 'জপিতে জপিতে নাম অবশ হৈল তনু।' কবার জপেছিলুম?

শব্‌নম বললে, 'উত্তর দাও।'

'তোমাকে আমি সবখানে খুঁজেছি।'

এতক্ষণ সে শিলওয়ার পরা ডান পা বাঁ হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে মোজা-বিহীন ধবধবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল আর তার পরের আঙুল নিয়ে খেলা করছিল; কখনও বা ওড়নাখানি বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে তার খুঁট পাকাচ্ছিল।

ধড়মড় করে সটান উঠে বসে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। নদী-পাড়ে বলেছিলে। আমি তখন অর্থ বুঝি নি। এখন কবি জামী বুঝিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুনি বলছি, কিন্তু তার আগে বল, খোঁজার সময় যে-কোনো মেয়ে আসতে দেখলেই ভাবতে, আমি আসছি। না? শোন তবে;—

"আতুর হিয়ার নিদ্-হারা চোখে
অহরহ তুমি স্বামী,
দূর হতে দেখি যে কেহ আসিছে
তুমি এলে, ভাবি আমি!
মূর্খ দাঁড়ায়ে আছিল সেখানে
শুধাল, 'রাসভ এলে?'
কহিলেন জামী, 'বলিব তো আমি
তুমিই এসেছ'—হেলে।"

প্রথমটায় আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ভক্ত সাধকজন হঠাৎ একটা লোককে, আপন গা বাঁচিয়ে গাধা বানিয়ে দেবেন, এতখানি রসবোধ তাঁদের কাছে আশা করে কে?

সে কথা বলতে শব্‌নম বললে, 'বহু কাবুলীকে আধ ঘণ্টা ধরে বোঝাতে হয়।'

আমি বললুম, 'আমার একটা কথা মনে পড়েছে।'

'শাবাশ্।' বলে জানু পেতে বসে, ডান কনুই হাঁটুর উপর, হাত গালের উপর রেখে, কাত হয়ে, চোখ বন্ধ করে বললে, 'বল।'

'মজনূঁর শেষ প্রাণ-নিশ্বাস করে লীন ধরাতলে
সেই নিশ্বাস ঘূর্ণির রূপে লায়লীকে খুঁজে চলে।'

'বুঝেছি। কিন্তু আরও বুঝিয়ে বল।'

আমি বললুম, 'মজনূঁ যখনই শুনত, তার প্রিয়া লায়লীকে নজ্‌দ্ মরুভূমির উপর দিয়ে উটে করে সরানো হচ্ছে সে তখন পাগলের মত এ-উট সে-উটের কাছে গিয়ে খুঁজত কোন্ মহ্‌মিলে ( উটের হাওদা ) লায়লী আছে। মজনূঁ মরে গেছেন কত শতাব্দী হল। কিন্তু এখনও তাঁর জীবিতাবস্থার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস মরুভূমির ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু হয়ে লায়লীর মহ্‌মিল্ খুঁজছে। তুমি বুঝি কখনও মরুভূমি দেখ নি? ছোট ছোট ঘূর্ণিবায়ু ( বগোলে ) অল্প অল্প ধূলি উড়িয়ে এদিকে ধায়, ওদিকে ছোটে, সেদিকে খোঁজে?'

'না। কিন্তু মানুষের কল্পনা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তাই দেখে অবাক মানছি। উর্দু টা বল।'

"মজনূঁকে দম্‌কী রওনক মুদ্দৎ হুঈ সিধারে
অব্ ক্যৌ নজ্‌দকে বগোলে মহ্‌মিলকো ঢুঁঢ়তে হৈঁ?"

এর ছ'টা শব্দ ফার্সী। শব্‌নম বুঝে গেল। বললে, 'অতি চমৎকার দোহা।'

আমি একটু কিন্তু কিন্তু করে বললুম, 'বড্ড বেশী ঠাস বুনোট। আমার বুঝতে বেশ কষ্ট হয়েছিল।'

বললে, 'তার পর তুমি একে শুধালে "শব্‌নম বানু কোথায় থাকে?" ওকে শুধালে, "সে কখন বেড়াতে বেরয়?"—ভাবলে কেউই তোমার গোপন খবর জানে না।'

'আমি কি এতই আহাম্মুক!'

আমার ডান হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'শোন দিল-ই-মন ( আমার দিল্ )—মূর্খই হও আর সোক্রাৎই ( সক্রাটিস্ ) হও, প্রেম কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। শোন,

"দিল গুমান দারদ কি পুশীদে অস্ত্ রাই-ই ইশ্‌করা
শমরা ফানুস পন্‌দারদ্ কি পিনহান্ করদে অস্ত্।

সরল হৃদয় মনে করে প্রেম লুকায়ে রাখিতে পারে,
কাঁচের ফানুস মনে মনে ভাবে লুকায়েছে শিখাটারে।"

কে পারে? কেউ পারে না। আজ না হয় কাল ধরা পড়বেই। আমি পারি? এই তো তুমি যে আমায় নেবুটি দিয়েছিলে—আমি সেটি নখ দিয়ে অল্প অল্প ঠোনা দিয়ে শুঁকছিলুম। হঠাৎ বাবা এসে শুধালেন, "নেবু যে! কোথায় পেলে?" আমি বললুম, "হোটেলে চা খেতে গিয়েছিলুম"—বাবা জানতেন, "সেখানে জুটল।" আমার মুখ যে তখন লাল হয়ে যায় নি, কি করে বলব? আব্বা বললেন যে, তিনিও লাঞ্চে একটা পেয়েছিলেন। কে দিলে, কি করে পেলে কিচ্ছু শুধালেন না। তিনিও একদিন জানবেন।'

'তখন?'

'তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তো বিদেশী। আমার, শুধু আমার, আপন-দেশী। তোমার ভাবনা ভাববো আমি। বলেছি তো আমার কাছে ওষুধ আছে। ওসব কথা ছাড়। একটা কবিতা বল—আমাদের কথার সঙ্গে খাপ খাক আর নাই খাক।'

আমি বললুম, 'খাপ খাইয়েই বলছি। তোমার মুখ লাল হওয়ার সঙ্গে তার মিল আছে, আবার কাঁচের চিমনি যে গর্ব করে সে প্রদীপের আলো লুকিয়েছে তার সঙ্গেও মিল আছে। তবে এটা সংস্কৃতে এবং শ্লোকটার ভাবার্থ শুধ আমার মনে আছে;

"শুধাইনু 'হে নবীনা,
ভালোবাস মোরে কি না?'
রাঙা হ'ল তার মুখখানি;
প্রেম ছিল হৃদে ঢাকা!
তাই যবে হয় আঁকা
আকাশেতে লাল রঙ, জানি—
পাহাড়ের আড়ালেতে
সবিতা নিশ্চয় ভাতে
রক্তাকাশ তাই নেই মানি।"

শবনম বললে, 'আবার বল।'

বললুম।

শব্‌নম বললে, 'এটি অতুলনীয়। বিশেষ করে প্রেমের সঙ্গে সূর্যেরই শুধু তুলনা হয়। আকাশ আর মুখ এক। ঘড়ি ঘড়ি রঙ বদলায়। সূর্য চিরন্তন। প্রেম-সূর্য একবার দেখা দিলে আর কোন ভাবনা নেই।'

আমি বললুম, 'তোমার বেলা একটা নেবুতেই মুখ লাল হয়ে গেল। প্রেম হলে কি হত?'

বিরক্তির ভান করে বললে, 'কি বললে? প্রেম নেই?'

আমিও বেদনার ভান করে বললুম, 'তুমিই তো বললে নেবুর ভিতর টক।'

'ও! আমি বলেছিলুম, "আঙুরগুলো টক"—সেই অর্থে। তোমাকে পাব না ভয়ে শেয়ালের মত মনকে বোঝাচ্ছিলুম।'

'তোমার সঙ্গে কথায় পারা ভার। তবে আরেকটা ফরিয়াদ জানাই।'

গভীর মনোযোগসহকারে, অত্যন্ত দোষীর মত চেহারা করে বললে, 'আদেশ কর।'

আমি বললুম, 'আমার উচ্চারণে ঠাকুরমার সিন্দুকের গন্ধ।'

খলখল করে হেসে উঠল; 'আচ্ছা পাগল তো। সার্থক নাম রেখে ছিলেন তোমার আব্বা-জানের মুরশীদ। ওরে, মজনূন সেই ভাল। জানেমন্ বলছিল—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'সে আবার কে?'

দুষ্টু মেয়ে। বুঝে ফেলেছে। ভুরু কুঁচকে শুধালে, 'হিংসে হচ্ছে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

আনন্দে আলিঙ্গন করতে গিয়ে যেন নিজেকে ঠেকালে। হাসিতে খুশিতে কান্নাতে মেশানো গলায় বললে, 'বাঁচালে, আমাকে বাঁচালে।'

অবাক হয়ে শুধালুম, 'মানে?'

'বাঁচালে, বাঁচালে। গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, প্রিয়জনের মঙ্গলের জন্য তাকে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে তুলে দেবে, আত্মবিসর্জন করে নিজেকে মিলিয়ে দেবে—মানি নে, মানি নে, আমি একদম মানি নে। আজ যদি গওহরশাদ্ কিংবা নূরজাহান তোমাকে ভালবেসে পেতে চান—'

আমি বললুম, 'শাবাশ্।'

'কি বললে? শাবাশ্? দেখাচ্ছি। প্রথম মারব ওদের। তখন যদি 'শাবাশ্' কহ তবে বেঁচে গেলে। না হলে তোমাকে মেরে থেঁতলে, পিষে শামী-কাবাব বানাব, নিদেন পক্ষে শিক।' হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে পিস্তল দেখালে।

আমি বললুম, 'ওতে বুলেট থাকে না।'

'সেদিনও ছিল।'

'জানেমন্ কে?'

'আমার জিগরের টুকরো, কলিজার আধা, দিলের খুন, চোখের রোশনাই, জানের মালিক—আমার জ্যাঠামণি। তোমার কাছে সিগরেট আছে। দাও তো।'

'শুধোবেন না, কোথায় পেলে?'

'উনি সব জানেন।'

'তুমি বলেছ?'

'না।'

'আরও কিছুক্ষণ বসি। সিনেমার লাইট নিবে গিয়েছিল বলে শো' শেষ হতে দেরি হল। আমাকে বলতে হবে না।'

'জ্যাঠামণি?'

'তিনি বলেন, "সিনেমায় কেন যাও, বাছা? সিনেমা তো জীবনই দেখায়। তার চেয়ে জীবনটাকে সিনেমার মত দেখতে শেখ। অনেক হাঙ্গাম-হুজ্জৎ থেকে বেঁচে যাবে।" '

তারপর বললে, 'এবারে তুমি চুপ কর। আমি একটু দেখে নিই, ভেবে নিই।' লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে খানিকক্ষণ বড় চোখ আরও বড় করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ বন্ধ করল।

একবার শুধু বললে, 'বল তো—। না থাক্।'

তারপর অনেকক্ষণ একেবারে নিশ্চল নিথর।

বললে, 'আমার পেয়ালা একেবারে পরিপূর্ণ করে ভরে দিয়েছেন করুণাময়। এই তোমার ঘর, তুমি পাশে বসে—এর বেশি কি বলব! নিশ্বাসে নিশ্বাসে আমি সব-কিছু শুষে নিয়েছি।'

এই প্রথম দেখলুম, শব্‌নম কোন কবির কবিতা দিয়ে আপন ভাব প্রকাশ করল না। কোন্ কবিতা পারত?

'উঠি।'

আমি বললুম, 'আবার কবে দেখা হবে?' এবারেও ভুলতে বসেছিলুম শুধাতে। আনন্দের সময় মানুষ দুঃখের দিনের সম্বল সঞ্চয় করতে ভুলে যায়। আসলে তা নয়। পরিপূর্ণতা যদি ভবিষ্যৎ দৈন্যের কথা স্মরণ করতে পারে, তবে সে পরিপূর্ণ হল কই?

বললে, 'তুমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস কর, তোমাকে দেখবার জন্ত আমার যে ব্যাকুলতা, তুমি কখনও সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'দয়া করে কর। শান্তি পাবার ওই একমাত্র পথ। না হলে পাগলের মত ছুটোছুটি করবে। আর দেখ, তুমি যদি আমার কথাটা বিশ্বাস কর, তবে যদি কখনও আমার শক্তিক্ষয় হয়, তবে তখন আমি বিশ্বাস করব যে আমাকে পাবার জন্ত তোমার যে ব্যাকুলতা সেটা আমি ছাড়িয়ে যেতে পারব না। তখন আমি পাব শান্তি।'

দোরের কাছে এসে শেষ কথা বললে, 'আমার বিরহে তুমি অত্যন্ত হয়ে যেয়ো না—ওইটুকুতেই আমার চলবে।'

## ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

## ॥ এক ॥

সকলেই বলে, পলে পলে তুষানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বহ্নিকুণ্ডে ঝম্প দেওয়া ভাল। আমি জানি, আমার সমুখে কত দীর্ঘ দিনের বিরহ সেটা যদি আমি প্রথম দিনে জানতে পারতুম তা হলে সেটা কিছুতেই সইতে পারতুম না। আমার প্রার্থনামত আল্লাতাল্লা আমাকে এক সঙ্গে একটি কদমের বেশি ওঠাতে দেন নি। আলো দিয়েছিলেন, কিংবা বেদনা দিয়েছিলেন এক পা চলার—বিরহদিগন্ত কত দূরে দেখতে দেন নি। তাঁকে দোষ দিই কি করে?

আর শব্‌নম! সে তো শিউলি। শরৎ-নিশির স্বপ্ন—প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা। সে যখন ভোরবেলা সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সে কি স্বেচ্ছায়?

ওই কঠিন কঠোর সময়েও সে একবার ঝড়ের মত আমার ঘরে এসেছিল।

এক নিশ্বাসে কথা শেষ করে কেঁদেছিল। ওই প্রথম আর ওই তার শেষ কান্না। তার বাবাকে আমানুল্লা কান্দাহারের গবর্নর করে পাঠাচ্ছেন। ফ্রান্সের নির্বাসন শেষ হওয়ার পর দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু আমানুল্লা আর সর্দার আওরঙ্গজেব খানেতে বনাবনি হল না; বিশেষত তিনি আমানুল্লার উগ্র ইউরোপীয় সংস্কার পদ্ধতি আদপেই পছন্দ করতেন না। এখন ইউরোপ যাবার মুখে তিনি বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আওরঙ্গজেব নাকি প্রথমটায় যেতে চান নি। এখন স্থির হয়েছে, তিনি মাত্র তিন মাসের জন্য যাবেন। আওরঙ্গজেবের পিতৃভূমি কান্দাহার তিনি ভাল করে চেনেন—তিন মাস পরে অবস্থা দেখে আমানুল্লাকে জানাবেন, ঠিক কোন্ লোককে তাঁর পরের গবর্নর করে পাঠালে সে কান্দাহারের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

এত দুঃখের মাঝখানেও ওইটুকু ছিল আনন্দের বাণী। কাবুলে রাজনৈতিক মরুভূমিতে বাস এক রকম অসম্ভব। হয় তুমি রাজার পক্ষে, রাজার প্রিয়ভাজন—নয় তুমি কারাগারে কিংবা ওপারে; শব্‌নম যদিও বললে তাঁর আব্বা এ-সব ব্যাপারে ঈষৎ উদাসীন। ফ্রান্সে নির্বাসনকালে তিনি সেখানকার স্যাঁ সীর মিলিটারি কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন, এখনও করেন—আর তার ফাঁকে ফাঁকে কাব্য-চর্চা।

সেদিন শব্‌নম তেজী তুর্কী রমণীর মত কথা বলে নি, কথায় কথায় কবিতা বলতে পারে নি। শুধু অনুনয় বিনয় করেছিল।

আমি শুধু একটি কথা বলেছিলুম, 'তোমার না গেলে হয় না?'

বেচারী ভেঙে পড়ে তখন।

টসটস করে, কোন আভাস না দিয়ে, ঝরে পড়েছিল অনেক ফোঁটা মোটা মোটা চোখের জল।

আমার দু হাত তুলে ধরে তাদেরই দু পিঠ দিয়ে আপন চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিল, 'ওইটেই তুমি শুধু শুধিয়ো না, লক্ষ্মীটি। এই একটা প্রশ্ন আমার মাথার ভিতর ঢুকে যেন পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। না গেলে হয় না? না গেলে হয় না?—অসম্ভব, অসম্ভব। কিস্মৎ কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে, তুমি ওকে রূঢ়তর করো না।'

দরজার কাছে এসে তার কথামত দাঁড়ালুম।—বললে—যেটা সে আগের বারও বলেছিল, 'আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

ওর তো কথা বলার অভাব নেই। বুঝলুম, প্রাণের কথা মাত্র একটি।

ভোরবেলা আমি আধো ঘুমে। সমস্ত রাত অনিদ্রায় কেটেছে। আমার শিয়রে বসে শব্‌নম। আমি চোখ মেলতেই সে দু হাত দিয়ে আমার চোখ বন্ধ করে দিল।

যেন শুনলুম, 'ব্‌ আমানে খুদা'—তোমাকে খুদার আমানতে রাখলুম। 'ব্‌ খুদা সপুর্দমৎ'—তোমাকে খুদার হাতে সর্পোদ করলুম।

'আমার বিরহে—'

সমস্ত ব্যাপারটা কয়েক সেকেণ্ডের। দীর্ঘতম স্বপ্নও নাকি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের।

বলতে পারব না, সত্য না স্বপ্ন। শব্‌নমকে শুধোবার সুযোগ পাই নি। বোধ হয় সত্য-স্বপ্ন। কিংবা স্বপ্ন-সত্য।

প্রথমে তিন মাস, তার পর চার মাস, তার পর ছ-মাস। আমাহুল্লা বিদেশ থেকে এক এক দু দু মাসের ম্যায়াদ বাড়ান; আর শব্‌নমরা ফিরতে পারে না।

সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল।

শব্‌নমদের প্রাচীন ভৃত্য তোপল্ খান দু-তিন মাস অন্তর অন্তর একবার করে

কাবুল আসে আর শব্‌নমের চিঠি দিয়ে যায়—ডাককে অবিশ্বাস করার তার যথেষ্ট ন্যায্য হক্ক ছিল।

সে চিঠিতে কি ছিল আমি বলতে পারব না। ফার্সীতে ফরাসীতে মেশানো চিঠি। যে শব্‌নম কথায় কথায় কবিতা বলতে পারত সে বিদায়ের সময়কার মত একটি কবিতাও উদ্ধৃত করে নি কিংবা করতে পারে নি। মাত্র একবার করেছিল। তাও আমি আমার চিঠিতে সে-কথার উল্লেখ করেছিলুম বলে। তখন লিখেছিল:

"আজ্‌ হুনরে হালে খরাব্‌মম্‌ন্‌ শুদ্‌ ইস্‌লাহ্‌ পজীর
হমচু ওয়রানে কি আজ গন্‌জে খুদ্‌ আবাদ ন্‌ শুদ্‌।"

'এত গুণ ধরি কি হইবে বলো দুরবস্থার মাঝে?
পোড়া বাড়িটাতে লুকনো যে ধন—লাগে তার কোনো কাজে?'

আর ছিল কান্না আর কান্না।

প্রত্যেকটি শব্দে, প্রত্যেকটি বাক্যে। এমন কি আমাকে খুশি করবার জন্যে যখন জোর করে কোন আনন্দ ঘটনার খবর দিত তখনও সেটি থাকত চোখের জলে ভেজা।

থাক্‌। আমার এ গুপ্তধনে কী আছে তার সামান্যতম ইঙ্গিত আমি দেব না। এখন এটি আমার চোখের জলে ভেজা।

এক বছর ঘুরে যাওয়ার পর আমি একদিন রোজা করলুম। সন্ধ্যার সময় গোসল করে, সামান্য ইফ্‌তার (পারণা) করে নমাজে বসলুম। দুপুর রাত্রে ঘুমুতে গেলুম। স্বপ্নে সত্যপথ নিরূপণের এই আমাদের একমাত্র পন্থা।

স্বপ্নাদেশ হল, কান্দাহার যেয়ো না। ভোর রাত্রে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত। আমি ভেবেছিলুম, কোন আদেশই পাব না এবং বিবেককে সেই পন্থায় চালিয়ে দিয়ে আমি কান্দাহারের পথ নেব।

অবশ্য কুরান শরীফে এ প্রক্রিয়ার উল্লেখ নেই। কাজেই না মানলেও কোন পাপ হবে না। কোন কোন মৌলানা এ প্রক্রিয়া অপছন্দও করে থাকেন।

এমন সময় আব্দুর রহ্‌মান এসে ঘরে দাঁড়াল। আমি তার দিকে তাকালুম। বললে, 'কাল আমি কান্দাহার যাবার অনুমতি চাই।'

আব্দুর রহ্‌মান সেই যে পাগমানে গোড়ার দিকে একদিন বলেছিল আওরঙ্গজেব-পরিবার কাবুল চলে গিয়েছেন তারপর সে ওই বিষয়ে একটি কথাও বলে নি।

আমি শুধালুম, 'কেন ?'

'ওখানে আমার এক ভাগ্নে আছে। তোপল্ খান দু'মাস হল আসে নি।'

এ দুটো কথাতে কি সম্পর্ক আছে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।—একটু চিন্তা করে স্থির করলুম, আব্দুর রহ্‌মানকে দিয়ে চিঠি লিখে কান্দাহার আসবার অনুমতি চাইব, আর আজ রাত্রে যদি কোন প্রত্যাদেশ না আসে তবে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেও পারি। আব্দুর রহ্‌মান চলে গেল।

আমি নত মস্তকে শ্লথ গতিতে টেবিলের দিকে চললুম, চিঠিখানা তৈরি করে রাখতে। এই এক বৎসর আমি ফার্সী শিখেছি প্রাণপণ—সেই ছিল আমার বিরহে সান্ত্বনার তীর্থ—তবু চিঠি লিখতে সময় লাগে।

টেবিলের কাছে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি, শব্‌নম।

## ॥ দুই ॥

পরে শব্‌নমের কাছ থেকেই শুনেছি, আমি নাকি জাত-ইডিয়টের মত শুধু বিড়বিড় করে কি যেন একটা প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছিলুম। 'তুমি কি করে এলে ? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি। তুমি কি করে এলে ? আমি তো কোন শব্দ শুনি নি।' আমার বিস্ময় লাগে, এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল।

অপমানিত, পদদলিত, ব্যঙ্গ-কশাঘাতে জর্জরিত নিরাশ দীনহীন জনকে যদি রাজাধিরাজ ধর্মরাজ সহসা আদর করে ডেকে নিয়ে সিংহাসনের এক পাশে বসান তখন তার কি অবস্থা হয় ?

আশৈশব অপমানিত, যৌবনেও আপন নীচ-জন্ম সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন সূতপুত্র কর্ণ যেদিন মহামান্যা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা কুন্তীর কাছে শুনতে পেলেন তিনি হীনজন্মা নন, তখন তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল ?

শব্‌নম এতটুকু বদলায় নি। সৌন্দর্যহর কাল যেন তার সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। গাত্রস্পর্শ করতে পারে নি। যাবার দিন যে রকমটি দেখেছিলুম, ঠিক সেই রকম। আমার বুকের ভিতর যে ছবি আমি এতদিন হিয়ার রক্ত দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলুম সে যেন আজ মুক্তিস্নান সেরে আমার সমুখে দেখা দিল। তার মুখে সব সময়েই শিশির-মধুমাস, আফগানিস্থান-হিন্দুস্থান বিরাজ করত ; কপাল আফগানিস্থানের শীতের বরফের মত শুভ্র আর কপোল বোলপুরের বসন্ত-কিংশুকের মত রাঙা। হুবহু সেই রকমই আছে।

শুধু কোথায় যেন তবু পরিবর্তন হয়েছে। চোখে? সেইখানেই তো সর্বপ্রথম পরিবর্তন আসে। না। ঠোঁটের কোণে? না। গালের টোল ভরে গিয়েছে? না। সর্বস্বদ্ধ? তাও না।

অকস্মাৎ বুঝে গেলুম ওর ভিতর আগুন জলছে। সে আগুন সর্বাঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আমার কাছে এসে, দুহাত আমার কাঁধে রেখে মস্তকাঘ্রাণ করল। বনবাস-মুক্ত রামচন্দ্রকে কৌশল্যা যে-রকম মস্তকাঘ্রাণ করেছিলেন।

বললে, 'ছিঃ! তুমি রোগা হয়ে গিয়েছ।'

বুঝলুম, ওকে পুড়িয়েছে বেশি। এবং সইবার শক্তিও তার অনেক, অনেক বেশি আমার চেয়ে। হৃদয়ঙ্গম করলুম, ওর কথাই ঠিক। ওর ব্যাকুলতাই বেশি। এ জীবনে বিশ্বাস ওকেই করতে হবে। মরুভূমিতে মাত্র দুজনার এই কাফেলাতে সে-ই নিশানদার সর্দার।

বড় ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'আমাকে একটু ঘুমুতে দেবে?'

ঘুঙুরওয়ালা চরণচক্রপরা বাড়ির নতুন বউ চলাফেরা করার সময় যে রকম দক্ষিণী বীণা বাজে, ওর গলার শব্দ সেই রকম।

শুয়ে পড়ে একটি অতি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি কিন্তু কোথাও যেয়ো না।'

আশ্চর্য এ আদেশ। আমি আবার যাব কোথায়? তখন বুঝলুম, যে-আদেশ দেবার পূর্বেই প্রতিপালিত হয়ে গেছে সেইটেই সত্যকার আদেশ, যে বাক্য অর্থহীন সেইটেই সব অর্থ ধরে।

তবে শুনেছি, স্বয়ং লক্ষ্মী এলেন ভাগ্যহীন চাষার কপালে ফোঁটা দিতে। সে গেল নদীতে মুখ ধুতে। ফিরে এসে দেখে তিনি অন্তর্ধান করেছেন। ওরে মূর্খ, ঘামে-ভেজা কাদা-মাখা কপালেই তখন ফোঁটা নিয়ে নিতে হয়। এক বছরের অবহেলায় গৃহ শ্রীহীন। তাই বলে আমি কি এখন ছুটব ডেকোরেটরের দোকানে।

শবনমের ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছিল। তারপর সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি জানি, রোমান্টিকেরা, আমার তরুণ বন্ধুরা, মর্মাহত হবেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর এই অপ্রত্যাশিত মিলন; আর একজন গেলেন ঘুমুতে। আর আমি কি করলুম? সত্যি বলছি, একখানা বই নিয়ে পড়তে লাগলুম। এক ঘণ্টা পরে দেখি, এক বর্ণও বুঝতে পারি নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান? এক ঘণ্টারও বেশি সে ঘুমিয়েছিল। কতদিনের জমানো ঘুম কে জানে? কত দুশ্চিন্তা,

কত দুর্ভাবনা সে ওই ঘুমে চিরকালের তরে গোর দিতে চায় কে জানে? ঘুম থেকে উঠে চুপ করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি লাজুক ছেলে বিপদে পড়লে যে রকম হয় সেই গলায় বললুম, 'কিছু বলছ না যে?'

বললে—

'"ওয়াসিল্ হরফ্-ই চুন্ ও চিরা বস্তে অস্তলব্
চুন রহ্‌তমাম গশ্‌ৎ জর্স বি-জবান শওদ।

কাফেলা যখন পৌঁছিল গৃহে মরুভূমি হয়ে পার
সবাই নীরব। উটের গলায়ও ঘণ্টা বাজে না আর।"'

বড় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। যা বললে তার ভিতরই তার প্রতিবাদ রয়ে গিয়েছে। নিজের নীরবতা বোঝাতে গিয়ে শব্‌নম সরব হয়েছে। আর শুধু কি তাই? সেই পুরনো শব্‌নম—যে কবিতা ছাড়া কথা কইতে পারে না। যে পরওয়ানা প্রদীপের পানে ধায় না সে আবার পরওয়ানা! পরক্ষণেই বললুম, হে খুদা, এ কি অপয়া চিন্তা এনে দিলে আমার মনে—এই আনন্দের দিনে? মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপলুম।

শুনতে পেয়েছে। শুধালে, 'কি বলছ?'

আমি পাছে ধরা পড়ে যাই তাই বললুম, 'তুমি ঘুমোবার আগে আমাকে কি যেন বলছিলে?'

'ও! বাড়ি ছাড়তে বারণ করেছিলুম, আর বলেছিলুম—

"দীরূনে খানা-ই খুদ্ হর্ গদা শাহানশাহ্-ইস্ত্
কদম্ বারূন মনহ্ আজ হদ্দ-ই-খওয়িশ ও সুলতান বাশ্।

ভিখারী হলেও আপন বাড়িতে তুমি তো রাজার রাজা—
সে রাজ্য ছেড়ে বাহিরিয়া কেন মাত্র শুধু রাজা সাজা!"'

'কী রকম?

'এই মনে কর ইরানের শাহ্-ইন্‌শাহ—রাজার রাজা, মহারাজা। তিনি যদি আজ এদেশে আসেন তবে আমরা বলব ইরানের শাহ্—রাজামাত্র। কারণ আমাদের তো রাজা রয়েছেন। আমাদের শাহের তিনি তো শাহ্ নন।'

'আর যদি বশ্যতা স্বীকার করেন ?'

'কী বোকা !'

'হ্যাঁ ! যেমন মনে কর তুমি তোমার আপন বাড়িতে অন্য অনেক জনের ভিতর শাহ্‌জাদা, কিংবা শাহজাদী, কিংবা ধরলুম শাহ্‌ই। কিন্তু এ বাড়িতে তুমি শাহ্-ইন্ শাহ্—মহারাজা।'

'ওতে আমার লোভ নেই।'

আমি দুঃখ পেলুম।

বললে, 'ওরে বোকা, ওরে হাবা, ওইখানে, ওইখানে'—বলে তার আঙুল দিয়ে আমার বুকের উপর বার বার খোঁচা দিতে লাগল। তারপর বললে, 'এবারে তুমি বড় লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গিয়েছ। এখনও একটা ফরিয়াদও কর নি।'

'করি নি ? তা হলে কি করেছি এতদিন, প্রতি মুহূর্তে ? হাফিজ সেটা জানতেন না ? আমার হয়ে সেটা করে যান নি ?—

"তুমি বলেছিলে 'ভাবনা কিসের ? আমি তোমারেই ভালবাসি ,
আনন্দে থাকো, ধৈর্য সলিলে ভাবনা যে যাক ভাসি।'
ধৈর্য কোথায় ? কিবা সে হৃদয় ? হৃদয় কাহারে কয় ?
সে তো শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ফরিয়াদ-রাশি।" '

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'ফরিয়াদ-রাশি' নয়, আছে 'ভাবনার রাশি'।'

আমি বললুম, 'সে কি একই কথা নয় ?'

বললে, 'কথাটা ঠিক। হৃদয় মানেই চিন্তা, ভাবনা, ফরিয়াদ—অতি কালে-ভদ্রে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা—। সেই সান্ত্বনাটুকু না থাকলেই ভালো হত। বেদনা-বোধটা হয়তো আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যেত। কিস্মতের এ কী বিঘ্নসন্তোষী প্রবৃত্তি ! নিরাশায় শুয়ে শুয়ে গাছটা মরে যাচ্ছে। মরতে দে না। তা না হলে তো বাঁচি। না ; তখন দেবে সান্ত্বনার এক ফোঁটা জল। আবার বাঁচ, আবার মর। যেন বেলাভূমির সঙ্গে তরঙ্গের প্রেম। দূর থেকে সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে হেসে আসে, আবার চলে যায়, আবার আসে, আবার যায়।' হঠাৎ হেসে উঠে বললে, 'কিন্তু আমি শতবার মরতে রাজী আছি—একবার বাঁচবার তরে।' এটা যেন আপন মনের কথা। তারপর আমাকে শুধালে, 'এখন ফরিয়াদ করছ না কেন ?'

আমি বললুম, 'কাজল যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ—সে কালো। চোখে যখন মেখে নিই তখন তো তার কালিমা আর দেখতে পাই নে।

সে তখন সৌন্দর্য বাড়ায়। এটা আমার নয়—কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত তিরুবল্লুবেরের।'

'চমৎকার। আমাদেরও তো সূর্মা আছে, কিন্তু কেউ কিছু লিখেছে বলে তো মনে পড়ছে না। আরও একটা বল।'

'ওঁর কাব্য তো আমি সঙ্গে আনি নি। আচ্ছা দেখি।' একটু ভেবে বললুম, 'নিঠুর প্রিয়ের সম্বন্ধে প্রিয়া বলছেন, "সে আমার হৃদয়-বাড়িতে দিনে ঢোকে অন্তত লক্ষ বার কিন্তু তার বাড়িতে কি আমাকে একবারও ঢুকতে দেয়? আমিই তাকে স্মরণ করি লক্ষ বার, সে একবারও করে না।"'

হঠাৎ দেখি শব্‌নম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কবিতাটি ভাল হোক মন্দ হোক এতে তো গম্ভীর হওয়ার মত কিছু নেই।

কান্নার সুরে বললে, 'আমার বাড়িতে নিয়ে যাই নি—তোমাকে? কবে যাবে বল?'

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারি নি 'বাড়ি' বলতে সে 'হৃদয়' বুঝেও সত্যকার আপন বাড়ি বুঝেছে।

আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তার দু হাত চেপে ধরলুম। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না। কি যেন একটা 'হারাই হারাই' ভাব বুকটাকে ঝাঁঝরা করে দিলে আবার কথা বলতে গেলুম, পারলুম না।

আস্তে আস্তে তার হাত দুটি ছাড়িয়ে নিয়ে আমার হাতের উপর বুলোতে বুলোতে বললে, 'আমি পাগল, না, কি? বন্ধু, তুমি কিছু মনে করো না। এই এক বছর ধরে—'

বাধা দিয়ে অতি কষ্টে বললুম, 'আমার উপর মেহেরবান হও—প্রসন্ন হও। আমি কি জানি নে আমি কত অভাজন। তুমি এ শহরে—'

এবারে হেসে উঠে বাধা দিয়ে বললে, '—সবচেয়ে সুন্দরী (আমি কিন্তু তার কুল-গোষ্ঠীর কথা বলতে যাচ্ছিলুম)। না? আমি কুৎসিত হলে তুমি আমায় ভালবাসতে না—সে তো কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আমি মাঝারি হলে কি করতে, বল তো?'

আমি ঝড় কাটাতে ব্যস্ত। হালের সঙ্গে পাল। বললুম, 'এ রকম প্রশ্ন আমি কোনও বইয়ে পড়ি নি। সাধারণত মেয়ে শুধায়, সে সুন্দরী না হলে ভালবাসা পেত কি না?'

'উত্তর দাও।'

'আমি নিজে তো মাঝারি। তুমি তো বেসেছ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তুমি তুর্কী রমণী। তুমি—'

'ব্যস্, ব্যস্, থাক্ থাক্। এবার এদিকে এস। আমার ব্যাগটা খোল তো। হ্যাঁ ওই রুমালে বাঁধা জিনিস।'

সামনের টেবিলে সেটি রেখে রুপোতে সিল্কেতে কাজ করা কিংখাপের রুমালের গিঁট আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে খুলতে লাগল—যেন তীর্থের প্রসাদী। আমি এক দৃষ্টে দেখছিলুম, তার আঙুলের খেলা। প্রত্যেকটি আঙুল যেন এক একটি ব্যালে নর্তকী। হাতের কব্জি দুটি একদম নড়ছে না—আঙুলগুলো এখানে যায়, সেখানে যায়, একটা অসম্ভব অ্যাঙ্গল থেকে চট করে আরেক অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে চলে যায়। পিয়ানো বাজানো এর কাছে কিছুই নয়; সে তো শুধু ডাইনে বাঁয়ের নড়ন চড়ন।

দুখানা রুমাল খোলার পর বেরল গাঢ় নীল রঙে চামড়ায় বাঁধানো একখানি ছোট্ট বই। চামড়ার উপর সূক্ষ্ম সোনালী কাজ। চার কোণ জুড়ে ট্যারচা করে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল-লতা-পাতার নক্‌শার কাজ—তারই মাঝে মাঝে বসে আছে ক্ষুদে ক্ষুদে পাখি। বইয়ের মাঝখানে একটি জোরালো গোল মেডালিয়ন, নামাঙ্কন-স্বাক্ষরলাঞ্ছন সহ।

বললে, 'আরও কাছে এস।'

আঙুলের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে এক একটি করে পাতার প্রান্ত বুলিয়ে সেটিকে উল্টোয় আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে যেন একটি করে নূতন বাগান। পাতার মাঝখানে কুচকুচে কালো কালিতে হাতের লেখা ফার্সী কবিতা আর তার চতুর্দিকের বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির মতিফ। অতি ছোট্ট ছোট্ট গোলাপী রজেটের পাশে ডালের উপর বসে ক্ষুদে ক্ষুদে বুলবুল। কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে লতার উপর দুলছে, কখনও বা ঘাড় নিচু করে গোলাপ কুঁড়ির সঙ্গে কানে কানে কথা কইছে। সখী, জাগো, জাগো। পাঁচ ছটা রঙের এক সপ্তকেই সঙ্গীত বাঁধা হয়েছে, কিন্তু আসল পকড়্ সোনালী, নীল আর গোলাপীতে।

বললে, 'লেখাটা করে দিয়েছেন আগা-ই-আগা ওস্তাদ সির্-বুলন্দ্ কিজ্‌লবাশ। উনিই আমাদের শেষ জরীন্-কলম, সোনার কলমের মালিক। তাঁর ছেলে পর্যন্ত হিন্দুস্থান চলে গিয়েছে ছাপাখানার কাজ শিখতে।' একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

প্রতি দু পাতার মাঝখানে এক একখানি করে অতি পাতলা সাদা কাগজ। আতর মাখানো।

বুঝিয়ে বললে, 'পোকায় কাটবে না আর আতরের তেলের স্নেহ কাগজকে শুকনো হতে দেবে না।' আমার মনে পড়ল সত্যেন দত্তের ফার্সী কবিতার অনুবাদ।

'তবু বসন্ত যৌবন সাথে দু'দিনেই লোপ পায়
কুসুমগন্ধী যৌবন পুঁথি পলে উলটিয়া যায়।'

আবার এ কী অপয়া বচন? না, না। সৃষ্টির প্রথম দিনের প্রথম বুলবুলের সঙ্গে প্রথম গোলাপের মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণীর কানাকানি এখনও আছে, চিরকাল থাকবে।

শব্‌নম কিন্তু-কিন্তু করে কি যেন বলতে চাইছে, বলছে না। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে-মুখ একেবারে সিঁদুরের মত টকটকে।

আমি তাকাতেই সেই মুখে যেন ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। শব্‌নমের মুখে শব্‌নম! ঘাড় ফিরিয়ে অপরাধীর মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আর বর্ডারগুলো আমার আঁকা।'

বলেই ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে।

আমি হরিণশিশুকে নর্‌গিস বনের ভিতর দিয়ে নাচতে দেখলুম। আমার বুখারা-কার্পেট ছিল নর্‌গিস মতিফ।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে হাঁকলে, 'আগা আব্দুর রহ্‌মান। চা খাবে?'

আব্দুর রহ্‌মান হুঙ্কার ছাড়লে, 'চশ্‌ম!'—যেন হুকুমটা কান্দাহার থেকে এসেছে, জবাব সেখানে পৌঁছনো চাই।

কী সৌজন্য! 'চা খাবে?'—'চা আন', নয়। অর্থাৎ 'তুমি যদি খাও, তবে আমিও যেন এক পেয়ালা পাই।' ভৃত্যকে সহচরের মত মধুর সম্ভাষণ। আর আমার আব্দুর রহ্‌মানও কিছু কম নয়। 'চশম'—অর্থাৎ 'আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা আমার 'চশ্‌ম', চোখের মত কিম্মৎবার, মূল্যবান।'

আমার মূল বিস্ময় কিন্তু এতে তো চাপা পড়ে না।

'তুমি এঁকেছ?'

নীরব বীণা।

'তুমি এঁকেছ?'

যেন অতি দূরে সে বীণার প্রথম পিড়িং শোনা গেল 'বড় কাঁচা।'

আমি সম্ভ্রমে বললুম, 'কাঁচা? আশ্চর্য! কাঁচা? তাজ্জব! ক-টা ওস্তাদ এ রকম পারে?'

এবারে কাছে এসে হেসে বললে, 'তুমি কিছু জান না। তাই তোমাকে কবিতা শুনিয়ে সুখ, তোমাকে ছবি দেখিয়ে আনন্দ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'তুমি কি আমাকে অজ গাঁইয়া পেয়েছ? দিল্লির মহাফিজখানাতে আমার দোস্ত রায় আমাকে কলমী কিতাব দেখায় নি?'

আমাকে খুশি করার জন্য বললে, 'তাই সই, তাই সই ওগো তাই সই। কিন্তু আমার ওস্তাদ আগা জমশীদ বুখারী বলেন, "রোজ আট ঘণ্টা করে ত্রিশ বছর আঁকার রেওয়াজ করলে তবে ছবি আঁকার কল রপ্ত হয়। এবং তারপর চলে যাবে চোখের জ্যোতি।" '

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'বল কি?'

'হ্যাঁ। এবং বলেন, "কিন্তু কোনও দুঃখ নেই। তুমি নিজেই জান না তোমার মূল্য কি?" '

'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে?'

খুশি হয়ে বললে, 'বিলকুল্!—"প্রকৃত জহুরী সমঝে যাবে তোমার প্রথম ছবিতে কোন্ শেষ কথা লুকনো আছে, আর তোমার শেষ ছবির সব মিলে যাবে প্রথম ছবির প্রথম ঠেকায়।" তারপর তিনি খুব জোর দিয়ে বলতেন, "হুনরে যখন পরিপূর্ণতাই এসে গেল তখন আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? এবং যদিস্যাৎ তার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায় তবে সেইটে ভাঙিয়ে খাবে তোমার শিষ্যেরা —তাদের জন্যও তো কিছু রাখতে হয়। তখন তোমার পাকা গম-রঙের বেহালার সুর শোনা যাবে তাদের কাঁচা সবুজ বেহালার রেওয়াজে।" '

আমি বললুম, 'চমৎকার।'

'আমি তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ কণ্ঠস্থ করে রেখেছি।'

আমি শুধালুম, 'কার কাব্য আছে এতে?'

'অনেকের। তোমাকে যেগুলো শুনিয়েছি আর যেগুলো শোনাব। তুমি যে ক-টি বলেছ তাও আছে। তবে বেশির ভাগ আবু তালিব কলীম কাশানীর। ইনি আসলে ইরানী কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাদশা জাহাঙ্গীরের সভাকবি হন। আর আছে সাঈব্ তবরীজীর। ইনিও হিন্দুস্থানে কিছুকাল ছিলেন—কলীমের বন্ধু। তখন ইরানে রব উঠেছে—

"সকল মাথায় তুর্কী নাচন তোমার লাগি, প্রিয়ে,
লক্ষপতি হবে সবাই হিন্দুস্থানে গিয়ে!"

এসব আমি এবারে কান্দাহারে শিখেছি। পরে বলব।'

বললে, 'তুমি কখনও জানবে কি, বুঝবে কি, ছবি আঁকার সময় প্রতিটি মুহূর্তে তুমি আমার সামনে ছিলে? প্রতিটি তুলির টানে আছে তোমার চুল, প্রতিটি বাঁকা রেখায় আছে তোমার ভুরু। তোমার হাসি থেকে নিয়েছি গোলাপী, তোমার স্বর থেকে নিয়েছি রূপালী।'

আমি বললুম, 'দয়া কর।'

'আমায় বলতে দাও। এই একবারের মত।'

'শেষ বুলবুলের চোখ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে জানেমন্—বড় চাচা—ঘরে ঢুকে বললেন, "চলো মুসাফির, বাঁধ গাটুরিয়া, বহুদূর জানে হোয়েগা।" কাল সকালেই কাবুল যাত্রা। বাদশা আপন গাড়ি পাঠিয়েছেন। তাঁর সবুর সইছে না। তাই তো তোমাকে খবর দিতে পারি নি।'

আব্দুর রহ্‌মান চা নিয়ে এল। শব্‌নম বললে, 'আগা রহ্‌মান, তুমি তোপল্ খানকে প্রতিবারে কোর্মা-কালিয়া খাইয়েছ আর সিনেমা দেখিয়েছ। খুদা তোমার মঙ্গল করুন। এদিকে এস। এই নাও। কান্দাহার থেকে এনেছি।'

ব্যাগ খুলে শব্‌নম বের করলে তাবিজের মত ছোট্ট একখানি কুরান্ শরীফ। সঙ্গে আতশী কাচ। তাই দিয়ে পড়তে হয়।

আব্দুর রহ্‌মান নিচু হয়ে হাত ছুঁইয়ে হাতখানি আপন চোখে চেপে ধরল। তারপর কুরান্‌খানি দু-হাতে মাথার উপর তুলে ধরে আস্তে আস্তে চলে গেল। তার মুখের ভাব কি করে বর্ণাই! জোয়ানের ইয়া ব্বড়া মুখখানা যেন কচি শিশুর হাসিমুখে পরিণত হল।

কী অসাধারণ বুদ্ধিমতী এই শব্‌নম। জানত, অন্য কিছু আব্দুর রহ্‌মানকে গছানো যাবে না।

শব্‌নমের আঁকা বর্ডার দেখতে গিয়ে সে শুধালে, 'আচ্ছা বল তো, এই বুলবুলের নাম কি?'

আমি বললুম, 'বুলবুল তো এক রকমেরই হয়।'

'এই বুলবুল, এ বইয়ের সব বুলবুল শব্‌নম্। বুলবুল এসেছিল বাগানে, সে-ই প্রথম গোলাপকে প্রেম নিবেদন করবে। এসে দেখে গোলাপ আগের থেকেই বাতাসে বাতাসে তার প্রেমের বারতা বিছিয়ে রেখেছে। গোলাপের কাছে পৌঁছবার বহু পূর্বেই সে সৌরভের ডাক শুনতে পেল, "এস এস, প্রিয়া।" মনে আছে?'

'তুমি কেন দুঃখ কর, বুলবুল? শব্‌নম যদি সমস্ত রাত গোলাপের উপর অশ্রুবর্ষণ না করত তবে কি ফুটতে পারত?'

জড়ানো কণ্ঠে বললে, 'সেই ভালো, ওগো শব্‌নমের-নিশির স্বপ্ন। এই নাও তোমার বই।'

আমি প্রতিবাদ করেছি।

শান্ত কণ্ঠে বললে, 'এতে আছে আমার চোখের ঝরা জল। সে জল তো আমি চোখে পুরে নিতে পারব না। এই জল দেখে যখন তোমার চোখে জল টলটল করবে তখনই তো এ তার চরম মূল্য পাবে।'

আমি বইখানা দুই হাত দিয়ে তুলে ধরে ঠোঁট চেপে চুমা দিলুম—

কিন্তু আমার চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

শব্‌নম আস্তে আস্তে, অতি ধীরে ধীরে, ঘাড় ঘোরালে। তার চোখে ছিল স্বচ্ছ জলের অতল রহস্য।

আমি বললুম, 'কিন্তু বন্ধু, তুমি তো এর আগেই আমাকে সওগাত দিয়েছ।'

অবাক হয়ে বললে, 'কখন?'

'প্রথম রাত্রেই।' বলতে বলতে আমি ওয়েস্ট কোটের বুক পকেট থেকে বের করলুম একটি সোনার ভিজিটিং-কার্ড কেস। এটি আমি সওগাত রাখবার জন্য প্যারিস থেকে আনিয়েছিলুম। শব্‌নমের হাতে দিলুম।

সে খুলে দেখে ভিতরে একখানি ভিজিটিং-কার্ড। সেই কার্ডে অতি সযত্নে জড়ানো একগাছি চুল।

'চোর, চোর' বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ওস্তাদ সেতারী বাজন আরম্ভ করার পূর্বে যে রকম সব কটা ঘাটের উপর টুংটাং করে হাত চালিয়ে নেন সেইরকম পর্দার পর পর্দা হাসলে। বললে, 'তাই বল। আমি পরদিন সকালবেলা চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখি একগাছা চুল কম। খোঁজ খোঁজ, ঢোঁড় ঢোঁড় রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। শাজাদীর একগাছা চুল চুরি গেছে। বাদশা জানতে পেরে কোটালকে ডেকে কোতল কাবাব করেন আর কি! আমি স্বয়ং গেলুম টেনিসকোর্টে, তারপর গেলুম হোটেলে, তোমার ঘরে—'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমার ঘরে?'

'হ্যাঁ রে, জান্, হাঁ। আমার জান্ গিয়েছিল। তখন আকাশে আদম সুরৎ— কালপুরুষ। তারপর মেঘ। তারপর বৃষ্টি। আমার জান্ ভিজে নেয়ে বাড়ি ফিরল। সেই হৃদয়—যাকে তুমি বল, "সে তো একবিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি"।'

'তাই বল। আমি ভেবেছিলুম, তোমার চোখ থেকে ভানুমতী বেরিয়ে কাল-পুরুষের আয়োনোস্ফিয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে ঢুকল আমার চোখে।'

'ওরে খোদার সিধে, তাহলে যে এ ব্রহ্মাণ্ডে যত লোক তাকিয়েছিল—' হঠাৎ থমকে গিয়ে বললে, 'ওই য্ যা। যে কাজের জন্য এসেছিলুম তার আসলটাই ভুলে গিয়েছিলুম। তুমি বুধবার দিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারবে? এই ধর, তিনটে নাগাদ।'

আমি বললুম, 'কি যে বল? কিন্তু কেন? আমি যে ভয় পাচ্ছি।'

'এখনও তোমার ভয় গেল না? ওরে ভীরু, আমাকে বিশ্বাস করতে শেখ।'

ব্যাগটা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেই বুঝতুম, এবারে তার যাবার সময় এসেছে। শব্‌নম আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলে।

আমি কাতর কণ্ঠে বললুম, 'ও-রকম তুমি হঠাৎ যেতে চাইলে আমার বড় বাজে। আমাকে একটু সয়ে নিতে দাও।'

বললে, 'আমি যখন আসি, তখন তো বল না, "বাইরে সিঁড়িতে গিয়ে বস, একটু সয়ে নিতে দাও"।'

তার বিদায়ের বেলা আমার কোন উত্তর জোগায় না।

দেউড়ির কাছে এসে আকাশের দিকে নাকটি তুলে দুবার শ্বাস নিলে। বললে, 'শব্‌নম পড়ছে।'

এবারে কথা বলার শক্তি দয়াময় দিলেন। বললুম, 'আমার শব্‌নম যেন মাত্র একটি গোলাপে বর্ষে।'

'গোলাপে ঢুকে সে মুক্তো হয়ে গিয়েছে।'

## ॥ তিন ॥

আমি রোমাণ্টিক নই। এ প্রেম আমার সাজে না। এ-প্রেম তারই জন্য, যে বেদনা সইতে জানে, যে সংগ্রামে ভয় পায় না।

আমি ছেলেবেলা থেকেই ভীরু। কৈশোরে সাহস করে কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারি নি। অনাদৃতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কোনও কোনও মেয়ের স্বভাব। তারা যেচে কথা কইলে আমি লজ্জায় ঘেমে নেয়ে কি উত্তর দিয়েছি তা আমি চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারব না।

চণ্ডীদাস পড়ে পেয়েছি ভয়। দিনের পর দিন শ্রীরাধার মত সইতে হবে আমাকে বিরহ দহন? দরকার নেই আমার কানুর প্রেম। গোপিনীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হওয়ার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। বনস্পতির গৌরব নিয়ে, উঁচু

হয়ে দাঁড়িয়ে, বিদ্যুৎপাত ঝঞ্ঝা-বাত সইবার মত শক্তি আর সাহস আমার নেই। আমি মেহদির বেড়া হয়ে থাকতেই রাজী। আর তিনি যদি তার উপর দয়া করে সাদা-মাটা দু-একটি ফুল ফোটান তবে আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান বলে তাঁকে বার বার নমস্কার করব।

আমি চেয়েছি ঘরের প্রেম, বধূর প্রেম—বঁধুর প্রেম আমি চাই নি। সংসারের অবহেলা অনাদরের মাঝখানে এইটুকু সান্ত্বনা যে, বাড়ি ফিরলে আমি সেখানে সবচেয়ে আদরের ধন। সারা দিনমান সে আমার সঙ্গে থাকবে স্বপ্নের মত—আমি চলাফেরা করব সেই স্বপ্ন-সম্মোহনে, ঘুমে-চলার রোগী যে রকম হাঁটে। আর রাত্রিকালে সে পাশে থাকবে—জানলার কাছে চাঁদ যে রকম অপলক দৃষ্টিতে নিদ্রিতের শিয়রে জাগে।

মণি ভরা, প্রবাল-হার-পরা নীলাক্ষী নীলাম্বুজের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাই নি। গ্রামের নদীটি পর্যন্ত আমি হতে চাই নি। আমি হতে চেয়েছিলুম বাড়ির পিছনের ছোট্ট পুকুরটি। যেটি আমার বধূর, আমার নির্জনে পাতা সংসারের জননীর একান্ত আপন। সেখানে সামান্যতম তরঙ্গ উঠে আমাকে বিক্ষুব্ধ করে না, আমার বধূকে ভীতার্ত করে না।

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।

তবু ভাগ্যের কাছে স্বীকার করব, এই চল্লিশ ঘণ্টা আমার কেটেছে যেন এক অপূর্ব সঙ্গীতের সুরলোকে। চল্লিশ ঘণ্টার দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি, আমার তীর্থাবসানের দরগা-চূড়ো। আর যেতে যেতে দেখছি, পথের দুপাশে কত অতিথিশালার বিশ্রান্তি, কত সাধু-সজ্জন-সঙ্গম, শুনছি মন্দিরের ঘণ্টা, দূর হতে ভেসে-আসা ভোরবেলাকার আজান।

এবারে ঘরে ঢুকল ঝড়ের বেগে। যেন আসতে কত দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমার সামনে এসে হিন্দুস্থানী কায়দায় নমস্কার-মুদ্রাতে হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'হামি তোঁকে ব্বালোবাসি।'

প্রথমটায় বুঝি নি। তারপর হো হো করে হেসে উঠেছিলুম।

'বুঝেছ?'

আমি বললুম, 'এ তুমি শিখলে কোথায়?'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললে, 'আমি করলুম প্রেম নিবেদন, আর তুমি হাসলে।' চোখ থেকে আগুন বেরুচ্ছে

না বটে, কিন্তু ভেজা দিনের দেশলাইয়ের মত কখন যে জ্বলবে ঠিক নেই।

আমি অতি কষ্টে তাকে শান্ত করলুম।

আমি কি মূর্খ। উচ্চারণ আর ব্যাকরণের দিকে গেল কান?—বক্তব্যটা উপেক্ষা করে গেলুম। ধন্য সেই রাজা যিনি ভিখারিনীর ছেঁড়া কাপড় দেখেন নি—দেখেছিলেন তার মুখ, তার হৃদয়, আর তাকে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে। আমি আহাম্মুক, শাহজাদীকে দেখছি ভিখারিনীর বেশে।

নিজের গালে নিজে চড় মেরেছি বহুবার—একবার মারলুম লাথি!

বললে, 'হিংসে হল না কেন তোমার? কোনও ইয়াংম্যান্ আমাকে শিখিয়েছে সেই সন্দেহে?'

আমি বললুম, 'সে বাঙালী ইয়াংম্যান্ নয়।'

হার মেনে বললে, 'কান্দাহারে আমাদের এক চাপরাসী ছিল—সে যৌবনে কলকাত্তায় নোকরী করত। তার কাছ থেকে শিখেছি।'

শব্‌নম ভালো করে উচ্চারণটা শিখল। কারণ এই কথাগুলো শুদ্ধভাবে বাঙলাতে বলতে বা উচ্চারণ করতে কোনও কাবুলীর অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। শুধু বাধল গিয়ে 'ভ' অক্ষরে। ভারতবর্ষের বাইরে মহাপ্রাণ বর্ণ নেই বললেও চলে—এমন কি দক্ষিণ ভারতেও নেই।

শেষটায় যখন বললুম 'ঠিক' তখন ভারী খুশি হল। শুধালে, 'আর তো তোমার কোনও ফরিয়াদ নেই?'

আমি চিন্তা করে বললুম, 'আমার আর কোনও ফরিয়াদ নেই। ভবিষ্যতেও থাকবে না।'

সন্দেহ-নয়নে তাকিয়ে শুধালে, 'হঠাৎ?'

'হঠাৎ-ই। কাল রাত্রে মনে পড়ল একটি সংস্কৃত শ্লোক :—

"শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখ দায়িত্বং কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ?
।

শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়
বন্ধু বিচ্ছেদে হয় কষ্ট সাতিশয়।
উভয়েই বহু কষ্ট দেয় যদি মনে
শত্রু মিত্রে কিবা ভেদ তবে এ ভুবনে?"

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্রের অনুবাদ

শব্‌নম বললে, 'পয়লা নম্বরী প্যারাডক্স্। এরপর আর কোনও ফরিয়াদ থাকার কথা নয়।' তারপর চিন্তা করতে করতে বললে, 'কিন্তু এর উত্তরটা কি?'

'তুমি বল।'

'দোস্ত মঙ্গল কামনা করে, দুশমন বিনাশ কামনা করে। আমি কামনাটা বড় করে দেখি। ফলটা অত বড় করে না।'

আমি বললুম, 'শাবাশ। দোস্ত-ই-কান্-ই-মন্—আমার দিলের দোস্ত—শাবাশ। হিন্দুস্থানের ধর্মগুরুও বলেছেন, মা ফলেষু কদাচন।'

আরও কিছু কথা হল।

আজ কিন্তু সমস্তক্ষণ লক্ষ করছিলুম, আজ যেন শব্‌নমের মন অন্য কোনখানে। হয়তো কোনও কথা বলতে চায় কিংবা শুধাতে চায়।

এমন সময় রাস্তায় হঠাৎ চেঁচামেচি আর আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এত জোর যে আমরা দুজনেই শুনতে পেলুম। শব্দটা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল দেখে আমি একটু উৎকণ্ঠিত হলুম। এমন সময় দূর হতে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল। দুজনাতে নিচে নেমে খবর নিয়ে জানা গেল ডাকাতের সর্দার বাচ্চায়ে-সকাও কাবুল আক্রমণ করতে এসেছে। আমানুল্লাকে তাড়াবে।

আফগানিস্থানের এ-অধ্যায় বিস্ময়জনক। যে কোনও প্রামাণিক ইতিহাসে পাওয়া যায়। এক বাঙালী মুসলমানও এ-বিষয়ে লিখেছেন।

শব্‌নম আমাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে এল।

ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগল। একবার বললে, 'আমানুল্লাকে বাবা বার বার বলেছেন, তিনি বারুদের পিপের উপর বসে আছেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চান নি। যাক্‌গে, আমার তাতে কি?'

এ রকম আর্তনাদ আর গুলির আওয়াজ মেশানো অট্টরোল আমি জীবনে কখনও শুনি নি। একবার ভাবলুম, শব্‌নমকে বলি, আমি আর আব্দুর রহ্‌মান তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি কিন্তু সে সঙ্কটে আমার সত্য কর্তব্য কি, কিছুতেই স্থির করতে পারলুম না। ঘরের চেয়ে রাস্তা যে বেশি বিপজ্জনক। ওদিকে আবার শব্‌নমদের আপন ভদ্রাসন নিশ্চয়ই আমার বাড়ির চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত। কি করি?

শব্‌নম পায়চারি করছে। আপন মনে বললে, 'কেউ জানতো না। বাবাও জানতেন না।'

পায়চারি বন্ধ করে বললে, 'শুনতে পাচ্ছ, বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে?'

বহু দূরের বন্দুকের শব্দ এগিয়ে আসছে না পিছিয়ে যাচ্ছে বোঝবার মত সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি সৃষ্টিকর্তা নিরীহ বঙ্গসন্তানকে দেন নি।

শব্‌নম আবার বললে, 'আমার তাতে কি?'

আমি তার মানে বুঝতে পারলুম না।

আধঘণ্টার উপর হয়ে গিয়েছে—প্রথম বন্দুকের আওয়াজ শোনার পর।

এমন সময় তোপল্ খান এসে ঘরে ঢুকল। সেলাম করে শব্‌নমকে শুধালে, 'বাড়ি যাবে না, দিদি?'

শব্‌নম বললে, 'যাব। পরে। এখন তুমি নিচে গিয়ে আব্দুর রহ্‌মানের সঙ্গে দেউড়ি-দরজার উপর পাথর চাপাও। আর যা-যা সব করতে হয়।'

তোপল্ খান যেভাবে ঘাড় নেড়ে চলে গেল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল শব্‌নমের প্রতি তোপলের নির্ভর মুর্শীদের উপর চেলার বিশ্বাসের মত। ভ্যালে-র কাছে তা হলে হিরোইন হওয়াটা অসম্ভব নয়।

শব্‌নমের মুখে হাসি ফুটেছে। আমার একটু দুঃখ হল। আমার গায়ের জোর ওর মত হল না কেন।

শব্‌নম আমার সামনে মুখোমুখি শুয়ে বললে, 'তুমি বড় সরল। ভাবলে, তোপল্‌কে দেখে আমি ভরসা পেলুম। এই বন্দুক পিস্তলের জমানায়? যাক্‌গে।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

শান্ত কণ্ঠে, আমার চোখে চোখ রেখে বললে, 'আমি স্থির করেছি আমাদের বিয়ে হবে। তুমি?'

ধাক্কাটা কি রকম লেগেছিল আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব না। আমার মুখে কথা ফোটে নি এবং চেহারায় যদি কোনও ভাব ফুটে থাকে তবে সেটা হতভম্বের!

সেই শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'তোমার চোখ আমি চিনি। তোমাকে কিচ্ছু বলতে হবে না। এবারে আমি জিতেছি।'

তারপর চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার দু জানুর উপর দুহাতে ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে বললে, 'এবারে সব কথা শোন।'

আমার মুখ দিয়ে তখনও কথা ফোটে নি।

বললে, 'আমি জানতুম, এর একটা বোঝা-পড়া একদিন করতেই হবে। তাই আজকের দিনটা ঠিক করেছিলুম, আস্তে ধীরে তোমার মনের গতি দেখে, প্রসন্ন মুহূর্তে আমি যে একান্ত সর্বস্বান্ত তোমার হতে চাই সেইটে জানাব। ইতিমধ্যে

ডাকু এসে জিনিসটা যেমন কঠিন করে তুলল, তেমনি সহজও করে দিল। এখন কতদিন এ রকম চলবে, কেউ বলতে পারে না! আর সময় নেই। আজই, এখখুনি আমাদের বিয়ে।'

'হ্যাঁ, এখখুনি।'

আমি কিছু বলতে চাই নি।

'হ্যাঁ। এখখুনি। তুমি ভেবেছিলে, আমি উত্তেজিত হয়েছি, ডাকু এসেছে বলে। তা নয়। আমি খুঁজছিলুম বিয়ের দুজন সাক্ষী। আব্দুর রহমান তো আছেই কিন্তু ভিড় ঠেলে কাকে ডেকে নিয়ে আসি, রাস্তায় এই ভয়ে-পাগলদের ডাকলেও কেউ আসবে না। তোপল্ খান আসাতে আমার দুশ্চিন্তার অবসান হল।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি ওজু করে এস।'

মোহগ্রস্তের মত ওজু সেরে বাইরে এসে দেখি, তোপল্ আর রহমানে মিলে ড্রইং রুমের আসবাবপত্র সরিয়ে মাঝখানে আরেকখানা কার্পেট পেতেছে। শুনেছি চাকরবাকরদের বখশিশ দিলে তারা খুশি হয়। এদের মুখে আজ যে বদান্ততা দেখলুম, সে তো লক্ষপতির মুখেও আমি কখনও দেখি নি।

শবনম এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে কী যেন পড়ছে। তার মুখচ্ছবি বড়ই শান্ত। আমি কাছে যেতে কী কী করতে হবে বলে দিলে।

দুজনাতে মুখোমুখি হয়ে বসলুম। শবনম মুখের ওপর ওড়না টেনে দিয়ে মাথা নিচু করলে। আমি বললুম, 'আমি অমুক, অমুকের ছেলে, তুমি অমুক, অমুকের মেয়ে, তোমাকে স্ত্রীধন দিয়ে—'

তোপল্ খান শুধালে, 'স্ত্রীধন কত?'

আমি বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

তোপল্ খান বললে, 'একটা অঙ্ক বললে ভাল হয়।'

আমি জোর দিয়ে আবার বললুম, 'আমার সর্বস্ব।'

'—স্ত্রীধন দিয়ে মুহম্মদী চার শর্তে তোমাকে স্ত্রীরূপে পেতে চাই। তুমি রাজী?'

এ যেন শবনমের গলা নয়। দূর থেকে ভেসে আসছে, অতি মৃদুকণ্ঠে তার সম্মতি।

তিনবার ওই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হল। তিনবার সে সম্মতি জানালে।

আমি সাক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আপনারা এই বিবাহের শাস্ত্র-সম্মত দুই সাক্ষী। আপনারা আমার প্রস্তাব আর মুসম্মৎ শবনম বানুর সম্মতি তিনবার শুনেছেন?'

দুজনাই বললে, 'শুনেছি।'

শব্‌নমের কথা ঠিক হলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ এইখানেই শেষ। তোপল্ খান বহু বিয়ে দেখেছে বলে দুহাত তুলে একটা প্রার্থনা করল। আমিও হাত তুললুম। শব্‌নম মাথা নিচু করে একেবারে মাটির কাছে নামিয়ে, দুহাত দিয়ে প্রায় মুখ ঢেকে।

প্রার্থনাতে মাত্র একটি কথা ছিল। 'হে খুদা, আদম এবং হভার মধ্যে, ইউসুফ ও জোলেখার মধ্যে, হজ্‌রৎ খাদিজার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এ দুজনার ভিতর সেই রকম প্রেম হোক।'

আব্দুর রহ্‌মান উদ্বাহু হয়ে প্রার্থনার সময় জোর গলায় ঘন ঘন বললে, 'আমিন, আমিন—হে আল্লা তাই হোক, তাই হোক।'

আমিন! আমিন!! আমিন!!!

ওরা দুজনে চলে যাওয়ার পর আমি যেখানে ছিলুম সেখানেই বসে রইলুম। কিছুই তো জানি নে তারপর কি করতে হয়। শব্‌নম কিছু বলে নি।

উঠে গিয়ে সামনে বসে বললুম, 'শব্‌নম।'

তাকিয়ে দেখি ওড়না ভেজা।

কিছু না ভেবেই ওড়না সরালুম। সুস্থ বুদ্ধিতে পারতুম না। দেখি, শব্‌নমের চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

শুধালুম, 'এ কী?'

শব্‌নম চোখ মেলে বললে, 'বল।'

তখন দেখি, আমার বলবার কিছুই নেই।

তাকে তুলে ধরে সোফার দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখি সেটাকে সরানো হয়েছে। আমি সেদিকে যাচ্ছিলুম। বললে, 'না। ওদের ডাক। তোমার ঘর আমি সেই রকমই চাই।' ঘর ঠিক করা হল।

বললে, 'তুমি শোও।'

আমার পাশে আধ-হেলান দিয়ে বসে আমার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বললে, 'ঠিক এ-রকম হবে আমি ভাবি নি। আমি ভেবেছিলুম, হয়তো খানা-পিনা গান-বাজনা বোমা-বারুদ ফাটিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা আমি করতে পারব; আর তা সম্ভব না হলে আমি অন্যটার জন্যও তৈরি ছিলুম।'

আমি বললুম, 'এই তো ভাল।'

'সে কি আমি জানি নে? খানা-পিনা বন্ধু-সমাগম হল না, তার জন্যে আমাদের কি দুঃখ? তবে একটা পদ এত বেশি হচ্ছে যে আর সব পুষিয়ে দিচ্ছে। শুনছ শাদির 'শাদিয়ানা'? বোমা-বারুদ? কী রকম বন্দুক মেশিনগানের শব্দ হচ্ছে? আমানুল্লার শালীর বিয়েতেও এর এক আনা পরিমাণও হয় নি। ডাকাত আমাদের বিয়ের শাদিয়ানার ভার নিয়েছে—না? এও তো ডাকাতির বিয়ে!'

আমি কিচ্ছুটি বলি নি। আমার হিয়া কানায় কানায় ভরা। আমার জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে। পাল দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হাওয়াকে মুক্তি দিয়েছে। হাল-বৈঠা নিস্তব্ধ। উটের ঘণ্টা আর বাজছে না।

বললে, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।'

এবারে আমাকে মুখ খুলতে হল।

ডান হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বললে, 'আমার শওহর—স্বামী কথা বলে কম। শোন—

'তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমাকে কতখানি চাও, সে আমি জানতুম। আরও জানতুম, সর্বশেষ চাওয়া, সমাজের সামনে পাওয়া, তুমি সাহস করে নিজের মনের কাছেই চাইতে পার নি। আমার কাছে বলা—সে তো বহু দূরে। আমার কিন্তু তখন বড্ড কষ্ট হয়েছে। যখন নিতান্ত সইতে পারি নি তখন শুধু বলেছি, আমার কাছে ওষুধ আছে। তুমি নিশ্চয়ই আসমান্ জমীন হাতড়েছ, কী ওষুধ? তুমি বিদেশী, তুমি কী করে জানবে যে, যত অসুবিধেই হোক্ আমি আমার দেশের, সমাজের সম্মতি নিয়েই বিয়ে করতে চাই। আমার জন্য অতখানি নয়, যতখানি তোমার জন্যে। তুমি কেন ডাকাতের বেশে আমাকে ছিনিয়ে নেবে? মায়-মুরুব্বি-ইয়ার-দোস্ত এবং আরও পাঁচজনের প্রসন্নকল্যাণ আশীর্বাদের মাঝখানে, আমরা একে অন্যকে বরণ করব। গুল বুলবুল এক বাগিচাতেই থাকবে। চতুর্দিকে আরও ফুল আরও বুলবুল। আমি কোন্ দুঃখে আমার শাখা ছেড়ে তোমাকে ঠোঁটে করে নিয়ে মরুভূমির কিনারায় বসব।'

'সমাজ আপত্তি করলে?'

'থোড়াই পরোয়া করতুম। ধর্মমতে তুমি আমি, সমাজ কেন, বাপ-মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে করতে পারি। কিন্তু সমাজ কি শের না বাবুর, বাঘ না সিংহ, যে তাকে হামেহাল পিস্তল দেখাতে হবে? সমাজ তেজী ঘোড়া। দানা-পানি দেবে, তার পিঠে চড়বে। বেয়াড়ামি করলে পায়ের কাঁটা দিয়ে অল্প গুঁতো দেবে,

আরও বেশি হলে চাবুক, আর একদম বিগড়ে গেলে পিস্তল। তারপর নূতন ঘোড়া কিনবে—নূতন সমাজ গড়বে।'

'আর এখন ?'

'এখন তো সব-কিছু ফৈসালা হয়ে গেল। প্রথম বলি, কাবুলের সমাজ ঠিক আমাদের সমাজ নয়। আমাদের গুটিকয়েক পরিবার নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সমাজ। সে সমাজ এখন আমাদের আশীর্বাদ করবে। জান, এদেশে এরকম বিশৃঙ্খলা প্রায়ই হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই, শহরে শহরে লড়াই, রাজায় রাজায় লড়াই। রাজায় ডাকুতে অবশ্য এই প্রথম। তখন ভিন্ মহল্লায় গিয়ে কখনও কখনও পনেরো দিন, এক মাস আটকা পড়ে যেতে হয়। সমাজ শুনে বলবে, "এই তো ভাল। তারা শাস্ত্রানুযায়ী কাজ করেছে।" পরে যখন সমাজ-পতিরা কানাঘুসো শুনবেন, আগের থেকে মহব্বৎ ছিল, তখন তারা আরও খুশি হয়ে দাড়ি দুলোতে দুলোতে বলবেন, "বেহ্‌তর্ শুদ্, খয়্‌লী বেহ্‌তর্ শুদ্—আরও ভাল। লোকলজ্জার ভয়ে বিয়ে করার চেয়ে দিলের টানে বিয়ে করা অনেক ভাল—বহুৎ বেহ্‌তর্।"

'তুমি কিন্তু ভেবো না, তোমার বাড়িতে পনেরো দিন থাকতে হবে বলে সেই অছিলা নিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছি। তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি আমার হৃদয়ের হয়ে মনের কাছে প্রস্তাব পেশ করি হোটেলের বারান্দায়। মন বিচক্ষণ জন। সে সায় দিলে, অনেক ভেবে-চিন্তে—নদী তীরে।

'আর এখন ? এখন যে রুদ্রের নৃত্য আরম্ভ হল তার শেষ কবে কোথায় কে জানে ? তাই বিয়েটা চুকিয়ে রাখলুম। ফ্যাতাকঁপ্লি। আমার যা করার করা হয়ে গিয়েছে, এখন আর সবাই এর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াক।'

দুঃখ করে ফের বললে, 'ওরা দেখছে আমানুল্লার রাজ মুকুট। ওদিকে তার যে শক্তিক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেটা কেউ লক্ষ্য করছে না। কবি সাঈব বড় বেদনাতেই বলেছিলেন :

"মোম বাতিটির আলোর মুকুট বাখানি কবি কী বলে !
কেউ দেখে না তো ওদিকে বেচারী পলে পলে যায় গলে।" '

তারপর শব্‌নমের মনে কী ভাবোদয় হল জানি নে। আমার কানের কাছে মুখ এনে সেটাতে দিল কামড়। বললে, 'ভেবো না, তোপল্ খানের প্রার্থনা তোমার কান কামড়ানোর স্বর্গদ্বার আমার জন্য খুলে দিল। ও জানে না, তুমিও জান না, আমি তার অনেক পূর্বেই স্বর্গের ভিতরে বসে আছি। কিন্তু বন্ধু, আমার

মনে সন্দেহ জাগছে, তুমি আমার কথায় কানে দিচ্ছ না।'

আমি খোলাখুলি সব কিছু বলব বলে স্থির করেছি।

বললুম, 'দেখ শব্‌নম—'

'শব্‌নম শিউলি—না,—শিউলি শব্‌নম।'

আমি বললুম, 'শিশির-সিঞ্চিত শেফালি—শব্‌নমে ভেজা শিউলি। হিমিকা—

'এটা কী শব্দ? আগে তো শুনি নি।'

'শব্‌নমের অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। হিমালয় জান তো? তারই হিম; বাঙলায় শুধু হিমি।'

'আমার সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে, "হিমিকা"।'

আমি বললুম,

"কানে কানে কহি তোরে

বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব হিমিকা নাম ধরে।"

বললে, 'ভারি মধুর। আমার ইচ্ছা হয়, সমস্ত রাত এই রকম কবিতা শুনি। কিন্তু এখন বল, তুমি কী ভাবছিলে।'

'তোমার বাবা কি তোমার জন্য চিন্তিত হচ্ছেন না।' আমি ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলেছিলুম। ও যদি কিছু মনে করে। আমার ভয় ভুল।

নিঃসঙ্কোচে বললে, 'আগে হলে বলতুম, তুমি তোমার বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াচ্ছ। এখন এটা তো আমার বাড়ি। এটা আমার আশ্রয়। এক্ষুনি যে মুহম্মদী চার শর্তে আমাকে বিয়ে করলে তার এক শর্ত হচ্ছে স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া।'

'আপন বাড়িতে আশ্রয় দেব তো বলি নি। সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'এ কী হচ্ছে? চার শর্তের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পূর্বেই তুমি শর্ত এড়াবার গলি খুঁজছ? তবে শোন, আমার আব্বাজান আমার জন্য এক দানা গম পর্যন্ত ভাববেন না। আমরা দু-দুটো-লড়াই-ফসাদ্ দেখেছি। একবার তিনি আটকা পড়েন। আরেকবার আমি। তিনি বয়েৎ-বাজি (কবির লড়াই) করেছিলেন কোন এক আস্তাবলে আর আমি পাশ বালিশ জাবড়ে ধরে ভঁস্‌ভঁস্ করে ঘুমিয়েছিলুম এক বান্ধবীর বাড়িতে। আসলে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না, যখন শুনবেন, তোপল্ খান বাড়ি ফেরে নি। যণ্ডা হলে কী হয়, মাথায় যা মগজ তা দিয়ে মাছ ধরার একটা টোপ পর্যন্ত হয় না। এই দেখলে না, আজ সন্ধ্যায় আরেকটু হলে আমাকে কী রকম ডুবিয়েছিল। তুমি বলছিলে, তোমার সর্বস্ব দেবে, স্ত্রীধন হিসেবে, আর ওই অগা তোপলটা কনে পক্ষের সাক্ষী

হয়ে "অঙ্ক" চেয়ে সেটা কমাতে যাচ্ছিল। আব্বা জানতে পেলে ওকে আইসক্রীম-ফালুদা করে ছাড়বেন।'

আমি শুধালুম, 'তিনি জানবেন নাকি ?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই জানবেন। আজ না হয় না-ই বা জানলেন।'

আমি শুধালুম, 'তখন ?'

হেসে উঠে যা বললে সেটি রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ছন্দে গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন :

"ওরে ভীরু, তোর উপরে নেই ভুবনের ভার।"

বললে, 'জানেমন্ জানে আমি প্রেমে পড়েছি। আর কিচ্ছু না। কিন্তু আমার সম্পর্কে এক দিদমণি আছেন। ফিরিশ্‌তার মত পবিত্র পুণ্যবতী। তাঁকে সব খুলে বলে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এক লহমামাত্র চিন্তা না করেই বললেন, "যাকে তোর হৃদয় চায় তাকে বিয়ে করবার অধিকার তোকে আল্লা দিয়েছে। আর কারও হক্ক নেই তোদের মাঝখানে দাঁড়াবার।" ব্যাস্। বুঝলে ? আমার বাবা আমাকে ভালবাসেন।'

'সর্দার আওরঙ্গজেব খানকে আমি চটাতে পারি, দরকার হলে ; কিন্তু আমার শ্বশুর মশাইয়ের বিরাগভাজন হতে চাই নে।'

খুশি হয়ে বললে, 'ঠিক তাই। আমিও তাই চাই বলে এত মারপ্যাঁচ। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ এই শেষ কথা। গ্রামোফোনের এই শেষ রেকর্ড। বুঝলে ?'

আর তার কী তুর্কী নাচ! কখনও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে কংগ্রেসী লেকচার দেয়, কখনও ঝুপ করে কার্পেটের উপর বসে দু হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিবুক হাঁটুর উপর রেখে, কখনও আর্ম-চেয়ারে বসে আমার কাছের চেয়ারটা টেনে এনে তার পা দু'খানা লম্বা করে দিয়ে, কখনও আমার জানু জড়িয়ে ধরে আমার হাঁটুর উপর তার চিবুক রেখে, কখনও আমাকে দাঁড় করিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দুহাত রেখে আর কখনও বা আমাকে সোফায় বসিয়ে একান্তে আমার পায়ের কাছে আসন নিয়ে।

আর ঘড়ি ঘড়ি আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, বল তো, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস ? এক্ খরওয়ার ? এক্-ও-নীম্ খরওয়ার ?—এক গাধা-বোঝাই, দেড় গাধা-বোঝাই ? বহ্‌র-ই-হিন্দ্—ভারত সাগরের মত ? খাইবার পাসের মত আঁকাবাঁকা না দারুল্-আমানের রাস্তার মত নাক-বরাবর সোজা ? তোমার হিমিকার—ঠিক উচ্চারণ করেছি তো—গালের টোলের মত ভয়ঙ্কর গভীর না হিন্দুকুশ্ পাহাড়ের মত উঁচু ?'

কখনও উত্তরের জন্য অপেক্ষাই করে না, আর কখনও বা গ্যাট হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে অতি ঠাণ্ডাভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করে—যেন আমার উত্তরের উপর তার জীবন মরণ নির্ভর করছে।

আমি যদি একই প্রশ্ন শুধাই তবে ছোট্ট মেয়েটির মত চেঁচিয়ে বলে, 'না, না, আমি আগে শুধিয়েছি।'

আমি উত্তর দিতে গেলে স্কুল মাস্টারের মত উৎসাহ দিয়ে কথা জুগিয়ে দেয়, তুলনা সাপ্লাই করে, প্যাডিং টিমিং যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে, পুজোর বাজারে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মত পোশাকী-দুরুস্ত করে। আর কখনও বা তীক্ষ্ণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে, ডান ভুরু ঠিক জায়গায় রেখে বা ভুরুর বাঁ দিকটা ইঞ্চি খানেক উপরের দিকে তুলে আমাকে পইপই করে পাকা উকিলের মত ক্রস করে। 'হিমালয়ের মত উঁচু? সে আমার দরকার নেই। আমার হিন্দুকুশ্ হলেই চলবে। তার হাইট্ কত? জান না? তবে বলছিলে কেন অতখানি উঁচু?'

একবার নিজে দেখালে, সে আমাকে কতখানি ভালবাসে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বাহু প্রসারিত করে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে ব্যালে-নর্তকীর মত দু হাতে দু পিঠ প্রায় ছুঁইয়ে ফেলে বললে, 'অ্যাত্তো খানি। প্লাস—প্লাস—' বলতে বলতে আমার কাছে এসে, আমার চোখের সামনে তার কড়ে আঙুল তুলে ধরে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে কড়ে আঙুলের ক্ষুদ্রতম কণায় ঠেকিয়ে বললে, 'প্লাস—অ্যাট্টুকুন্।' তারপর শুধালে, 'এর মানে বল তো?'

আমি বললুম, 'বলার একটা সুন্দর ধরন আর কী।'

'না। সবচেয়ে বেশি থেকে সবচেয়ে কম—দুয়ে মিলিয়ে, হল ইন্‌ফিনিটি।'

'ওই য্ যা ভুলে গিয়েছিলুম—' বলে ছুটে জানলার ধারে গিয়ে বললে, 'ওই দেখ আদম-সুরৎ—পাগ্‌মানের আদম-সুরৎ, কালপুরুষ। আমাদের বিয়ের ভোজে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—বেচারী!' আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি আমাদের প্রেমের সাক্ষী।'

আমি তাকে সপ্তর্ষির অরুন্ধতী বশিষ্ঠের গল্প বললুম। বৈদিক যুগে যে বর-কনেকে অরুন্ধতী দেখিয়ে ওঁরই মত তাকে পাশে পাশে থাকতে বলত সেটাও বললুম।

শব্‌নম উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'কোথায়? কোথায় দেখিয়ে দাও তো আমায়।'

আকাশে তখনও সপ্তর্ষির উদয় হয় নি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

## ॥ চার ॥

মাত্র একটি অঙ্গে আমাদের বিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

শব্‌নম এই প্রথম খবর দিয়ে আসছিল বলে আব্দুর রহ্‌মান কাবুল বাজার ঝেঁটিয়ে খানা-পিনার সাজ-সরঞ্জাম কিনে রেখেছিল। রাত বারোটায় দস্তরখান পাতা হল, পদের পর পদ আসতে লাগল। শব্‌নম ওদের নিমন্ত্রণ করল, আমাদের সঙ্গে বসে খেতে। সিন্ধুর ওপারে সেবকগণ প্রভু পরিবারের সঙ্গে বসে খেতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত নয়। ওরা কিন্তু রাজী হল না। শোনাবার মতলবে ওদের ফিসফিস থেকে বোঝা গেল, ওরা বাজি ধরেছে, কে বেশি পোলাও খেতে পারে— প্রচুর সময় লাগার কথা।

শব্‌নম মাথা গুঁজে খেল। রুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাংস, তরকারি এমন কি ঝোল পর্যন্ত তুলে খেল, অথচ রুটি ছাড়া অন্য কোনও জিনিস হাতের সংস্পর্শে এল না, এ শুধু আমি দুজন লোককে করতে দেখেছি, শব্‌নম আর ভূপালের এক প্রধান মন্ত্রী। এদের খাওয়ার পর হাত ধোবার প্রয়োজন হয় না। রুটির যেটুকু ময়দার গুঁড়ো আঙুলের ডগায় লেগেছে সেটুকু ন্যাপকিনে মুছে নিলেই হল। শব্‌নম আমাকে কিছু না বলে হাত ধুয়ে এসে আমার পাশে বসে বললে, 'তুমি কিছু মনে করো না; এসব ব্যাপারে আমার লজ্জা-বোধ একটু বেশি।'

বাইরে ভয়ঙ্কর শীত। চিমনিতে আবার কাঠ দেওয়া হল।

আগুনের সামনে আমরা দুজনা কার্পেটের উপর বসে আছি।

শব্‌নম প্যারিসের গল্প বলছে। মাঝে মাঝে আমার হাতখানা কোলে তুলে নিয়ে আদর করছে। একবার হৃদয় সম্বন্ধে কী একটা বলতে গিয়ে বললে, 'এই তো তোমার হার্ট—' বলে তার ডান হাত আমার বুকের উপর রাখতে গিয়ে তার হাত সেই ভিজিটিং-কার্ড কেসটায় ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

আমি শুধালুম, 'কী হল?'

'তোমার ঘরে কাঁচি আছে?'

'বোস। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলুম—এনে দিচ্ছি।'

বললে, 'বা রে। এখন আমি সর্বত্র যেতে পারি।' বলেই, পাখি যে রকম বন্ধ অবস্থাতেই ওড়া আরম্ভ করতে পারে সেই রকম ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে কাঁচিখানি নিয়ে এল।

আমাকে মুখোমুখি বসিয়ে আমার হাতে কাঁচি দিয়ে বললে, 'আমার জুল্‌ফ্‌ কাটো।'

বাঙলা জুল্‌পি কথাটা 'জুল্‌ফ্‌' থেকে এসেছে। ইরান তুরানের কুমারীদের অনেকেই দু গুচ্ছ অলক রগ থেকে কানের ডগা অবধি ঝুলিয়ে রাখে। শব্‌নমের চুল ঢেউ-খেলানো বলে তার জুল্‌ফ্‌ দুটির সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ।

আমি ঠিক জানি নে, একদা বোধ হয় ইরান তুরানের বর বাসর ঘরে নববধূর জুল্‌ফ্‌ দুটি পুরোপুরিই কেটে দিত। এর পর যে-নূতন চুল গজাত নববধূ সে চুল কানের পিছনে অন্য চুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিত। জুল্‌ফে হক্ক কুমারীদের—ইরানে বলা হয় 'দুখ্‌তর্', সংস্কৃতে 'দুহিতৃ' স্পষ্ট বোঝা যায়, একই শব্দ। আজকাল এই জুল্‌ফ্‌ কাটার রেওয়াজ যে-সব জায়গায় আছে সেখানেও বোধ হয় জুল্‌ফের শুধু ডগাগুলোই কেটে দেওয়া হয়।

আমি বললুম, 'আমার হাত কেটে ফেললেও তোমার জুল্‌ফ্‌ কাটতে পারব না।'

অনুনয় করলে, 'তা হলে ডগাগুলো কেটে দাও।'

আমি বললুম, 'আমায় মাপ কর।'

'আমি চিরকালই কুমারী থাকব?'

'তুমি চিরকালই আমার সামনে পাগমানের সেই ডান্‌স্‌-হল থেকে নামছ, তুমি চিরকালই আমার প্রথম সন্ধ্যার হিমিক। কিন্তু বল তো, তুমি এই জুল্‌ফ্‌ কাটা নিয়ে এত চাপ দিচ্ছ কেন?'

'তবে কাছে এস।'

আমি আমার দুই তর্জনী দিয়ে তার দুটি জুল্‌ফ্‌ আঙুল দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে তার মুখ তুলে ধরে বললুম, 'বল।'

'দেখ, চারদিকে এই অশান্তি এই অনিশ্চয়তা, এর মাঝখানে তোমাকে নিঃশেষে পাবার জন্য আমার হৃদয় আমাকে ভরসা দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'আমি তো চাই।'

আমার দু হাতে ধরা জুল্‌ফি-বন্ধনের মাঝখানে যতটা পারে মাথা দুলিয়ে বললে, 'না, না, না। তুমি আমাকে এত বেশি ভালবাস যে তোমার চাওয়া-না-চাওয়া সব

লোপ পেয়েছে। আমার ভালবাসা তার কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

'এবারে ভাল করে শোন। বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমি এমন কোনও আচরণ করি নি যার জন্যে আল্লার সামনে আমাকে লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু তোমার অসাক্ষাতে, এখানে, কান্দাহারে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, দুপুর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ না জেলে গৃহকোণে কতবার আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি জান না। চতুর্দিকের বিশ্বসংসার তখন প্রতিবার লোপ পেয়ে গিয়েছে একেবারে নিঃশেষে। আমি যেন বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে, আর তুমি মহাসিন্ধু, দূর থেকে তরঙ্গে তরঙ্গে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছ। আমি দম নিয়ে নাকমুখ বন্ধ করার আগেই তুমি আমাকে তরঙ্গের আলিঙ্গনে আমার সর্বসত্তা লোপ করে দিলে। আর, কখনও তুমি এসেছ ঝড়ের মত। আমার ওড়না তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আমার জুল্‌ফ্‌-গুচ্ছের ভিতর ঢুকে গিয়ে তার প্রত্যেকটি চুল আলাদা আলাদা করে এদিকে ওদিকে উড়িয়ে দিয়ে, আমার চোখের প্রতিটি কাজলের গুঁড়ো কেড়ে নিয়ে, আর সর্বশেষে আমার প্রতিটি লোমকূপে শিহরণ জাগিয়ে আমাকে যেন তোমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কোথায় কোথায় উধাও হয়ে গেলে—কালপুরুষের পাশ দিয়ে কৃত্তিকা, সাত-ভাই-চম্পার ঝাঁকের মাঝখান দিয়ে।

'জ্ঞান ফিরতে দেখি, আমি মাথা ঝুঁকে বর্ডারের উপর বুলবুলির চোখে তুলি লাগিয়ে বসে আছি।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম।

নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি পুরুষ, তুমি কী করে বুঝবে কুমারীর প্রেম। তুমি তো সমুদ্র তরঙ্গ, ঝড়ের ঘূর্ণি। আর আমার প্রেম?—স্বপ্নে স্বপ্নে বোনা শুক্তির মুক্তো। কত ছোট আর কত অজানার নিভৃত কোণে তার নীড়। কত আঁখি-পল্লব থেকে নিংড়ে নিংড়ে বের করা এক ফোঁটা আঁখি-জল। আর তার প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কণাতে আছে কুমারীর লজ্জা, ভয়, সংকোচ।'

চুপ করে গেল।

আমি কাঁচি হাতে নিয়ে জুল্‌ফ্‌ থেকে তিন গোছা চুল কেটে নিয়ে বললুম, 'এই মুক্ত করলুম আমি তোমার লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়।'

আগুনের সামনে বসেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল বাইরে শীত কী রকম ঘনিয়ে আসছে। সে শীত যখন তার চরমে পৌঁছেছে তখনও শব্‌নম তার জুল্‌ফ্‌ কানের পিছনে

ঠেলে দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এ কি নেমকহারামির চূড়ান্ত নয়—যে-বাড়িতে কুড়িটি বছর কাটিয়েছি সেটা আর নিজের আপন বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না? আর এ বাড়ি আসলে তোমার আপন বাড়িও নয়—এ বাড়িতে তো আমার শাশুড়ি-মা তোমাকে জন্ম দেন নি। তবু মনে হচ্ছে, এ বাড়িতেই যেন শিশুকাল থেকে আমরা খেলাধুলো ঝগড়াঝাঁটি মান-অভিমান করে করে আজ আমাদের চরম মিলনে পৌঁছলুম।'

একটুখানি ভাবলে। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'উঁহু, এটাও যেন সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমরা দুটি শিশু এ বাড়ির আঙিনাতে খেলা করছি, আর ও বাড়ির ছাদে বসে আব্বাজান্, জানেমন্ একে অন্যের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমাদের দিকে স্নেহ-দৃষ্টি রেখে সকল বিপদ আপদ ঠেকিয়ে রাখছেন। খেলা ছেড়ে ছুটে গিয়ে একবার জানেমনের কোলে বসে জিরিয়ে আসি।'

আমার মোজাটা খুলতে খুলতে বললে, 'এই যে লাগল গোলমাল, এর শেষ কবে, আর কোথায়, কেউ বলতে পারে না। তোমাকে আবার কখন দেখতে পাব তাও জানি নে। তবে এখন আমার বুকভরা সান্ত্বনা। ওই বাচ্চা যদি কাল এসে যেত তা হলে আমাকে মহাবিপদে ফেলত। পাগলা-ভিড় ঠেলে এসে তোমাকে বিয়ে করতে হত। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছি।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এই শীতে? এত রাত্তিরে?'

'এই সময়টাই সব চেয়ে ভাল। ডাকুদের দামী দামী ওভারকোট নেই যে এই শীতে বেরুবে। কাল সকালে দেখবে কাবুলে মেলার ভিড়। চোর ডাকাত বেবাক মৌজুদ। প্রথম লুট আরম্ভ হলেই ওরা সব ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চা তো উপলক্ষ মাত্র। তুমি এ দেশের হালহকীকৎ জ্ঞান অতি অল্প। আমাকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হও।'

আমি সেদিন তাকে বিশ্বাস করেছি। আজও করি।

খুশি হয়ে বললে, 'এই তো চাই। আমি তোপল্ খানকে ডাকি। তুমি যাও শুয়ে পড়। কতক্ষণ ধরে স্যুট পরে আছ।'

শীতের দেশ বলে আমি শিলওয়ার, চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে শুই।

শোবার ঘরে ঢুকেই বলে, 'বাঃ! কী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে! কিন্তু এ আবার কী রকমের কুর্তা? দু দিকে চেরা কেন? দেখি?' হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'ও! পকেট! ভারী অরিজিনাল্ আইডিয়া তো! হাতে আবার পট্টি মেরে বোতাম। ও, বুঝেছি, খাবার সময় আস্তিন যাতে ঝোলে ডুবে না

যায়। আমিও এরকম একটা করাব। সবাই বলবে, 'আমি কী অরিজিনাল। এবারে তুমি শোও দিকি নি।'

তিন দিকে লেপ গুঁজতে গুঁজতে বললে, 'তুমি কণামাত্র দুশ্চিন্তা করো না। তোপল্ খান একটা সার্ভে করে এসেছে। আমার কথাই ঠিক। রাস্তায় কাক-কোকিল নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

মাথা, জুল্‌ফ, কানের দুল দোলাতে দোলাতে বললে, 'না, তা করতে পারবে না। আমার কড়া মানা। আমি খাটে শুয়ে ড্যাব ড্যাব করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব আর তুমি প্রেমসে তোমার স্বপনচারিণীর সঙ্গে লীলা-খেলা করবে—সেটি হচ্ছে না। ও আমার সতীন—দজ্জাল বেটী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

আমি বললুম, 'তুমিও আমাকে স্বপ্নে দেখলে পার।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বল কী তুমি? তুমি পুরুষমানুষ চারটে প্রিয়েকে বিয়ে করতে পার, স্বপ্নে জাগরণে যে রকম খুশি ভাগাভাগি করতে পার। কিন্তু আমি মেয়ে-ছেলে। আমার কেবল তুমি।'

আমি বললুম,

'স্বপন হইতে শতশত গুণে
প্রিয়তর বলে গুণি!'

অর্থ আর সুর দুইই তার মন পেল।

বললে, 'কান্দাহারে তোমাকে প্রতি রাত্রে স্বপ্নে আহ্বান জানাতুম। তখন তোমাকে বিয়ে করি নি, তাই। আচ্ছা, এবারে তুমি চুপ কর, আর চোখ বন্ধ কর।'
উঠে গিয়ে আলো নেবাল। ড্রইংরুম থেকে ও ঘরে সামান্য আলো আসে।

আমার ছোট্ট চারপাঈটির কাঠের বাজুতে হাল্কাভাবে বসে সেই আধো-আলো-অন্ধকারে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল—আমি বন্ধ চোখে সেটা চোখের তারাতে তারাতে দেখতে পেলুম।

এবারে তার নিঃশ্বাস আমার ঠোঁটে এসে লাগছে।

ভীরু পাখির মত একবার তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করল—দুবার—শেষবারে একটু অতি ক্ষীণ চাপ।

এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম নয়।

কৈশোরে যখন ওষ্ঠাধরের গোপন রহস্য আধা আধা কল্পনায় বুঝতে শিখছি

তখন আমি আকাশের তারার সঙ্গে মিতালী পাতাবার জন্য রাত্রিযাপন করতুম খোলা বারান্দায়। শরতের ভোরবেলা দেখতুম পাশের শিউলি গাছের বিরহ-বেদনা—ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের শিউলি আমার চতুর্দিকে ছড়ানো।

এক ভোরে অনুভব করলুম ঠোঁটের উপর তারই একটি।

এ সেই হিমিকা-মাখা, শব্‌নম-ভেজা শিউলি!

## ॥ পাঁচ ॥

শব্‌নমের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফললো। পরদিন সকাল থেকেই কাবুল শহরের আশপাশের চোর ডাকু এসে 'রাজধানী' ভর্তি করে দিলে। দাগী খুনীরাও নাকি গা-ঢাকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে; কারণ পুলিস হাওয়া, সান্ত্রী গায়েব।

এতে করে আর পাঁচজন কাবুলী যতখানি ভয় পেয়েছে, আমিও পেয়েছি ততটুকু। আসলে আমার বেদনা অন্যখানে। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দেখি, রাস্তা থেকে মেয়েরা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে। বে-বোরকার তো কথাই হচ্ছে না, ফ্যাশনেব্‌ল্ বোরকাও দূরে থাক, দাদী-মা নানী-মার তাম্বুপানা বেঢপ বোরকার ছায়া পর্যন্ত রাস্তায় নেই।

শব্‌নম আসবে কি করে?

দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই মারাত্মক শীতে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ফাটিয়ে ফেলেছি—কখন প্রথম বোরকা বেরুবে, কখন প্রথম বোরকা দেখতে পাব? ব্যর্থ, ব্যর্থ, আর একটা দিন ব্যর্থ।

> 'জাগিনু যখন ঊষা হাসে নাই,
> শুধানু "সে আসিবে কি?"
> চলে যায় সাঁঝ, আর আশা নাই,
> সে ত' আসিল না, হায় সখি!
> নিশীথ রাতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে,
> জাগিয়া লুটাই বিছানায়;
> আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
> দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায়।'
>
> —(সত্যেন দত্তের অনুবাদ)

জর্মন কবি হাইনে আসলে ইহুদী—অর্থাৎ প্রাচ্য দেশীয়। অসহায় বিরহ

বেদনার কাতরতা ইয়োরোপীয়রা বোঝে না। তাদের কাব্য সঞ্চয়নে এ-কবিতা ঠাঁই পায় না। অথচ এই কবিতাটিই ত্রিপদীতে গেঁথে দিলে কোন্ গোঁসাই বলতে পারবেন, এটি পদাবলী কীর্তন নয়? এ তো সেই কথাই বলেছে— 'মরমে ঝুরিয়া মরি'।

এক মাস হতে চলল। তোপল্ খানই বা কোথায়?

আবার দাঁড়িয়েছি দেউড়িতে দুপুরবেলা।

ওই দূরের দক্ষিণ মহল্লার সদর দেউড়ি থেকে বেরল এই প্রথম বোরকা! ধোপানীদের কালো-বোরকা-সাদা-হয়ে যাওয়া পুরনো ছাতা রঙের। আমার ধোপানীও এই রকম বোরকা পরে আসে। দুঃখিনী বেরিয়েছে পেটের ধান্দায়। কতদিন আর বাড়ি বসে বসে কাটাবে? বেচারী আবার অল্প অল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। আমার দেউড়ি পেরিয়ে উত্তর দিকে কাবুল নদীর পানে চলে গেল। শব্‌নমদের বাড়ি দক্ষিণ মহল্লারও দক্ষিণে। আমি আবার সেদিকে মুখ ফেরালুম। এবারে মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রথম বোরকা তো বেরিয়েছে।

দু মিনিট হয় কি না হয়, এমন সময় কানের কাছে গলা শুনতে পেলুম, 'মিনিট দশেক এখানে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে এস।'

আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। আমার দাঁড়ানো যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখি শব্‌নম কোথাও নেই। কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, 'শব্‌নম! হিমিকা!' উত্তর নেই। আবার ডাকলুম, 'হিমি!'

চারপাঈর তলা থেকে উত্তর এল 'কূ!'

আমি এক লম্ফে কাছে গিয়ে লেপ বালিশসুদ্ধ খাট কাত করে দিয়ে দেখি, শব্‌নম খাটের তলায় কার্পেটের উপর দিব্য শুয়ে আছে। আমার চুড়িদার পাঞ্জাবিটি পরে। একটু ঢিলে-ঢালা হয়েছে বটে কিন্তু একটা জায়গায় ফিট হয়েছে চমৎকার—যেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কারিগর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সৃষ্টির সময়ই ফিট করিয়ে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য এই বিরহ বেদনার অন্ধকার। মিলনের প্রথম মুহূর্তেই সর্ব দুঃখ দূর হয়ে যায়—সে বিরহ একদিনের হোক্ আর একমাসেরই হোক। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বাললে যে রকম সে আলো তন্মুহূর্তেই অন্ধকারকে তাড়িয়ে দেয়—সে

অন্ধকার এক মুহূর্তেরই হোক্ আর কারাওয়ের কবরের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো জমানো অন্ধকারই হোক্।

অভিমানের সুরে বললে, 'দশ মিনিট, আর এলে দশ ঘন্টা পরে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি? আমি তো ঘড়ি ধরে আট মিনিট পরে এসেছি।'

বললে, 'তোমার ঘড়ি পুরনো। কাবুল মিউজিয়ামের গান্ধার সেক্‌শন্ থেকে কিনেছ বুঝি?'

আমি বললুম, 'পুরনো ঘড়ি হলেই বুঝি খারাপ টাইম দেয়?'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দেবে না? পুরনো খবরের কাগজ আজকের খবর দেয় নাকি? খবরের কাগজের আসল নাম ক্রনিক্‌ল্, আর ঘড়ির আসল নাম ক্রনোমিটার। দুটোই ক্রনস্, সময়ের খবর দেয়। এতটুকু শব্দতত্ত্ব জানো না—প্যারিসের ক্লাস্ সিক্‌সে যা শেখানো হয়?'

আমি বললুম, 'তুমি বুঝি রোজ সকালে খবরের কাগজের সঙ্গে একটা নূতন ঘড়িও কেন?'

'তা কেন? আমার ঘড়ি তো এইখানে।' বলে নিজের বুকে হাত দিলে। 'প্রথম দিনের ঘড়ি, নিত্য নবীন হয়ে চলেছে। দেখি, তোমার ঘড়িটা কি রকমের।' আমার বুকে কান পেতে বললে, 'জান, কি বলছে?'

আমি বললুম, 'এক জাপানী শ্রমণ জীবনের স্বন্দ-ধ্বনি শুনতে পেয়ে বলেছেন, 'ভুল্'—'ঠিক', 'ভুল্'—'ঠিক,' 'ভুল্'—'ঠিক'?

'বাজে! বলছে, 'শব্'-'নম্','শব্'-'নম্', 'শব্'-'নম্'। এইবারে আমারটা শোন।'

আমি তার এত কাছে আর কখনও আসি নি। আমার বুক তখন ধপধপ করছে।

'বুঝতে পেরেছ নাকি?' নিজেই কথা জুগিয়ে দিচ্ছে। 'বুল্'-'বুল্',-'বুল্',-'বুল্', 'বুল্-বুল্' বলছে—না?'

আমি অতি কষ্টে বললুম, 'হ্যাঁ।'

বললে, 'কলটা কিন্তু খুব ভাল না। যা মরেছে ওতে, নানী-মাও। কিন্তু ওকথা কক্ষনো তুল না।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালে।

ডান পা একটু এগিয়ে দিয়ে, বাঁ হাতের মণিবন্ধ কোমরের উপর রেখে, ডান হাত আকাশের দিকে তুলে, অপেরার 'প্রিমা দন্না' ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বললে,

'মেদাম্ এ মেসিয়ো। এই মুহূর্তে কাবুলের রাজা হতে চায় দুজন লোক। আমানুল্লা খান আর বাচ্চা-ই-সকাও। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি দুজনাতে মিলে আপোসে মিটমাট করে আমাকে বলে, "কাবুল শহর তোমাকে দিলুম"—তা হলে আমি কি করি?' নাটকীয় ভঙ্গিতে আবার মৃদু হাস্য করলে। কী সুন্দর সে হাসি। গালের টোল দুটি আমার গাঁয়ের ছোট্ট মধু-গাঙের ক্ষুদে ক্ষুদে দ'য়ের মত পাক খেতে লাগল, অথবা কি বলব, নজ্‌দের মরুভূমিতে মজনূঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস-ঘূর্ণিচক্রের ছোট ছোট 'বগোলে'?

আমি চার আনী টিকিট-দারের মত চেঁচিয়ে বললুম, 'সি'ল্ ভু প্লে, সি'ল্ ভু প্লে—মেহেরবানী করুন, মেহেরবানী করুন, বলুন কি করবেন।'

একেবারে হুবহু 'প্রিমা দন্না'র ভঙ্গিতে গান গেয়ে উঠল,

**Si le roi m'avait donne**
**Paris, sa grand 'ville,**
**Et qu'il me fallut quitter**
**L'amour de ma mie,**
**Je dirais au roi Henri**
**'Reprenez votre Paris,**
**J'aime mieux ma mie, o gai !**
**J'aime mieux ma mie !'**

'এবারে তার ফার্সীটা শুনুন, মেদাম্ এ মেসিয়ো!

'গর ব্-এক্ মোই, তুর্ক-ই-শীরাজী,
ব্‌দহদ্ পাদ্‌শাহ্ ব্-মন্ শীরাজ্,
গোইম 'আয় পাদ্‌শাহ্ গরচি বোওাদ্
শহ্‌র্ ই-শীরাজ শহ্‌র্-ই বিআনবার,
তুর্ক্-ই-শীরাজ কাফী অস্ত্ মরা—
শহ্‌র্-ই-শীরাজ খইশ বসতান বাজ্।

'রাজা যদি, দেয় মোরে ওই, আজব শহর পারি (Paris)
কিন্তু যদি, শর্ত করে, ছাড়তে তোমায়, প্যারী,
বলবো, 'ওগো, রাজা আঁরি (Henri)
এই ফিরে নাও তোমার পারি (Paris)

প্যারীর প্রেম যে অনেক ভারি,
তারে আমি ছাড়তে নারি!
ওগো, আমার প্যারী!'

ফার্সী অনুবাদটা গাইলে একদম 'ফতুজান' স্টাইলের কাবুলী লোকসঙ্গীতে।

প্যারিসে চারআনী টিকিটের জায়গা হলের সকলের পিছনে, উপরে, প্রায় ছাত ছুঁয়ে। তাই সেটাকে বলা হয় 'পারাদি'—প্যারাডাইস্—স্বর্গপুরী। খাঁটি জউরী, আসল সমঝদার, খানদানী কদরদানরা বসেন সেখানে। ঘন ঘন সাধুরব, বিকল্পে পচা ডিম হাজা টমাটো, শিটিকিটির খয়রাতি হাসপাতাল ওই স্বর্গপুরীতেই। স্টেজের ফাঁড়া-গর্দিশে বুদ্ধি বাতলে দেন ওনারাই। ভিরমি-খাওয়া ধুমসী নায়িকাকে কাঁধে করে বয়ে নিতে গিয়ে যদি টিঙটিঙে নায়ক হিমশিম খায় তবে এই সব দরদী জউরীরাই চিৎকার করে দাওয়াই বাতলান—'তুই কিস্তিতে নিয়ে যা—ফ্যাৎ অ ভইয়াজ—মেক্ টু ট্রিপ্স্!'

আমি এদের অনুকরণে একাই এক শ হয়ে বিস্তর 'সাধু! সাধু, ব্রাভো, ব্রাভো' বললুম।

সদয় হাসি হেসে খাজেস্তেবানু শব্‌নম বীবী ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে বাও করে শোকরিয়া জানালেন, চম্পক করাঙ্গুলির প্রান্তদেশে মৃদুচুম্বন খেয়ে আঙুলটি উপরের দিকে তুলে ফুঁ দিয়ে চুম্বনটি 'পারাদি'—স্বর্গপুরীর—দিকে উড্ডীয়মান করে দিলেন।

আমি 'স্টেজে'র দিকে ডাঁই ডাঁই রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছুঁড়ে ফেলা দেবার মুদ্রা মারলুম।

দেবী প্রসন্নবয়ানে 'স্টেজ' থেকে অবতীর্ণা হয়ে সবজন সমক্ষে আমার বিরহ-তপ্ত আপাণ্ডুর ক্লান্ত ভালে তাঁর ঈষতার্দ্র মল্লিকাধর স্পর্শ করে নিঃশ্বাসসৌরভঘন অগুরু-কস্তুরী-চন্দন-মিশ্রিত ভ্রমর-গুঞ্জরিত প্রজাপতি-প্রকম্পিত চুম্বনপ্রসাদ সিঞ্চন করলেন।

প্রসন্নোদয়, প্রসন্নোদয় আমার অদ্য উষার সবিতৃ উদয় প্রসন্নোদয়!

আমার জন্মজন্ম সঞ্চিত পুণ্য কর্মফল আজ উপারূঢ়!

আমি তার পদচুম্বন করতে যাচ্ছিলুম। 'কর কি?' 'কর কি?' বলে ব্যাকুল হয়ে সে আমায় ঠেকিয়ে দিয়ে দুখানি আপন গোলাপ-পাপড়ি এগিয়ে দিলে।

আশ্চর্য এ মেয়ে? দেখি, আর বিস্ময় মানি। ভয়ে আতঙ্কে তামাম কাবুল শহরের গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে—এই পাথর-কাটা শীতে শহরের রাস্তার মুখ পর্যন্ত পরিত্যক্ত

হয়ে গিয়েছে, আর এ মেয়ে তারই মাঝখানে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে কলকল খলখল করে হাসছে। প্রেমসাগরের কতখানি অতলে ডুব দিলে উপরের ঝড়ঝঞ্ঝা সম্বন্ধে এ রকম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন হওয়া যায়?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সব-কিছুর খবর রাখে।

বললে, 'এই যে ফ্রান্সের গাইয়া গান, এটার মর্মও আমানুল্লা বুঝলেন না।

'বিদ্রোহীরা বলছে, তোমার বউ সুরাইয়া বিদেশে গিয়ে স্বৈরিণী হয়ে গিয়েছে—ব্যভিচারিণী নয়, স্বৈরিণী। একে তুমি তালাক দাও, আমরা বিদ্রোহ বন্ধ করে দেব।

আমানুল্লা নারাজ।'

আমি বললুম, 'তোমাদের কবিই তো বলেছেন,

"কি বলিব, ভাই, মূর্খের কিছু অভাব কি দুনিয়ায়,
পাগড়ি বাঁচাতে হরবকতই মাথাটারে বলি দ্যায়।" '

মাথা নেড়ে বললে, 'না। এখানে পাগড়ি অর্থ প্রিয়া, মাথাটা কাবুল শহর।

'আমি বলি, "দিয়ে দে না, বাপু, কাবুল শহর, চলে যা না, বাপু, প্রিয়াকে নিয়ে প্যারিস্—যে প্যারিসের ঢঙে কাবুলের চেহারা বদলাতে গিয়ে আজ তুই এ-বিপদে পড়েছিস। নকল প্যারিস নিয়ে তোর কি হবে, আসল যখন হাতের কাছে? একটা কপিরই যখন দরকার তখন আসলটা নিয়ে কার্বন্-কপিটা ফেলে দে না। কাশ্মীরী শালের উপরের দিকটাই গায়ে জড়িয়ে নে, উল্টো দিকটা দেখিয়ে তোর কি লাভ?" আশ্চর্য! তাঁর এখন ডান হাতে তলোয়ার, বাঁয়া বগলমে প্রিয়া—ডাকু পাকড়াবেন কৈসে?'

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'আমার বয়ে গেছে।

"কাজী নই আমি, মোল্লাও নই, আমার কি দায়, বল।
শীরাজী খাইব, প্রিয়ার চুমিব ওই মুখ ঢলঢল।"

এর প্রথম ছত্র হাফিজের, দ্বিতীয়টি আমার।'

আমি বললুম, 'শাবাশ! লাল শীরাজী খেতে হলে তোমার ওই গোলাপী ঠোঁটেই মানাবে ভালো। আমার কিন্তু দুটো মিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।'

'কি রকম?'

'তুমি পাশ ফিরে শুয়ে মৃদু হাস্য করবে। তখন তোমার গালের টোল হবে গভীরতম—আমি সেটিকে ভর্তি করব শীরাজী দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে—অতি ধীরে ধীরে সেই শীরাজী চুমোয় চুমোয় তুলে নেব।'

বললে, 'বাপ্‌স্? কী লয়ে কল্পনা, লম্বা রসনা, করিছে দৌড়াদৌড়ি। তা কল্পনা কর, কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না। খৃষ্টানদের বঁ দিয়ো—ভগবান—তো এক মুহূর্তেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে দিতে পারতেন; তবে তিনি ছ-দিন লাগালেন কেন?'

আমি বললুম, 'এবারে তুমি আমার কথার উত্তর দাও।'

সুশীলা বালিকার মত মাথা নিচু করে বললে, 'বল।'

'আব্বাজান কোথায়?'

'দুর্গে। আমানুল্লাকে মন্ত্রণা দিচ্ছেন। টুাব থেকে বেরিয়ে আসা কালতো' টুথপেস্ট ফের ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।'

'তোপল্ খান?'

'লড়াইয়ে।'

'তুমি কি করে এলে?'

'রেওয়াজ করে করে। ধোপানীর ভাবুটা যোগাড় করে প্রথম প্রথম কাছে পিঠে বান্ধবীদের বাড়িতে ওদের তত্ত্ব-তাবাশ করতে গেলুম।'

একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা বলতো, তোমাকে ভালোবাসার পর থেকে আমি ওদের কথা একদম ভুলে গিয়েছি। আমার যে সব সখীদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তারাও আমাকে স্মরণ করে না। অথচ শুনেছি, পুরুষ-মানুষরা নাকি বিয়ের পর সখাদের অত সহজে ভোলে না? মেয়েরা তা হলে বেইমান নেমকহারাম?'

আমি বললুম, 'গুণীরা বলেন, প্রেম মেয়েদের সর্বস্ব, পুরুষের জীবনের মাত্র একটি অংশ। তাই বোধ হয় মেয়েরা ওই রকম করে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা নয়। আমি বিদেশী, আমি অসহায়, আমি নিজের থেকে কোন কিছু করতে গেলেই হয়তো তোমাকে বিপদে ফেলা হবে মাত্র, এই ভেবে আমি হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় কিস্মতের কিল খাচ্ছি। তুমি সেটা জান বলে, সর্বক্ষণ তোমার চিন্তা, কি করে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, আমার বিরহ-বেদনা, তোমাকে কাছে পাওয়ার কামনা আপন কাঁধে নিয়ে আমাকে আর্ত শিশুর মত আদর করে করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার। তোমার সখীরা আব্বা, জানেমন্ কেউই তো তোমার উপর কোন কিছুর জন্য এতটুকু নির্ভর করছেন না। আর আমি করছি সম্পূর্ণ নির্ভর তোমার উপর। তোমার জিম্মাদারী এখন বেড়ে গিয়েছে। জিম্মাদারী-বোধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতা-বোধও বেড়ে যায়।'

বললে, 'সে না হয় তোমার আমার বেলা হয়—তুমি বিদেশী বলে।'

'অন্যদের বেলাও তাই। অধিকাংশ দেশেই মেয়ের জন্য তো পরিবারের

আপদ। সেই 'আপদ' যেদিন একটি লোককে পায়, যাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বাকী জীবন তার উপর নির্ভর করতে হবে, তখন তার অবস্থা তোমারই মত হয়। কিন্তু আরেকটা কথা। এই একাগ্রতাটা মেয়েদের কিছু একচেটে নয়। লায়লীর জন্য মজনূঁর একাগ্রতাই তো তাকে পাগল বানিয়ে দিলে?'

শুধালে, 'কোন্ মজনূঁ?'

আমি বললুম, 'তার পর তুমি কি করলে বলছিলে?'

'ওঃ! পাড়ার সখীদের বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস্ করলুম।'

আমি বললুম, 'শ্রীরাধা যে রকম আঙিনায় কলস, কলসী জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে তুলে, বর্ষার রাতে পিছল অভিসার যাওয়ার প্র্যাকটিস করে নিতেন?'

ইরান তুরান আরবভূমির তাবৎ প্রেমের কাহিনী শব্‌নমের হৃদয়স্থ। তাই আমি তাকে শোনাতুম হিন্দুস্থানী রমণীর বেদনাবাণী। সে সব কাহিনীর রাজমুকুট সুচির অভাগিনী অভিমানিনী শ্রীরাধার চোখের জলের মুক্তো দিয়ে সাজাতে আমার বড় ভালো লাগে। কিন্তু একাধিকবার লক্ষ করেছি শব্‌নম যেন শ্রীরাধাকে ঈষৎ ঈর্ষা করে।

বললে, 'হুঁঃ! তোমার শুধু শ্রীরাধা শ্রীরাধা! তা সে যাক্‌গে। তার পর ধোপানীর তাম্বু পরে বেরিয়ে পড়লুম তোমার উদ্দেশে। আমার ভাবনা ছিল শুধু আমার পা দুখানা নিয়ে। ও দুটো বোরকা দিয়ে সব সময় ভালো করে ঢাকা যায় না।'

আমি বললুম, 'রজকিনী চরণ বাংলা সাহিত্যের বুকের উপর।'

'মানে?'

আমি চোখ বন্ধ করে হিমির পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে মুদ্রিত নয়নে গান ধরলুম,

'শুন রজকিনী রামী
শীতল জানিয়া ও-দুটি চরণ
শরণ লইনু আমি!'

বললে, 'এ সুরটা সত্যি আমার প্রিয়। এর ভিতর কত মধুর আকুতি আর করুণ আত্মনিবেদন আছে।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, "শীতল চরণ" কেন বললে, বল তো?'

নাক তুলে বললে, 'বাঃ! সে তো সোজা। ধোপানী জলে দাঁড়িয়ে কাপড় আছড়ায় তাই।'

জাহাঁবাজ মেয়ে!

বললে, 'জান বঁধু, আজ ভোরবেলার আজান শুনে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন বুকের ভিতরটা যেন একেবারে ঝাঁঝরা ফাঁকা বলে মনে হল। কিছু নেই, কিছু নেই, যেন কিছু নেই। পেটটাও যেন একেবারে ফাঁপা, যেন দাঁড়াতে পারব না। বুকের ভিতর কি যেন একটা শূন্যতা শুধু ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। সব যেন নিঙড়ে নিঙড়ে নিচ্ছে। ওঠবার চেষ্টা করলুম, উঠতে পারলুম না। কোমরের সঙ্গে আমার বাকি শরীরের যেন কোন যোগ নেই।

'মোয়াজ্জিন তখন বলছে, "অস্-সালাতু খৈরুন্ মিন্ অন্-নওম্—নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ভালো।"

'আমি কাতর নিবেদনে আল্লাকে বললুম, হে খুদাতালা, তোমার দুনিয়ায় তো কোনও কিছুরই অভাব নেই। আমাকে একটুখানি শক্তি দাও।'

আমি অনুনয় করে বললুম, 'থাক্ না।'

বললে, 'কাকে তা হলে বলি, বল। জানি, তুমি এ-সব শুনে কষ্ট পাও। কিন্তু তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য তো আমি আমার দুঃখের কথা বলছি নে। আবার না বলেও থাকতে পারছি নে। এ কী দ্বন্দ্ব, বল তো?'

আমি বললুম, 'তুমি বলে যাও। আমার শুনতেও ভালো লাগে যে সর্বক্ষণ আমি তোমার মনের ভিতর আছি। এও তো দ্বন্দ্ব।'

'তবে শোন, আর শুনেই ভুলে যেয়ো। না' হলে আমার বিরহে তোমার বেদনার ভার সেই স্মৃতি আরও ভারী করে তুলবে। নিজে কষ্ট তো পাবেই, তার উপর আমার কষ্টের স্মরণে বেদনা পাবে বেশি।

'এই যে ফাঁকা ভাব ভোরবেলাকার, এইটে বওয়াই সব চেয়ে বেশি শক্ত।'

'কে বল সহজ, ফাঁকা যাহা তারে, কাঁধেতে বহিতে সওয়া?

জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায় ততই কঠিন বওয়া।'

'ফাঁকা জিনিস ভারি হয়ে যায়, এব কল্পনা কি আমি কখনও করতে পেরেছি?

'কোন গতিকে এই দেহটাকে টেনে টেনে বাইরে এনে নমাজ পড়লুম। হায় রে নমাজ! চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেওয়াকে যদি নমাজ বলে তবে আমার মত নমাজ কেউ কখনও পড়ে নি।'

আমি অতি কষ্টে চোখের জল থামিয়ে বলেছিলুম, 'সেই তো সব চেয়ে পাক্ নমাজ।'

যেন শুনতে পায় নি। বললে, "ইহ্দিনাস্ সীরাতা-ল্ মুস্তকীমে" এলুম—

"আমাকে সরল পথে চালাও"—তখন মন সেই সোজা পথ ছেড়ে চলে গেল নূতন অজানা দুর্ভাবনায়। তবে কি আমি ভুল পথে চলেছি বলে তাতে এত কাঁটা, বিভীষিকার বিকৃত তাল ?'

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বল তো গো তুমি, তোমাকে বিয়ে করার আগে যে আমি তোমার গা দুতিনবার ছুঁয়েছি, তোমাকে হৃদয়-বেদনা বলেছি, তোমাকে স্বপ্নে কল্পনায় জড়িয়ে হৃদয়ে টেনে নিয়েছি, সেই কি আমার পাপ ? আমি তো অন্য কোন পাপ করি নি।' এবারে উত্তরের জন্য চুপ করে গেল।

আমি বললুম, 'হিমি—'

'আঃ!' বলে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কোলে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার মাথার চেয়ে বড় খোঁপাটা আস্তে আস্তে আলগা করে দিল। সমস্ত পিঠ ছেয়ে ফেলে তার চুল লম্বা কুর্তার অঞ্চলপ্রান্ত অবধি পৌঁছল। আমি আঙুল দিয়ে তার গ্রীবা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপরের দিকে তুলে বিলি দিতে দিতে অলকস্তবক অতৃপ্ত নিঃশ্বাসে শুষে নিয়ে বললুম, 'হিমিকা, আমি তো বেশি ধর্মগ্রন্থ পড়ি নি, আমি কি বলব ?'

বললে, 'না গো, না। আমি মোল্লার ফৎওয়া চাইছি নে। তোমার কথা বল।'

'আমিও শুধাই, সবই শাস্ত্র, হৃদয় বলে কিছু নেই ?'

স্পষ্ট অনুভব করলুম, তার চোখের জলে আমার কোল ভিজে গেছে।

বললুম, 'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।'

বললে, 'তুমি মেহেরবানী করে আজকের মত শুধু আমাকে কাঁদতে দাও। আজ আমার শেষ সম্বল উজাড় করে দিয়ে আর কখনও কাঁদবো না।'

উঠে বসল। চোখ তখন ভেজা। শব্‌নমের আঁখিপল্লব বড় বেশি লম্বা। জোড়া লাগার পর উপরের সারি উপরের দিকে আর নিচের সারি নিচের দিকে অনেকখানি চলে গিয়েছে।

'জান তুমি, যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায় ? আছে তোমার অভিজ্ঞতা ? আমার আজ ভোরে হল।

'আমি নিজেকে বললুম, আমি যাচ্ছি আমার দয়িতের মিলনে, আমার স্বামী সকাশে। আল্লা আমাকে এ হক দিয়েছেন। আমাদের মাঝখানে কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তবে সে শয়তান। আমি তাকে গুলি করে মারবো—পাগলা

কুকুরকে মানুষ যে রকম মারে, সাপের ফণা যে রকম রাইডিং বুট দিয়ে থেঁতলে দেয়।

'এই দেখ।'

পাশের স্তূপীকৃত বোরকার ভিতর থেকে বের করল এক বিরাট রিভলবার। তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের সেই ছোট্ট পিস্তলের তুলনায় এটা ভয়াবহ দানব।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালুম। চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। কাঠের মত শুকনো প্রত্যেক চোখের প্রত্যেক পল্লব—আলগা আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে।

'প্রত্যেক শয়তানকে মারবো গুলি করে। অগুণতি, বেহিসাব—দরকার হলে। বোরকার ভিতরে রিভলবার উঁচু করে তাদের জন্য তৈরি ছিলুম সমস্ত সময়। কেউ সামনে দাঁড়ালেই গুলি। প্রশ্নটি শুধাবো না। বোরকার ভিতর থেকেই।

'তাদের মরা লাশের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে আসতুম, তোমার কাছে।

'কী? আমার ছেলে হবে শুধু শান্তির সুখময় নীড়ে? বক্রীর কলিজা নিয়ে জন্ম নেবে তারা তা হলে। আমার নাতি কিংবা তার ছেলে হয়তো কোন কলিজা নিয়েই জন্মাবে না। শুধু রক্ত পাম্প করার জন্য এতখানি জায়গা জুড়ে এই বিরাট হৃদয়। আর আজ যদি আমি বিঘ্ন-বিপদ তুচ্ছ করে শয়তানকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তোমার কাছে পৌঁছই তবে আমার ছেলে হবে বাঘের গুর্দা, সীনা, কলিজা নিয়ে।'

আমি শব্‌নমকে কখনও এরকম উত্তেজিত হতে দেখি নি। কি করে হল? এ তো মাত্র এক মাস। কান্দাহারে এক বছর কাটিয়ে আসার পরও তো এরকমধারা দেখি নি। তবে কি সে কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে বনদেবতার শান্তিকামী অগ্রদূত বিহঙ্গের মত কলরবস্বরে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়? না, কোনও কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেছে, এই এক মাস ধরে?

বললুম, 'তোমার রুদ্ররূপকে আমি ভয় করি, শব্‌নম। তুমি তোমার প্রসন্নকল্যাণ মুখ আমাকে দেখাও।

'আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বজনের শুভ আশীর্বাদ আমাদের মিলনের উপর আছে।'

কবিতা শুনতে পেলে সে ভারী খুশি হয় বলে আমি বললুম,

'দাবানল যবে বনস্পতিরে দগ্ধ দাহনে দহে
শুকপত্র আর্দ্র পত্রে কোন না প্রভেদ সহে।'

শান্ত হয়ে গেল। বললে, 'কিস্মৎ।'

আমি তাকে আরও শান্ত হবার জন্যে চুপ করে রইলাম।

বললে, 'তুমি কিছু মনে করো না। ভেবেছিলুম বলব না, কিন্তু আমি পরপর তিনদিন উপোস করে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম, তাই এ-উত্তেজনা। উপোসের পরে মনে হল, তুমি যে সেই পাতি নেবুটি দিয়েছিলে সেইটে যদি তাজা থাকতে তবে শরবত বানিয়ে খেতুম।'

আমি বললুম, 'তা অদৃষ্ট! আমার গাল টোল খায় না। তুমি কিসে ঢেলে খাবে? তা তুমি যত খুশি নেবু পাবে, আমাদের বাড়িব গাছে। আমরা যখন এক সঙ্গে হিন্দুস্থান যাব—'

দেখি সে তার বড় বড় চোখ আরও বড় করে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'কি হল?'

বললে, 'তাজ্জব! তাজ্জব! আমার দিবা স্বপ্নে তো এ-আইটেমটা বিলকুল স্থান পায় নি। দাঁড়াও, আমাকে বলতে দাও। ট্রেনে একটা কুপেতে শুধু তুমি আর আমি। না। তাবই বা কি দরকার। তোমাকে তো কখনও ভিড়ের মাঝখানে আমি পাই নি। সে আনন্দ আমি পুরোপুরি রসিয়ে বসিয়ে চাখবো। ভিড়ের ধাক্কায় তুমি ছিটকে পড়েছ এক কোণে, দরজার কাছে, আব আমি আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তোমার পানে পিছন ফিরে। আয়নাতে দেখছি তোমার মুখের কাতর ভাব, আমার জন্য ব্যর্থ পাও নি বলে। একটুখানি ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে হানবো মধুরতম কটাক্ষ—একগাড়ি লোকের কৌতূহল নয়নে তাকানোকে একদম পরোয়া না করে। আমার তখন কী গর্ব, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার জন্য কত ভাবছ।'

আমি বললুম, 'শোন শবনম, তোমাকে একটা সত্য কথা আজ বলে রাখি। আমাব মত লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী আল্লার দুনিয়ায় রয়েছে। এমন কি এখানে যে কজন হিন্দুস্থানী আছে তাব ভিতরও আমি অ্যাডোনিস্ বা রুডল্ফ্ ভালেন্টিনো নই। তোমার সৌন্দর্যেব খ্যাতি ওদিকে আমু দরিয়া, পূবে পেশাওয়ার, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে দক্ষিণ-পাহাড় ছাড়িয়ে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে গেছে, কেউ জানে না। আমি শুনেছি ভারতীয় শিক্ষকদের কাছে, তাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্ত্রীদের কাচ থেকে। তাঁরা বলেন, বাদশা আমানুল্লা নিতান্ত একদারনিষ্ঠ বলে তুমি অবিবাহিতা —একই দেশে তো দুটো রাজা থাকতে পারে না, যদিও একই গাছ-তলায় এক শ'টা দরবেশ রাত্রি কাটায়। গর্ব যদি কারও হয় তবে সে হবে আমার। তামাম

হিন্দুস্থান তোমার দিকে তাকাবে আর ভাববে কোন্ পুণ্যের ফলে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

বললে, 'শুনতে কী যে ভাল লাগে, কি বলব তোমায়। আমি জানি, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, মাথা নিচু করা উচিত, কিন্তু আমি এমনি বে-আব্রু বেহায়া যে এসব কথা আমার আরও শুনতে ইচ্ছে করছে। যদি কুপে পেয়ে যাই তবে আমি খোলা জানলার উপর মুখ রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব, আর তুমি পিছনে বসে আমার পিঠের উপর খোলা চুলে মুখ গুঁজে এই সব কথা বলবে।'

তারপর আমার দিকে স্থির কিন্তু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'শুনে রাখ, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে দেহের সৌন্দর্যকে হার মানাবো। সে হবে পরিপূর্ণ একটি হিমকণিকার মত—যার প্রেমের ডাকে আকাশের শত লক্ষ তারা হবে প্রতিবিম্বিত, আর দিনের বেলা গভীর নীলাম্বুজের মত নীলাকাশ—তার অন্তহীন রহস্য নিয়ে।'

তারপর শব্‌নম পড়লো তার সফর্-ই-হিন্দুস্তান অর্থাৎ ভারত ভ্রমণ নিয়ে।

হিন্দুস্থানের রেল লাইনের দু'পাশে অক্লেশে সে গজালে আঙুর বন, দিল্লির কাছে এসে ব্লিজার্ডের বরফে ট্রেন আটকা পড়লো দু'দিন, ডাইনিং কারে অর্ডার দেওয়া মাত্র পেয়ে গেল কাঁচা দুম্বার শিক্-কাবাব, ট্রেন পুরো পাক্কা একটা দিন ছুটলো ঘন চিনার বনের মাঝখান দিয়ে, আগ্রা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সে কিনলে নরগিস্ ফুল আর হলদে গুল-ই-দায়ূদী, মোমতাজের গোরে দেবার জন্য। আর সর্বক্ষণ পাশের গাড়িতে বসে আছে তোপল্ খান, উরুর উপর দু'খানি রাইফেল পাতা, পকেটে টোটা ভরা রিভলভার, বেল্টে দমস্কসের তলোয়ার—পাছে তার চার মুহম্মদী শর্তে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার কেনা টিকিট স্বামীটিকে কেউ কেড়ে নেয়!

আমার তো ভয় হচ্ছিল, আবার বুঝি শব্‌নম বোরকার ভিতর থেকেই পিস্তল মারতে আরম্ভ করে—মার্কিন গ্যাংস্টাররা যে রকম পকেটের ভিতর থেকেই তাগ করে দুশমন ঘায়েল করতে পারে।

নানাবিধ মুশকিল যাবতীয় ফাঁড়া-গর্দিশ এবং তার চেয়ে প্রচুরতর আনন্দের ভিতর দিয়ে শবনম বীবী তো শেষটায় পৌঁছলেন পূর্ব বাঙলায় তাঁর শ্বশুরের ভিটায়।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে।'

'দাড়াও না, তোমার খালি তাড়া। হাফিজ বাঙলাদেশে না আসতে পে বাঙলার রাজদূতকে তার বাদশার জন্য কি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন? যে যেটা তোমাকে হোটেলের বারান্দায় দিয়েছিলুম।'

আমি বললুম,

"হেরো, হেরো, বিস্ময়!

দেশ কাল হয় লয়!

সবে কাল রাতে জনম লইয়া এই শিশু কবিতাটি

রওয়ানা হইল পাড়ি দেবে বলে এক বছরের ঘাটি।"

তুমিও এক মাসের বধূ, এক বছরের পথ পাঁচ দিনে পৌছলে।'

'চুপ, চুপ, ওই বৈঠকখানায় মুরুব্বীরা বসে আছেন। ওঁদের গিয়ে প্রথম সালা করতে হবে, না সোজা অন্দর মহলে যেতে হবে? কী মুশকিল, কিছু জানি নে।'

আমি বললুম, 'এই বারে পথে এস—আমাকে যে কথা কইতে দাও না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, বলে দাও না। এই কি দাদ নেবার সময়?'

আমি বললুম, 'প্রথম অন্দরে। মা বরবধূ বরণ করবেন যে।'

'সে আবার কি?'

'মা মোড়ায় বসবেন, আমি তাঁর ডান উরুতে বসব, তুমি বাঁ উরুতে বসবে—'

'সর্বনাশ! আমার ওজন তো কম নয়। তোমার কত?'

'একশ' দশ পৌণ্ড।'

'কিলোগ্রামে বল।'

'সে হিসেব জানি নে।'

'দাঁড়াও, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসি।'

ওর আঁক কষার মাঝখানে আমি দরদ ভরা সুরে বললুম, 'হ্যাগা, তোমার হিসেবে তো দেখছি তোমার ওজন চার শ' পৌণ্ড। আমার চেয়ে চারগুণ ভারি। তা হতেও পারে।'

'[illegible] ছাড়। ওটা—ওটা—ওটা হল গিয়ে আউন্স।'

'তা হলে তোমার ওজন আমার চার ভাগের এক ভাগ, হবেও বা।'

'সর্বনাশ! তাও তো হয় না। এখন কি করা যায়?'

আমি বললুম, 'আলতো আলতো বসলেই হবে।'

মা বরণ করলেন। কলাপাতা দিয়ে তেকোণা করে বানানো সমোসার মত

পত্রপুটের ভিতর ধান—তিন কোণ দিয়ে বেরিয়ে আছে দূর্বা। আমাদের মাথার উপর অনেকগুলো রাখলেন। শব্‌নমের ওড়না তার হাঁটু পর্যন্ত নামানো।

আমার দুই ভাইঝি জাহানারা আর রানী—'কুটিমুটি'—প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে নূতন চাচীর মুখ সকলের পয়লা দেখবে বলে।

শব্‌নম স্বপ্ন দেখছে। আমি কথা বলে এক স্বপ্ন উড়িয়ে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে আরেক স্বপ্নে ঢুকে যায়। কিন্তু সব চেয়ে তার ভাল লাগে মায়ের কোলে ওই বসাটা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার রইল এ-জীবনে একটি মাত্র আশঙ্কা। মা যদি আমাকে ভালো না বাসে।'

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, 'তুমি ওই ভয়টি করো না শব্‌নম—প্রীজ—লক্ষ্মীটি। তোমাকে ভালবাসবে মা সবচেয়ে বেশি। তুমি কত দূরদেশ থেকে এসেছ, সব আপন জন ছেড়ে, শুধু আমাকে ভালবাস বলে। একথা মা এক মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারবে না। মাকে যদি কেউ ভালবাসে এক তিল, মা তাকে বাসে একতাল। আমাকে যদি কেউ ভালবাসে এক কণা, মা তাকে বাসবে দুই দুনিয়া—ইহলোক, পরলোক।'

'বাঁচালে। তুমি তো জান, আমার মা নেই।'

যাবার সময় শব্‌নম বললে, 'বিপদ ঘনিয়ে আসছে। শিগ্‌গিরই তার চরমে পৌঁছবে।'

আমি চিন্তিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কিছু জান?'

বললে, 'না। আমি শুধু আমার হাড়ের ভিতর অনুভব করছি।'

'আবার কবে দেখা হবে?'

'এরকম থাকলে রোজই আসতে পারব।'

তারপর দুজনাই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম, মুখোমুখি হয়ে। বলার কথার অভাব আমাদের কারোরই হয় না, কিন্তু বিদায়ের সময় যতই ঘনিয়ে আসে ততই আমরা শুধু একে অন্যের দিকে তাকাই আর আপন মনে মনে অজুহাত খুঁজি কি করে বিচ্ছেদ-মুহূর্ত আরও পিছিয়ে দেওয়া যায়। শব্‌নম আমার মনের কথা আমার বেদনাতুর চোখ দেখেই বুঝতে পারে আর নিজের চোখ দুটি নিচের দিকে নামায়। হয়তো তার চোখে জল এসেছে। কখনও বা জড়িয়ে-যাওয়া গলায় কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

এবারে বললে, 'তুমি প্রতিবারে আমাকে দাও আগের বারের চেয়েও বেশি।

যত বেদনা নিয়েই বিদায়ের সময়টা আঁতুক না কেন, পথে যেতে যেতে ভাবি তুমি
যে আনন্দ দিয়েছ এর বেশি আর আসছে বার কি দেবে ? তবু তুমি দাও, প্রতি
বারেই দাও, বেশি করে দাও, উজাড় করে দাও। কি দাও তুমি ? আমি অনে
বার ভেবেছি। উত্তর পাই নি। এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, আমা
রাজার রাজা, গোলামের গোলাম এই তো আমার আনন্দের পরিপূর্ণতার চর
সীমা। এর বেশি আমি কীই বা চাইতে পারি, তুমি কীই বা দিতে পার ?
পাই, প্রতি বারেই অদ্ভুত অনির্বচনীয় রসঘন আনন্দ। আর যখন তুমি আমা
বল, "আমি তোমাকে ভালবাসি" তখন আমার দুচোখ ফেটে বেরয় অশ্রু
আমার কানায় কানায় ভরা হৃদয়-পাত্র তখন যেন আর বেদনার কূল না মে
উপচে পড়তে চায়। বল, তুমি আমায় কক্ খনও ত্যাগ করবে না ?'

আমি থতমত খেয়ে গেলুম। এত কথা বলার পর এই অর্থহীন প্রশ্ন
যেখানে আমরা পৌঁছেছি সেখানে এ-প্রশ্ন যে একেবারে অসম্ভব—পাগলের
কল্পনার বাইরে।

বললে, 'তুমি আমাকে মার, সাজা দাও, ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও
কিন্তু আমাকে ত্যাগ করো না।'

আমি কিছু বলি নি। শুধু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

বললে, 'বড় দুঃখে আজ সকালে একটি কবিতা লিখেছি। নিজে কখনও
জিনিস লিখি নি বলে প্রথম দু লাইন এক বিদেশী কবির কাছ থেকে নিয়েছি
কিন্তু আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কবিতাটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে
তোমার কলমটা দাও। এটা কিন্তু গদ্যে লিখবো। এখন পড়ো না—আমি চলে
যাওয়ার পরে পড়ো।'

দেউড়িতে এসে অবাক হয়ে শুধোলে, 'তুমি আবার চললে কোথায় ?'

আমি বললুম, 'তোমাকে পৌঁছে দিতে।'

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'অসম্ভব।'

আমি তর্ক করি নি।

একটি দিন, একটি বার, আমি আমার জীবনে তার আদেশ লঙ্ঘন করেছি
তর্ক না করে, আপত্তি না তুলে। শেষটায় সে হার মানল। আমি বেশ কিছু
পিছনে তার উপর নজর রেখে রেখে চললুম। বাড়ির দেউড়িতে পৌঁছে একব
ঘুরে দাঁড়াল

সে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি, কিন্তু আমি শুনেছি সে বলেছিল, 'তোমা

হাতে সমর্পণ করলুম।'

ফি ফিরে এসে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলুম।

'তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অকূল পারাবার
কেমনে হইব পার ?
দুখ-রজনীর প্রেমের প্রদীপ ভাসায়ে দিলেম আমি
নীরব নিশ্বাস পালেতে দিলেম জানে অন্তরযামী।
শেষ দীপ-শিখা দিলেম তোমারে মোর কিছু নাহি আর
ত্বরা এস বঁধু, বেগে এস প্রভু, নামাও বেদনাভার।'

পর গদ্যে লেখা : 'এর আর প্রয়োজন নেই
তুমি যে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছ—'
বাকিটা শেষ করে নি।

পুরুষমানুষ হয়েও সে রাত্রে আমি কেঁদেছিলুম। 'হে পরমেশ্বর',—চোখের ন বলেছিলুম, 'হে দয়াময়, আমাকে কেন পুরুষ করে জন্ম দিলে ? এই বলহীনা বিপদ তুলে নেবে আপন মাথায় আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব ? মি কোনদিন তার কোনও কাজে লাগব না ?'

॥ ছয় ॥

দিন সকালবেলাই খবর পেলুম, আমানুল্লার সৈন্যদল রাত্রিবেলা হেরে যাওয়াতে নে তাঁর বড় ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে কান্দাহার পালিয়ে গিয়েছেন।

রাস্তার অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। বোরকা তো অন্তর্ধান করেছেই, ডাগর মানরাও একলা-একলি—বেরয় না—এক একটা দলে অন্তত পাঁচ-সাত জন না লে মানুষ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। বাচ্চার ডাকু সৈন্যদল রাস্তা ছেয়ে লছে।

তিন দিন পর আমানুল্লার দাদাও সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। বাচ্চা সিংহাসনে বসল।

এসব খবর যে কোনও প্রামাণিক আফগান ইতিহাসে সবিস্তরে পাওয়া —একথা পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি ; বাচ্চার আপন ত জ্বালানো দাবানল শহর নয় ও আমার মত নিরীহ শুষ্ক পত্রের দিকে কি ভাবে

এগিয়ে এল সেইটে-বোঝাবার জন্য তুম্বতম খেইগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

দু হাতে মাথা চেপে ধরে ভাবছি, কি করি, কি করি? কোন দিকে পথ, কোথায় আলো—আর কোনটাই বা আলেয়া?

সুখ চাই নে, আনন্দ চাই নে, এমন কি প্রিয়মিলনও চাই নে—কি করে এই দাবানল থেকে শব্‌নমকে রক্ষা করি?

আমি রক্ষা করবার কে?

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে বুটের ধপাধপ শব্দ করে আব্দুর রহ্‌মান ঘরে ঢুকে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' আব্দুর রহ্‌মানের গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমি দু'বার শুনেও প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি নি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম।

মাথা নিচু করে কিচ্ছু না বলে নীরব অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি গম্ভীরে—এবং সেই অর্ধসংবিতেও আমার মনে হল—প্রসন্ন অভিবাদন জানালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আপনার পরে'—অর্থাৎ 'আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।' তিনি কেন এসেছেন, এই ভাবনার ভিতরও আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, শব্‌নমের গলা মধুর, এঁর গলা গম্ভীর, অথচ দু' গলারই আদল এক, ঝংকার-সমধ্বনি। যেন শিশু শব্‌নম বাপের পাগড়ি জোব্বা গোঁফদাড়ি পরে এসেছে।

আমি আপত্তি না জানিয়ে শুধু 'খানা-ই শুমা অস্ত্‌—এটা আপনার বাড়ি' বলে আগে আগে পথ দেখিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ইরানী কায়দায় একবার 'এটা আপনার বাড়ি' বলার পর অভ্যাগতজন আদেশ করবেন, গৃহস্থ তাঁর কথা মত চলবে।

আমাকে আসন দেখিয়ে নিজে সোফায় বসলেন।

আমি কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইরান আফগানের মুরুব্বীরা এতে খুশি হয়ে বলেন, 'বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ্‌—ছেলেটার আব্রু-শরম-বোধ আছে।'

শুধালেন, 'আপনি আমার পরিচয় জানেন?'

আমি মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'কিছু কিছু জানি।'

বললেন, 'তাই যথেষ্ট। আমিও আপনাকে কিছু কিছু চিনি। এদেশে এখন অল্প-বিস্তর বিদেশী আসতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু আমি সকলের সঙ্গে আলাপ-

রচয় করবার সুযোগ এখনও পাই নি। তবে গেল বছর আপনাদের কলেজের ংসরিক পরবে আপনি এদেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইটে ানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আপনি বড় একাগ্র মনে অত্যন্ত দরদ দিয়ে াপনার বক্তব্য পেশ করেছিলেন, সেটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার ন হয়েছিল, আপনি এই পরদেশকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছেন। নয় কি?'

আমি মাথা নিচু রেখেই বললুম, 'এদেশ আমাকে অবহেলা করে নি। এদেশে 'মি আশাতীত ভালবাসা পেয়েছি। প্রতিদানের চেয়েও বেশি দেবার চেষ্টা :রেছি।'

'এই তো ভদ্রজনের আচরণ।'

আমি তখন শুধু ভাবছি, তাঁর এখানে আসার রহস্য কি? তবে কি শব্‌নম কে কিছু বলেছে। তাই বা কি করে হয়?

নিজের থেকেই তিনি কাবুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ষায় আমাকে বোঝালেন। তাঁর যুক্তিধারা থেকে পদে পদে প্রমাণ হল তিনি ধারণ সৈন্যদের কঠিন জিনিস বোঝাতে অভ্যস্ত।

সর্বশেষ বললেন, 'আমি সোজা কথা বলাটাই পছন্দ করি। আমার মনে চ্ছ, আপনিও সরল লোক। তাই আপনার কাছে অন্য লোক না পাঠিয়ে আমি জেই এসেছি। যদিও এ অবস্থায় নিজে আসাটার রেওয়াজ এদেশে নেই।

'আমি আমার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি নি। আমি সিপাই। াণের প্রতি যাদের অত্যধিক মায়া তারা ফৌজে বেশি দিন থাকে না—অন্তত ্মাত্র দু'পয়সা কামাবার জন্য আমার ফৌজে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'এবার আপনাকে যা বলছি তা গোপনে।

'আমার একটি কিশোরী কন্যা আছে। লোকে বলে অসাধারণ সুন্দরী। ন্তত তার সে খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আজ বিশ্বস্তসূত্রে খবর ায়েছি বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দ্বিতীয় সেনাপতি—প্রথম সেনাপতির ছোট ভাই— ্র দুই পূর্বে কাঠ বেচতে এসে তাকে কাবুলে দেখতে পেয়েছিল—আমার মেয়ে ারাচর পর্দা মানতো না। যে জিনিস তখন তার বন্ধ উন্মাদাবস্থার ও উৎকট ্রনার বাইরে ছিল আজ সৈন্যদল প্রয়োগে সেটা অসম্ভব নাও হতে পারে।

'আপনি হিন্দুস্তানী। আপনি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন তবে সে ন্দুস্তানী পাসপোর্টটি পেয়ে যাবে। আমি আপনাদের রাজ-দূতাবাসে জিজ্ঞাসাবাদ য়েছি; ভারতীয় এক বড় রাজকর্মচারী বললেন, 'আইনত আমার মেয়ের যে

অধিকার জন্মাবে সেটা তিনি রক্ষা করার সর্ব চেষ্টা করবেন।' যদিও প্রয়োজন ছিল না, তবুও কথা উঠেছিল, এখানে শিক্ষিত অবিবাহিত কে কে আছেন। সেই প্রসঙ্গে আপনার নাম যখন উঠল, মাত্র তখনই তিনি সন্তর্পণে তাঁর উৎসাহ দেখিয়েছেন।'

এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সামনে পড়ে আমি বিস্ময়েই হোক, আনন্দেই হোক, কিছু না বুঝতে পেয়েই হোক হয়তো একটা অস্ফুট শব্দ করেছিলুম।

তিনি বললেন, 'আপনি একটু চিন্তা করুন এবং তার পূর্বে বাকি কথা শুনে নিন।

'বাচ্চা-ই-সকাও এখন মোল্লাদের কথা মত চলে। অন্তত তারা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াটাতে সম্মতি দিতে পারবে না।

'ব্রিটিশ অ্যারোপ্লেন ভারতীয় নারীদের আপন দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে সদয় আশ্বাস দিয়েছেন, প্রথম সুযোগেই তিনি আমার মেয়েকে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেবেন।

'এদেশে ফরাসী জর্মন—বিদেশী প্রায় সবই অবিবাহিত। কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই ইউরোপীয় বিয়ে করবে না। প্রথমত তারা খৃষ্টান, দ্বিতীয় তাদের সাম্রাজ্যবাদ প্রবৃত্তি এবং তৃতীয়—বোধ হয় এইটেই সর্বপ্রথম বলা উচিত ছিল— তাদের শারীরিক অশুচিতা সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। যদিও তার তমদ্দুন-কর্‌হঙ্গের, বৈদগ্ধ্যের অর্ধেকেরও বেশি ফরাসী।

'এ কথাটা তুললুম, আপনি হয় তো শুধাবেন,আমার মেয়ের মত আছে কিনা। আপনি মত দিলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব, কারণ ধর্মত আইনত সে প্রাপ্ত-বয়স্কা। যদি সে অমত করে, আশা করি আপনার অভিমানে লাগবে না। যে রকম আমি আপনাকে সরল মনে বলছি, আপনি অমত করলে আমি কণামাত্র অপমানিত বোধ করব না।

'কারণ, হয়তো আপনারা আপনাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করেন না; আমরাও আমাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করি নে—যদিও ইসলাম এরকম গোষ্ঠী পাকানো নিন্দার চোখে দেখে। আপনি রাজী না হলে আমি কখনও ভাববো না, আপনি আমার মেয়েকে কিংবা আমি এবং আমার গোষ্ঠীকে খাটো করে দেখলেন।

'আমার মেয়ে সম্বন্ধে বাপ হয়ে আমি কি বলব। আমি প্রশংসা করতে চাই নে। সে আমার একমাত্র মেয়ে, ছেলেও নেই, তার গর্ভধারিণী—'

এই প্রথম তাঁর সরল দৃঢ় কথাতেও যেন একটু অতি ক্ষীণ কাঁপন শুনতে পেলুম।

'—অল্প বয়সে মারা যান। বাপ হয়ে তাই ইংরেজের মত ব্যাটার অব্ ক্যাট্, বা সাদামাটা ভাবে বলি, তার চারটে 'বি'-ই আছে। বিউটি, ব্রেন, বার্থ, ব্যাঙ্ক—অবশ্য চতুর্থটা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সর্বশেষে আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, আপনি রাজী হলে ফলস্বরূপ বাচ্চার সেনাপতির বিরাগভাজন হবেন।'

এতক্ষণ তিনি আমার দিকে ঝুঁকে, উরুতে দুই কনুই রেখে, চিবুক দুই হাতের উপর রেখে কথা বলছিলেন। এবারে শিরদাঁড়া খাড়া করে ফৌজী কায়দায় সোজা হয়ে বসে বললেন, 'এবারে আপনি চিন্তা করে বলুন।'

তিনি যে ভাবে শান্ত হয়ে আসনে বসলেন তার থেকে বোঝা গেল, প্রিয় অপ্রিয় নানারকম সংবাদ শুনতে তিনি অভ্যস্ত। আমার 'না' তাঁকে বিচলিত করবে না, আমার 'হাঁ' তাঁকে প্রসন্ন করবে।

আমার 'হাঁ', 'না', ভাববার কি আছে। তবু আমি এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে প্রথমটায় আমি কিছুই বলতে পারি নি। তারপর মাথা নিচু রেখেই নববরের কণ্ঠে বলেছিলুম, 'আপনার কন্যাকে আমি আল্লাতালার মেহেরবানীর মত পেতে চাই।' আমি ইচ্ছে করেই আমার সম্মতি প্রস্তাবের রূপ দিয়ে প্রকাশ করেছিলুম—কিন্তু আপন অজানতে। আমি বিশ্বাস করি, করুণাময় তাঁর অসীম দয়ায় মূককে যে শুধু ভাষাই দেন তা নয়, সৌজন্যের ভাষাও বলতে শেখান।

আওরঙ্গজেব খান দাঁড়িয়ে উঠে আমায় আলিঙ্গন করলেন।

আসন গ্রহণ করে বললেন, 'আমার কন্যার কিস্মৎ যদি ভালো থাকে তবে আপনি অসুখী হবেন না। আর আপনি আমার উপকার করলেন। জামাতার কাছে উপকৃত হওয়া বড় আনন্দের বিষয়।'

আমি বললুম, 'আপনি গুরুজন। যদি অনুমতি করেন তবে একটি নিবেদন আছে।' আমি আমার গলা ফিরে পেয়েছি।

প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'আপনি দয়া করে উপকারের কথা তুলবেন না। আমি আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করছি, শিষ্য যে রকম মুর্শীদের কাছে গুরু-কন্যা কামনা করে।'

এবারে তিনি বিচলিত হলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন আমার মস্তক চুম্বন করতে করতে বললেন, 'বাচ্চা—বৎস—তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে, তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে। . তোমার পিতামাতার আশীর্বাদ তোমার উপর আছে।'

আমি তাঁর হস্তচুম্বন করলুম।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'পাপাচার শুভবুদ্ধির চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে। তাই শুভকর্ম শীঘ্র করতে হয়। বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের পাপবুদ্ধিকে হারাবার জন্য তোমাদের বিবাহ যতশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত। তুমি কি বল?'

আমি বললুম, 'আপনার কাছ থেকে আমার পরিচিত 'শুভস্য শীঘ্রম্' বাক্যের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ বুঝলুম। এখন থেকে আমার আর কোন মতামত নেই।'

'আজ সন্ধ্যায়?'

'আজ সন্ধ্যায়।'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সময় কম। ব্যবস্থা করতে হবে। কীই বা ব্যবস্থা করব? এই দুর্দিনে?'

আমি জানি শব্‌নম রাজী, কিন্তু ইনি কোন সাহসে সব ব্যবস্থা করার চিন্তাতে লেগে গেলেন। বোধহয় কন্যার জনকানুরাগে অখণ্ড বিশ্বাস ধরেন।

আমাকে কোনও কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে এক মুহূর্তেই অন্তর্ধান করলেন।

মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি! আমি মুক্তি পেয়েছি।

আর আমাকে হাত-পা-বাঁধা অসহায়ের মত মার খেতে হবে না। ওই আমলেই বাঙলাদেশে আমাদের মধ্যে রটেছিল যে টেগার্টের পুলিস বিপ্লবীদের হাত পা বেঁধে সর্বাঙ্গে মধু মাখিয়ে ডাঁশ পিঁপড়ের মাঝখানে ফেলে রাখে। আমাকে আর সে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না।

আমি এখন শব্‌নমের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।

তার মিলনের জন্যে এখন আমাকে আর প্রহরের পর প্রহর গুনতে হবে না। আমি যে কোন মুহূর্তে তার সম্মুখে উপস্থিত হতে পারি। আমার দশদিন এখন সত্যই নিরদ্বন্দ্বা হয়ে গেল।

পরিপূর্ণ আনন্দের সময় মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধায় না। একটা আনন্দ নিয়ে সে পড়ে থাকতে ভালবাসে। শিশুর মত একটি পুতুলই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে যায়। আমি আমার মুক্তির আনন্দ নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে রইলুম। আমার অন্য সৌভাগ্যের কথা ভাববারই প্রয়োজন হল না, ফুরসত হল না।

এক ঘণ্টা হয় কি না হয়, এমন সময় আব্দুর রহ্‌মন সৌম্যদর্শন এক অতি

বৃদ্ধকে আমার ঘরে নিয়ে এল। ধবধবে সাদা চাপ দাড়ি, সাদা গোঁফ—মোল্লাদের মত ছোট করে ছাঁটা নয়, সাদা বাবরী চুল, তার উপর সাদা পাগড়ি, চোখের পাতা এমন কি ভুরু পর্যন্ত বরফের মত সাদা। এবং সে সাদা বেয়ে যেন তেল ঝরে পড়ছে। এঁর বয়স কম হলে আমি বলতুম, এটা সাদা নয়, সত্যিকারের প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড।

আমি তাঁকে যত্ন করে বসালুম।

অতি সুন্দর ফার্সী উচ্চারণে বললেন, 'আমি আওরঙ্গজেব খানের গুরু। তার মেয়েরও গুরু। দু'জনাকেই ফার্সী পড়িয়েছি। এখনও আমাদের তিন জনাতে মুশাইরা হয়।

'এই খানিকক্ষণ আগে আওরঙ্গজেব খান এসে আমায় সুখবর শোনালে, আপনার সঙ্গে শব্‌নমের শাদি আজ সন্ধ্যাবেলাই হবে। আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি বড়ই খুশি হয়েছি।'

এইটুকু বলে তিনি দু'খানা হাত তুলে আল্লার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করলেন। আমিও হাত তুলে আস্তে 'আমিন' 'আমিন' বললুম।

বললেন, 'যেই শুনতে পেলুম, আপনার মুরুব্বী এখানে কেউ নেই, অমনি আমি বললুম আমার উপর এর ভার রইল। আওরঙ্গজেব চায় নি যে এই খুন-রাহাজানির মাঝখানে আমি রাস্তায় বেরই। আমি স্পষ্ট তাকে বলে দিলুম, এ সংসারে আমি এমনিতেই আর বেশি দিন থাকব না—না হয় দু'দিন আগেই গেলুম।'

আমি বললুম, 'আপনি শতায়ু হন।'

বৃদ্ধের রসবোধ আছে। বললেন, 'আমার বয়স আশি হয়েছে। আরও কুড়ি বছর বাঁচতে চাই নে। বরঞ্চ ওই কুড়িটি বছর আপনি আপনার আয়ুতে জুড়ে দিন কিংবা শব্‌নম বানু আর আপনাতে ভাগ করে। কোন জিনিস বরবাদ করাটা আমি আদপেই পছন্দ করি নে। এখন, প্রথম কথা: আওরঙ্গজেব খান আপনাকে জানাতে বলেছেন, "আজ সন্ধ্যায় আপনাদের বিবাহ।" আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

'দ্বিতীয় কথা: আপনার বন্ধুবান্ধব কে কে এখানে আছেন তাঁদের নাম-ঠিকানা বলুন। আমি কিংবা আমার বাড়ির লোক তাঁদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসবে উভয় পক্ষ থেকে। দু'জন করে লোক যাবে।'

আমি বললুম, 'এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণ করে কাকে আমি বিপদে ফেলি? তাদের কারোর যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয় তবে তার বাল-বাচ্চার সামনে আমি আমার

মুখ দেখাতে পারব না। আর আমার সেরকম মিত্র সখাও কেউ নেই। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এখানে—তাও সহকর্মীরূপে। কিন্তু তার পূর্বে আমার উচিত আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা।'

বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না, না, না। আপনি বিদেশী—এদেশের অবস্থা জানেন না। এখন শুধুমাত্র লৌকিকতা করার জন্য রাস্তায় বেরুনো উচিত নয়। আমি আপনার হয়ে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাব। তারা সবাই বরপক্ষের হয়ে যাবে।

'এবারে আপনার খিদমতগার আব্দুর রহ্‌মানকে দাওয়াৎ করতে হবে।'

আমি বললুম, 'তাকে ডাকি।'

আবার ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না, না, না। আমি তাকে হিন্দুস্থানী কায়দায় কনে পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ জানাব তার কাছে গিয়ে।

'তৃতীয় কথা: আপনার জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা আমি করব। আমার মেয়ে আপনার মোটামুটি উচ্চতা আওরঙ্গজেব খানের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে এবং সেলাইয়ের কলে বসে গিয়েছে। এ-তো জোব্বার ব্যাপার, হাঙ্গামা কম। এবার আপনি আমার বুকে বুক লাগিয়ে দাঁড়ান। আমি ঠিক ঠাহর করে নি।'

মোকা পেয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা আলিঙ্গনও দিলেন।

আমি তাঁর হস্তচুম্বন করে বললুম, 'আমার বলতে সাহস হচ্ছে না, কিন্তু কাপড়-চোপড়ের খরচটা?'

বৃদ্ধ সপ্রতিভ। বললেন, 'নিশ্চয়! খয়রাতী বা ধারের জামা-জোড়ায় বিয়ে করাটা মনহূসী—অপয়া।'

আমি বললুম, 'এদেশে ভারতীয় কারেন্‌সির কদর আছে বলে শুনেছি।'

তাঁকে আমার মনিব্যাগটা দিলাম।

তিনি দু-একখানা নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'বিয়ের পর শব্‌নম আর আমার মেয়েতে বোঝাপড়া করে নেবে।'

বৃদ্ধ উঠলেন।

এঁর কথা বলার ধরন শোনার মত। শব্‌নম বয়েৎ ছাড়ে মাঝে-মধ্যে, ইনি প্রায় প্রত্যেকটি কথা বললেন, বয়েতের মারফতে। ঠিক বলতে পারব না, বোধ হয় তাঁর মেয়ে যে সেলাইয়ের কলে বসে গেছেন সেটাও বয়েতেই বলেছিলেন। কিন্তু শব্‌নমের বেলা যেরকম তাকে থামিয়ে টুকে নিতে পারি, এঁর বেলা সেটা পারলুম না বলে দুঃখ রয়ে গেল।

আমুর রহ্মানকে দাওয়াৎ জানিয়ে বিদায় নেবার সময় আমাকে বললেন, 'আপনাকে কয়েকটি বয়েৎ শোনালুম, আপনি তো আমাকে একটিও শোনালেন না ; আপনার বুঝি ওতে মহব্বৎ নেই।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনাকে শোনাবো আ-মি ? আপনার তো সব বয়েৎ জানা।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা ? চেনা গান লোকে শোনে না ? নূতন লাইব্রেরিতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম চেনা বইয়ের সন্ধান করি নে ? জলসা-ঘরে গিয়েও প্রথম খুঁজি চেনা মুখ এবং বলতে নেই গোরস্তানে গিয়েও প্রস্তরফলকে চেনা জনেরই নাম খুঁজি।'

বাপ্-স্! চার চারটে তুলনা—এক নিঃশ্বাসে।

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'আমার এক বন্ধু একটি কবিতা লিখেছেন শুনবেন ?' বলে নরগিসের···

তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পাবাবার

কেমনে হইব পার—?

কবিতাটি শোনালুম। বুড়ো একবারে থ' মেরে গেলেন। 'কাবুলের লোক এরকম লিখেছে ? অসম্ভব! ওর সঙ্গে আমার আলাপ করতেই হবে। বয়সে নিশ্চয়ই কাঁচা। চিন্তাশীল এবং স্পর্শকাতর। ছন্দে মিলে সবুজ রঙের কাঁচা ভাব একটু রয়েছে। যদি লেগে থাকে তবে ইরান হিন্দুস্তানে একদিন নাম করবে। ইন্ শা আল্লা, ইন্ শা আল্লা—আল্লা যদি দেন, আল্লা যদি করান।'

দেউড়িতে বললুম, 'আমাকে দয়া করে আপনি বলবেন না।'

হেসে বললেন, 'নওশাহ্, নূতন রাজা, নবনর, তাই বলেছি। কাল থেকে তুমি বলব। আওরঙজেবও বলেছিলেন, 'বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ'—ছেলেটির আব্রু-শরম বোধ আছে।' আমি বড় খুশি হয়েছি, আগাজান। আর কানে কানে বলি, শব্নমের মত মেয়ে আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে দুটি দেখি নি। নাম সার্থক করে শব্নমের মত পবিত্র।'

অতি সত্য কথা তবু আমার অভিমান হল। সবই শব্নম, শব্নম—আমি যেন কিছুই না।

## ॥ সাত ॥

আমার প্রিয়া, আমার বউ, আমার বিবাহিত স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে চলেছি।

এ যেন একই দিনে দু'বার সূর্যোদয়। কিন্তু তাও হয়। সূর্যোদয়ের একটু পরে ঘন মেঘে সূর্য পড়ল সম্পূর্ণ ঢাকা। সব কিছু ভাসা-ভাসা অন্ধকার—সূর্যোদয়ের পূর্বে যে রকম। মেঘ কেটে পরিষ্কার আকাশে আবার পূর্ণ সূর্যোদয় হল।

কিংবা বলব, ভারতবর্ষে মানুষ যেমন একই দেহ নিয়ে দুইজন্ম লাভ করে 'দ্বিজ' হয়। প্রথম জন্ম তার ব্যক্তিগত, দ্বিতীয় বারে লাভ করে গুরুর আশীর্বাদ, সমাজের সম্মতি। আমাদের এই দ্বিতীয় বিয়েতে আমরা পাব পিতার আশীর্বাদ, সমাজের মঙ্গল কামনা।

সুস্থ বর স্বাভাবিক অবস্থায়ও পরের দিন ঠিক ঠিক বলতে পারে না কি কি হয়েছিল, কোন্‌টার পর কি ঘটেছিল। আমার অবস্থা আরও খারাপ।

কিংখাপের জামা-জোব্বা পরে মাথা নিচু করে বসে আছি শাদির মজলিসের মাঝখানে। একবার মাথাটা অল্প উঁচু করে চার দিকে তাকালুম। মাত্র একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলুম। আমার কলেজের আমারই ছাত্র। তারই কচি মুখটি শুধু হাস্যোজ্জ্বল। আর সকলের মুখে আনন্দ আতঙ্কে মেশানো কেমন যেন এক আবছায়া আবছায়া ভাব। আবার মাথা নিচু করলুম।

এবারের বিয়েতে শব্‌নম সভাতে এসে আমার মুখোমুখি হয়ে বসল না। আমার মুখপাত্র হয়ে একজন 'উকীল' দু'জন সাক্ষীসহ অন্দর মহলে গিয়ে বিবাহে শব্‌নমের সম্মতি নিয়ে এসে মজলিসে আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে বসে বললেন, 'অমুকের কন্যা অমুক, আপনি, অমুকের পুত্র অমুককে এত স্ত্রীধনে মহম্মদী চার শর্তে বিবাহ করতে রাজী আছেন—আপনি কবুল আছেন?' বাকিটা প্রথম বারেরই মত।

হ্যাঁ, মনে পড়ল। এর আগে একটা দ্বন্দ্ব হয়ে গিয়েছে স্ত্রীধন কত হবে তাই নিয়ে। সাধারণত বর পক্ষ সেটা কমাতে চায়, কন্যা পক্ষ সেটা বাড়াতে চায়। এখানে হল উল্টো। পরিবারের ঐতিহ্য ও সম্মান বজায় রেখে আওরঙ্গজেব খান কমিয়ে কমিয়ে যে অঙ্ক বললেন, আমি তাঁর গুরুর মারফতে ঢের বেশি অঙ্ক জানিয়ে দিলুম। গুরুই শেষটায় রফারফি করে দিলেন।

বড় দুঃখে তোপল্‌ খানের কথা মনে পড়ল।

বর বধূর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেছিলেন গুরু। সমস্তটা কবিতা কবিতায়। এবং সব কবিতা মাত্র একজন কবি মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী-র থেকে নিয়ে। আশ্চর্য, কি করে জানলেন উনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় কবি।

তারপর সব ঝাপসা।

আমার অপরিচিত এক ভারতীয় বোধহয় আমাকে মুরুব্বীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁদের সম্মান জানাতে তাঁরা আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সকলের পয়লা কার কাছে গিয়েছিলুম মনে নেই। শ্বশুরমশাই কিংবা জ্যাঠ-শ্বশুরমশাই—অর্থাৎ জানেমন্—আমি কারও মুখের দিকে তাকাই নি।

এসব কায়দা খাস আফগানী কিনা আমি জানি নে। পরে শব্‌নমের কাছে শুনেছিলুম ওই অপরিচিত ভারতীয় মিত্রটি সব-কিছু আধা-আফগান আধা-হিন্দুস্তানী কায়দায় করিয়েছিলেন।

জিরোবার জন্য আমাকে ছুটি দেওয়া হল। বেরুতেই দেখি আমার ছাত্রটি। সে আনন্দে, উৎসাহে সেখানে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। আমার সম্বন্ধে তার গুণকীর্তনের যেটুকু কানে এসেছিল তার সিকি ভাগ সত্য হলে তুর্কীর খলিফার সিংহাসন ইস্তাম্বুল জাদুঘর থেকে বের করে এনে তার উপর আমাকে বসাতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নোবেল প্রাইজের সব-কটা পুরস্কার নাগাড়ে এক শ' বছর ধরে আমাকে দিয়ে যেতে হয়।

আমাকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে এসে আমার হাত দু'খানার উপর তার দু'চোখ চেপে ধরে বার বার বলে, 'হুজুর, এ কী আনন্দ, আপনিই আমাদের দেশে বিয়ে করলেন। হুজুর, ইত্যাদি।' শেষটায় বললে, 'কলেজের সবাই বড় পরিতৃপ্ত হবে, হুজুর, এ আমি বলে রাখছি!'

হায় রে কলেজ! আমরা তখনও জানতুম না বাচ্চা তিন দিন পরে কাবুলের তাবৎ ইস্কুল-কলেজ নস্যাৎ করে দেবে।

একটা ঘরে বসিয়ে তামাক সিগারেট আমার সামনে রাখা হল। শব্‌নমের সমবয়সী আত্মীয়-স্বজনরা প্রথমটায় কিন্তু-কিন্তু করে পরে বাঁধন-ছাড়া বাছুরের মত লাফালাফি দাপাদাপি ঠাট্টা-রসিকতা করলে। আমার কবিতার শখ জেনে শেষটায় লেগে গেল বয়েত-বাজি, কবিতার লড়াই এবং মুশাইরা। শুধু ফার্সী না—দুনিয়ার যত সব ভাষায়। তবে মোলায়েম প্রেমের কবিতার অধিকাংশই ছিল ফার্সীতে।

খবর এল, জানেমন্ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাকে সামনে বসিয়ে আমার সর্বাঙ্গে হাত বুললেন। এমন কি চোখে,

নাকে, গালে, কপালে, ঠোঁটে পর্যন্ত। তখন দেখলুম, তিনি অন্ধ।

অতি মৃদু কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, 'শোন বাচ্চা, তোমাকে সব-কথা বলার মত লোক এ বাড়িতে আর কেউ নেই আমি ছাড়া। জন্মের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত শব্‌নম একদিনের তরেও আমার চোখের আড়াল হয় নি। আমি জন্মান্ধ নই, যৌবনে চোখের জ্যোতি হারাই। শব্‌নম সে জ্যোতি ফিরিয়ে এনেছে। আজ যদি কেউ বলে শব্‌নমের ভালবাসার পথে আমি একটিমাত্র কাঁটা পুঁতলে আমার চোখের জ্যোতি ফিরে পাব তা হলে আমি সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেব।

'প্রথম দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, সে ভালবেসে ফিরেছে। যখন ফিরে এল, তখনই শুনি তার গলা বদলে গিয়েছে, তার হাসি বদলে গিয়েছে, আমাকে আদর করার ধরন বদলে গিয়েছে। যেন এতদিন ছিল পাতার আড়ালে লুকনো ফুল—এখন তার উপর পড়েছে প্রভাতবেলার স্নিগ্ধ আলো। ঘরের কোণের প্রদীপ হঠাৎ যেন আকাশের বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন নবীন মাধুরী এসে ধরা দিয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নূতন তালে নেচে উঠেছে।

আমার থেকে দূরে চলে গেল? না, বাচ্চা, না। সেই তো প্রেমের রহস্য।

'এতদিনে বুঝতে পারল, আমি তাকে কতখানি ভালবেসেছি—তোমাকে ভালবাসার পর। আগে আমার কাছে আসত ঝড়ের মত, বেরিয়ে যেত তীরের মত। এখন আমার সঙ্গে কাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তোমার বিরহ থেকে বুঝেছে, যে আড়ালে গেলে আমার কী দুশ্চিন্তা হয়। যে-বেদনা সে পেয়েছে, সেটা সে আমাকে দিতে চায় না। অথচ দুই ভালবাসার কত তফাত। আমার ভালবাসা মরুভূমিতে মরণাপন্ন তৃষ্ণার্তকে সঞ্জীবনী অমৃতবারি দেওয়ার মত।

'আমাকে কিছু বলে নি। আমিও জিজ্ঞেস করি নি। প্রেম গোপন রাখতে যে গভীর আনন্দ আছে তার থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে যাব কেন? শুনেছি প্রথম গর্ভধারণ করে বহু মাতা সেটা যত দিন পারে গোপন রাখে। নিভৃতে আপন মনে সেই ক্ষুদ্র শিশুটির কথা ধ্যান করতে করতে সে চলে যায় সেই স্বর্গলোকপানে, যেখান থেকে মুখে হাসি নিয়ে নেমে আসবে এই শিশুটি।

'আমিও নিভৃতে অনেক চিন্তা করেছি, কে সে বীর যে শব্‌নমের চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছে। তার সঙ্গে যাদের বিয়ে হতে পারে তাদের সবাইকে তো আমি চিনি। এদের কেউই নয়, সে-কথা নিশ্চয়।

'বুঝলুম, কোন জায়গায় কোন বিপত্তি বাধা আছে তাই সে তোমাকে পুরোপুরি পাচ্ছে না। আমার বেদনার অন্ত রইল না। ওই একবার আমার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, কেন আমি জ্যোতিহীন হলুম। না হলে আমি তোমাদের বাধাবিঘ্ন সরিয়ে দিতুম না, যার সামনে দু'জন দু'দিক থেকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছ ?'

সে বেদনা আজ কেটে গিয়েছে বলে তার স্মরণে জানেমনের মুখ পরিতৃপ্তির স্মিতহাস্যে কানায় কানায় ভরে উঠল।

আমি বললুম, 'আমি বিদেশী। আপনারা আমাকে হিমি—শব্‌নমের উপযুক্ত মনে করেন কিনা সেই ভয়ে আমিও অসহায়ের মত মার খেয়েছি। আমি বুঝি।'

'তোমার গলাটি আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। এখন তো ওই দিয়েই আমি মানুষকে চিনি। আরও কাছে এস বাচ্চা। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও। শব্‌নম যে রকম দেয়। এ কি, তোমার হাত অত নরম কেন? প্রায় শব্‌নমের মত!'

আমি হেসে বললুম, 'বাঙলাদেশের লোক আপনাদের মত শক্তিশালী হয় না।'

'বাঙলাদেশ? তাই বল। তাই শব্‌নমের এত প্রশ্ন, হাফিজ বাঙলাদেশে গেলেন না কেন, হাফিজের অর্থকষ্ট বাঙলার রাজা তো দূর করে দিতে পারতেন, আরও কত কি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল, একদিন সে যখন এক অজানা কবির কবিতা পড়ে আমায় শোনাতে গেল। ভারী মধুর আর করুণ। ঠিক ফার্সী নয়, আবার ইউরোপীয় কবির ফার্সী অনুবাদও নয়। কেমন যেন চেনা চেনা অথচ অচেনা। আবার কেমন যেন এটা-ওটায় মেশান। যেন গন্ধ গোলাপের, চেহারা কিন্তু নরগিসের, এ আবার বসন্তে না ফুটে ফুটেছে যেন শীতকালে। একটি কবিতা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে—"খুদ্‌-কুশী-ই সিতারা"। বৃদ্ধ থামলেন। যেন মনে মনে কবিতাটির চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে নিলেন।

বুঝলুম, এটা 'তারকার আত্মহত্যা'।

আমি বললুম, 'এ কবির পিতা সূফী সাধক ছিলেন এবং অতি উত্তম ফার্সী জানতেন। কবি বাল্যবয়সে পিতার কোলে বসে বিস্তর ফার্সী গজল-কসীদা শুনেছেন। আসছে গ্রীষ্মে এখানে তাঁর আসবার কথা ছিল; বোধহয় আপনাদের কবি হাফিজ বাঙলাদেশে যেতে পারেন নি বলে বাঙলার কবি তার প্রতিশোধ নিতে আসছিলেন। এখন তো সব-কিছু উলোট-পালট হয়ে গেল।'

জানেমন্ বললেন, 'হাফিজের পাঁচ শ' বছর পরে যোগাযোগ এসেছিল

তোমাদের কবির মাধ্যমে। আরও ক'শ' বছর লাগবে কের এই যোগাযোগ হতে কে জানে? কে যেন এক বিদেশী জ্ঞানী দুঃখ করে বলেছেন, মানুষ একে অন্যকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে বেশী—দু'জনের মাঝখানে সেতু বাঁধার চেষ্টা করে তার চেয়ে ঢের ঢের কম ;—

"হায় রে মানুষ,
বাতুলতা তব
পাতাল চুমি ;—
পাচীর যত না
গড়েছ, সেতু তো
গড়ো নি তুমি।"

'তাই প্রার্থনা করি, শব্‌নমে তোমাতে আজ যে সেতু গড়লে সেটি অক্ষয় হোক।'

আমি বললুম, 'আমেন—তাই হোক।'

এমন সময় খবর এল, ভোজে বরকে ডাকা হচ্ছে।

উঠবার সময় জানেমন্ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার যদি একটা কথা বিশ্বাস কর, তবে বলি, শব্‌নমের মধ্যে এতটুকু খাদ নেই। ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে তোমার কক্‌খনো কোনও ক্ষতি হবে না। মিথ্যা কখনও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শিশিরবিন্দুর মত সত্যই সে পবিত্র, স্বর্গ হতে সে এসেছে সম্পূর্ণ কলুষ-কালিমা মুক্ত হয়ে। আমি বুঝেছি, তুমিও বড় সরল প্রকৃতি ধর। তোমাদের মিলনে স্বর্গের আশীর্বাদ থাকবে।'

আমাকে উপহার দিলেন এক বিরাট বদখ্‌শানী রুবি। তার উপরে খোদাই সম্পূর্ণ কাবা শরীফের ছবি। এত বড় রুবি আর এ রকম সূক্ষ্ম খোদাই আমি কাবুল জাদুঘরেও দেখি নি অথচ আমি জানতুম, বদখ্‌শান আফগানিস্থানের প্রদেশ বলে কাবুলের জাদুঘরে রুবির যে সঞ্চয় আছে সেটি পৃথিবীতে অতুলনীয়।

বললেন, 'মনে যদি কখনও অশান্তি আসে তবে এটি আতশী কাচ দিয়ে দেখো। শুনেছি, জমজমের কুয়ো পর্যন্ত দেখা যায়। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে নাকি জল ওঠাবার সাজসরঞ্জাম পর্যন্ত পরিষ্কার ফুটে ওঠে! এটি আমাদের পরিবারে ছ' শ' বছর ধরে আছে। প্রার্থনা করি, কাবা যতদিন থাকবে, তোমাদের ভালবাসা ততদিন অক্ষয় থাকবে।'

'আমেন।'

তারপর আবার সব ঝাপসা। আবছায়া-আবছায়া মনে পড়ছে, ভোজে পাশে বসেছিল আমার ছাত্রটি। সে আমাকে এটা ওটা খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল আর তার উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত আনন্দ সে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। আমি নিজের অপ্রতিভ ভাব ঢাকবার জন্য তাকে সংস্কৃতের 'হাঁহাং দদ্যাৎ, হুঁহুং দদ্যাৎ' এবং 'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে—' ফার্সীতে অনুবাদ করে মৃদু কণ্ঠে শুনিয়েছিলুম।

রাত প্রায় বারোটার সময় এক অপরিচিত নওজোয়ান আমাকে হাত ধরে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তেতলার মুখে এক দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, 'বড়ই আফসোস, কি করে হৃদয়-দুয়ার ভেঙে নববরের—নওশাহের—নবীন বাদশার সিংহাসন লাভ করে অভিষিক্ত হতে হয় তার খবর আমি জানি নে। আমার সে সৌভাগ্য এখনও হয় নি। আপনাকে তাই কোন সদুপদেশ দিতে পারলুম না। তবে এটুকু জানি, শব্‌নম বানুর প্রসন্ন, অতিশয় সুপ্রসন্ন সম্মতি নিয়েই এই শুভ মুহূর্ত এসেছে। আজ পর্যন্ত কাবুল-কান্দাহার, জলালাবাদ-গজনীর কোন তরুণই সাহস করে শব্‌নম বানুর পাণি কামনা করতে পারে নি। আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আপনি তরুণ সমাজের সুস্মিত অভিনন্দনসহ তাদের গর্বের ধনের সঙ্গে চারিচক্ষু মিলনে যাচ্ছেন। সুদিন এলে আমরা আপনাদের নিয়ে যে নয়া পরব করব তখন দেখতে পাবেন আপনি কারও দিলে এতখানি চোট না দিয়ে শব্‌নম বানুর দিল জয় করেছেন। এ রকম সচরাচর হয় না। শব্‌নম বানু অসাধারণ বলেই এই অসম্ভবটা সম্ভব হল। আবার অভিনন্দন জানাই।'

দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে ছবি আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

যবে থেকে আমাদের এ-বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন থেকে এ ছবিটি কি রকম হতে পারে তার নানা স্বপ্ন আমি সমস্ত দিন ধরে দেখেছি। বরযাত্রায় আসার সময়, বিয়েবাড়ির চাপা কলরব মৃদু গুঞ্জরন, শাদিমজলিসের গম্ভীর নৈস্তব্ধ্যে, এমন কি চাচা-জান যখন তাঁর স্নেহপ্লাবন দিয়ে আমার হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তখনও—তখনও আমি একটার পর একটা ছবি মনে মনে এঁকেছি আর মুছেছি, মুছেছি আর এঁকেছি। কখনও দেখেছি সখীজন পরিবৃতা শব্‌নম বাসরঘরের কলগুঞ্জরন মুখরিত উজ্জ্বলালোকে নববধূর অতিভূষণে জর্জরিতা, আভূমি বিনতা। আর কখনও দেখেছি সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরের একপ্রান্তে আমি জাত-মূর্খের মত

দাঁড়িয়ে ভাবছি—কি'বা বলব, ভাবতেই পারছি নে, কি করা উচিত। হয়তো অনেক কষ্টে এদিক ওদিক হাতড়ে হাতড়ে আসবাবপত্রের ধারাল খোঁচা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কোনও গতিকে শব্‌নমের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়, এমন সময় হঠাৎ ঘরের চারিদিকে জ্বলে উঠল পঞ্চাশটা জোরাল টর্চ। সঙ্গে সঙ্গে অট্টরোল অট্টহাস্য। শব্‌নমের সখীরা চতুর্দিকের দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিলেন এই শুভ মুহূর্তের জন্য। আলো জ্বালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাইয়া গান ধরলে,

'রুটি খায় নি, দাল খায় নি, খায় নি কভু দই,
হাড়-হাভাতে ওই এল রে—খাবে তোরে সই!
মরি, হায় হায় রে!'

কাবুলের বজ্র-বিগলন শীতে আমার মন ঘেমে ঢোল—না, না, ঢোল নয়, জগঝম্প।

সব ছবি ভুল, কুলে তসবির তালগোল পাকিয়ে প্রথমটায় পিকাসোতে পরিবর্তিত হয়ে অন্তর্ধান করল।

বিরাট ঘর। কাবুলের গৃহস্থ বাড়ির চারখানা বৈঠকখানা নিয়ে এই একটা ঘর।

তার সুদূরতম কোণে একটি গোল টেবিল। টেবিলক্লথ ভারী মখমলের—জমে-যাওয়া রক্তের কাল্‌চে লাল রঙের। তার উপরে সেই প্রাচীন যুগের ঘোমটাওলা এক বিরাট রীডিং-ল্যাম্প। সমস্ত ঘর প্রায়ান্ধকার রেখে তার গোল আলো পড়েছে শব্‌নমের মাথার উপর, হাঁটুর উপর, পাদপীঠে রাখা তার ছোট্ট দুটি পায়ের উপর। ঠাণ্ডা, মোলায়েম আলো—আর সেই আলোতে শব্‌নম বাঁ হাতে তুলে ধরে একখানা চটি বই পড়ছে।

শান্ত, নিস্তব্ধ, নির্দ্বন্দ্ব, গ্রন্থিমুক্ত বিশ্রান্তি।

ত্রিভুবনে আর যেন কোনও জনপ্রাণী, কীটপতঙ্গ নেই। শুধু একা শব্‌নম। সে প্রশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করছে তার দয়িতের জন্য। সে আসছে দূর দূরান্ত থেকে—যেখানে তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র গোধূলি লগনের তারাকে পাণ্ডু চুম্বন দিয়ে বাঁশবনের সবুজ নীড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আশ্চর্য! সে আমি! কে বিশ্বাস করবে সে আমি!

পা টিপে টিপে কিছুটা এগুতে না এগুতেই শব্‌নম মাথা তুলে আমার দিকে

তাকালে। যত নিঃশব্দেই আমি এগুই না কেন, তার কান শুনতে পাক আর না-ই পাক, তার সদাজাগ্রত কোটিকর্ণ হৃদয় তো শুনতে পাবেই পাবে।

আমি দ্রুততর গতিতে এগুলুম। আমার হিয়ার বেগের সঙ্গে আমি পেরে উঠি কি করে?

শব্‌নম সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিংহাসনই বটে। সেই কাল্‌চে লালের মখমলে মোড়া, সোনালী কাঁধ হাতলওলা, তার মাঝে মাঝে রয়েল ব্লুর মীনা দিয়ে আঙুরগুচ্ছ আঙুরপাতার নক্‌শা কাটা সুউচ্চ সিংহাসন। বসবার সীট মাটি থেকে আট দশ ইঞ্চি উঁচু হয় কি না হয়, কিন্তু পিছনের হেলান মানুষের মাথা ছাড়িয়ে আরও দু'মাথা উঁচু।

এই প্রথম শব্‌নম আমার সঙ্গে লৌকিকতা করে উঠে দাঁড়ালে।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখমুখ ঠোঁট গাল চিবুক নাসারন্ধ্র কানায় কানায় ভরে তুলে আমার দিকে তৃপ্তি দাক্ষিণ্য আর নর্মসম্ভাষণের মৃদু হাসি হাসলে।

গালের টোল কোন্ অতল গভীরে লীন হয়ে গিয়েছে। সেখানে অন্ধকার। আলো ঢুকতে পারে নি বলে? না, সেখানে কেউ এক ফোঁটা কাজল ঢেলে দিয়েছে বলে?

আজ শব্‌নম সেজেছে।

নববধূকে জবড়জঙ্ করে সাজানোতে একটা গভীর তত্ত্ব রয়েছে। রূপহীনার দৈন্য তখন এমনই চাপা পড়ে যায় যে সহৃদয় লোক ভাবে, 'আহা, একে যদি সরল সহজভাবে সাজানো হয় তবে মিষ্টি দেখাতো; আর সুরূপার বেলাও ভাবে ওই একই কথা—না সাজালে তাকে আরও অনেক বেশি সুন্দর দেখাতো।

শব্‌নমকে সেভাবে সাজানো হয় নি, কিংবা সেভাবে সে নিজেকে সাজাতে দেয় নি।

এ যেন পূর্ণচন্দ্রের দূরে দূরে কয়েকটি তারা ফোটানো হয়েছে—চন্দ্রের গরিমা বাড়ানোর জন্য। এ যেন উৎসব-গৃহের সৌন্দর্যের মাঝখানে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়েছে। শব্‌নমের ভাষায় বলি, বাতাসে বাতাসে পাতা গোলাপ-সৌগন্ধের মাঝখানে বুলবুলের বীথি বৈতালিক।

তার চুলের বিচ্ছুরিত আলোর মাঝখানে থাকে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ রূপালী শাদা-প্রজাপতি। মাথায় অভ্র-আবীর ছড়ানো হয়েছে অশেষ সযত্নে, এক একটি কণা করে—তিন সখী বাসর গোধূলিতে আরম্ভ করে এইমাত্র বোধ হয় কুন্তল প্রসাধন সমাপন করেছেন।

চোখের কোল, আঁখিপল্লব, ধনু-ভুরু এত উজ্জ্বল নীল কেন? এ তো কাজল কিংবা সুর্মার রঙ নয়। এ যে এক নবীন জলুস। তবে কি নীলকান্তমণি চূর্ণ করে কাজলের কাজ করা হয়েছে। তারই শেষ কয়টি কণা চৌলের অতলে ছেড়ে দিয়েছে।

এঁকে বেঁকে নেমে-আসা দুই জুলফের ডগায় আবার সেই নীলমণি-চূর্ণ। একদিকে তুষার শুভ্র কর্ণশঙ্খ, অন্যদিকে রক্ত কপোল।

সে কপোল এতই লাল যে আজ যেন কোনও প্রসাধন প্রক্রিয়া দ্বারা সেটাকে ফিকে করা হয়েছে। বদখশানের রুবি চূর্ণ দিয়ে? তা হলে ঠোঁট দুটিকে টসটসে রসালো ফেটে-যায়-যায় আঙুরের মত নবর মধুর করে লালের এ-আভা আনা হল কিসের চূর্ণ দিয়ে? এ রঙ তো আমি আমার দেশের বিম্ববিটপীর উচ্চতম শাখাতে পল্লবিতানের অন্তরালে দেখেছি—যেখানে মানুষের কলুষদৃষ্টি, দুষ্ট বালকের স্থূল হস্ত পৌঁছয় না।

ওষ্ঠ পূর্বভাগে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্রের নিচে সামান্য, অতি সামান্য একটি নীলাঞ্জন রেখা। ভরা ভাদ্রের গোধূলি বেলা আকাশের বায়ু কোণে পুঞ্জে পুঞ্জে জমে ওঠা শ্যামাম্বুদে আমি দেখেছি এই রঙ। গভীর রহস্যে ভরা এই রঙ। তারই উপরে স্ফুরিত হচ্ছে শবনমের দুটি নাসারন্ধ্র। নিচে অতি ক্ষীণ কম্প্রমান স্ফুরণ লেগেছে তার ওষ্ঠাধরে।

এই প্রথম দেখলুম তার চোখ দুটি। এ দুটি থেকে আগুনের ফুলকি বেরুতে দেখেছি, এ আঁখি দুটিতে আচম্বিতে জল ভরে ফেটে পড়তে দেখেছি, কিন্তু এ চোখ দুটিকে আমি কখনও দেখি নি। আজ এই প্রাচীন দিনের ল্যাম্প আমাদের মিলনের শুভলগ্নে ঠিক সেই আলোটি জ্বেলেছে যার দাক্ষিণ্যে আমি শবনমের চোখ দুটি দেখতে পেলুম।

সবুজ না নীল? নীল না সবুজ? অতৃপ্ত নয়নে আমি সে দুটি আঁখির গভীরতম অতলে অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম তবু বুঝতে পারলুম না সবুজ না নীল। হাঁ, হাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হাঁ, দেখেছি বটে এই রঙ আসামের হাফলঙের কাছে। বড় বড় পাথরের মাঝখানে গিরিপ্রস্রবণ কুণ্ডের স্থির নীলজলের অতলে সবুজ শ্যাওলা। সেদিন ঠিক করতে পারি নি, কি রঙ দেখলুম, নীল না সবুজ—আজ বুঝলুম দুয়ের সংমিশ্রণে এমন এক কল্পলোকের রঙ প্রভাসিত হয় যে, সে রঙ ইহভূমের আর্টিস্টের পেলেটে তো নেই-ই, সৃষ্টিকর্তা যে আকাশে রঙ-বেরঙের তুলি বোলান তাতেও নেই।

শব্‌নমের স্মিতহাস্য ফুরোতে চায় না। কী মধুর হাসি!

কাবুলের মেয়েরা কি বিয়ের রাতে গয়না পরে না। শব্‌নম পরেছে সামান্য দু'তিনটি। তার সেই বিরাট খোঁপা জড়িয়ে একটি মোতির জাল। ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদামের উপর স্তরে স্তরে, পাকে পাকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমানীকণা ঝিলিমিলি মেলা লাগিয়েছে।

দু' কানে দুটি মুক্তোলতা ঝুলছে আর তার শেষ প্রান্তে একটি করে রক্তমণি—রুবি। শুভ্র মরাল কণ্ঠের বরফের উপর যেন দু' ফোঁটা সদ্যঝরা তাজা রক্ত পড়েছে। এই, এখ্‌খুনি বুঝি রক্তের ফোঁটা দুটি ছড়াতে চুবসাতে আরম্ভ করবে।

কাবুলী কুর্তা গলাবন্ধ হয়—বিশেষ করে মেয়েদের। আজ দেখি, গলা অনেকখানি নিচে ঘুরিয়ে কাটা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটি মোতির মালা। তার শেষ প্রান্তে কি, দেখতে পেলুম না। সেটি জামার ভিতরে। সে কী সৌভাগ্যবান। এই এতদিনে বুঝতে পারলুম কালিদাস কোন্ দুঃখে বলেছিলেন, 'হে সৌভাগ্যবান্ মুক্তা, তুমি একবার মাত্র লৌহশলাকায় বিদ্ধ হয়ে তার পর থেকেই প্রিয়ার বক্ষদেশে বিরাজ করছ; আমি মন্দভাগ্য শতবার বিরহ শলাকায় সছিদ্র হয়েও সেখানে স্থান পাই নে।'

শব্‌নমের পরনে সাটিনের শিলওয়ার, কুর্তার রঙ ফিকে লাইলেক, ওড়না কচি কলা-পাতা রঙের, এবং দুধে-আলতা সংমিশ্রণের মত সেই কচি কলাপাতা রঙের সঙ্গে দুধ মেশানো। ইতস্তত রূপালী জরির চুমকি। কলাবনে জোনাকির দেয়ালি।

শব্‌নমের স্মিতহাস্য অন্তহীন। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি।

হাসতে হাসতে আমাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটের উপর তার স্ফুরিতাধরোষ্ঠ চেপে ধরে যেন অতৃপ্ত আবেগে আমার পাণ্ডুর অধরের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিতে লাগল।

আমি মোহ্যমান, কম্প্রবক্ষ, বেপথুমান। আমার দৈহিক স্পর্শকাতরতা অস্তমিত। আমার সর্বসত্তা শব্‌নমে বিলীন।

কোন্ দিগন্তে সে আমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কোন্ তারা নির্ঝরের ছায়াপথে সে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, কোন্ সপ্তর্ষির তারাজাল ছিন্ন করে কোন্ কোন্ লোকে নিয়ে গিয়েছিল জানি নে। অচৈতন্য অবস্থায় দেখি, আমি শব্‌নমের সিংহাসনে বসে আছি, সে আমার কোলে আড়াআড়ি হয়ে বসে, তার বুক আমার বুকের উপর রেখে, ডান হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে, বাঁ হাত দিয়ে আমার গাল

বুলোতে বুলোতে, তার মুখ আমার কানের উপর চেপে ধরে শুধোচ্ছে, ‘খুশি ? খুশি ? খুশি ? খু…???’

আমি আলিঙ্গন ঘনতর করে বলেছিলুম, ‘আমি তোমার গোলাম। আমাকে তোমার সেবার কাজ দাও।’

শুধিয়ে চলেছে, ‘খুশি ? খুশি ? খুশি—?’

আমি বললুম, ‘আল্লা সাক্ষী, আমি প্রথম যেদিন তোমাকে ভালবেসেছি সেদিন থেকে শত বিরহ-বেদনার পিছনেও খুশি। তুমি জান না, তুমি আছ, এ:তেই আমি খুশি। প্রথম দিনের প্রথম খুশির প্রথম নবীনতা বারে বারে ফিরে আসছে।’

শব্‌নম গুনগুন করে ফরাসীতে গাইলে,

‘“করেছি আবিষ্কার
তোমারে ভালবাসিবার
প্রথম যেমন বেসেছিনু ভালো, সেই বাসি প্রতিবার।”

নয় কি ?’

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বললে, ‘দাঁড়াও ! আলো জ্বালি।’

আমার কথায় কান না দিয়ে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণ থেকে নিয়ে এল আঁকশি। তার ডগার ন্যাকড়ায় কি মাখানো জানি নে। শব্‌নম আনাড়ী হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটার কাছে নিতেই দপ করে জ্ব'লে উঠল। সেই জ্বলন্ত আঁকশি দিয়ে সে ঝাড়বাতির অগুনতি মোমবাতি জ্বালালে। ঘরের দেয়ালে দামী ফরাসী সিল্কের ওয়ালপেপারে সে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে।

আমার পায়ের কাছে পাদপীঠে বসে বললে, ‘তুমি নূতন রাজা এসেছ, তোমাকে বরণ করার জন্য সব কটা আলো জ্বালাতে হয়। যে বেশ পরেছ, তার জন্য এ আলোর প্রয়োজন। কী সুন্দরই না তোমাকে—’

‘থাক্।’

‘চুপ !—দেখাচ্ছে। আমার ওস্তাদের মেয়ের রুচি আছে।’

আমি বললুম, ‘তোমাদের কবি হাফিজই তো বলেছেন

“বলে দাও বাতি না-জ্বালায় আজি, আমাদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখ চন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা” ’ ( সত্যেন দত্ত )

শব্‌নম বললে, ‘ও: হাফিজ। তিনি তো বলেছেন ‘আজ বাতি জ্বালিয়ো না’ —অর্থাৎ তার পরব মাত্র এক দিনের তরে। আমাদের পরব হবে প্রতি রাত্রি।

তাই আজ রাত্রের আনুষ্ঠানিক আলো মাত্র একবারের তরে জ্বালিয়ে দিলুম। ভয় করো না, তাও নিবিয়ে দিচ্ছি এখ্খুনি।'

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'টেবিল ল্যাম্পের ওই ঠাণ্ডা আলোতে তোমাকে কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল কি বলব? মাথার চুল থেকে খালি পায়ের নখের ডগাটি পর্যন্ত কী এক অদ্ভুত রহস্যময় অথচ কী এক অনাবিল শান্তিতে ভরপুর হয়ে বিভাসিত হচ্ছিল, কি করে বোঝাই? আচ্ছা, মোজা-ছাড়া পায়ে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না—বাইরে যা শীত।'

অবাক হয়ে বললে, 'বারে! তুমি যে বলেছ আমার খালি পা দেখতে তোমার ভালো লাগে।'

আমি আপসোস করে বললুম, 'তোমার কতটুকু দেখতে পাই?'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'চোপ। দুষ্টুমি করো না। চোখ ঝলসে যাবে। সেমেলে যখন জুপিটারের দেহরূপ দেখতে চেয়েছিলেন তখন তার কি হয়েছিল জান না?'

আমি শুধালুম, 'কি হয়েছিল?'

'আলোতে পোকা পড়লে যেরকম ফট্ করে ফেটে যায়—তাই হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষই জুপিটার। তার দেবরূপ উন্মোচন করা বিপজ্জনক। জান, তাকাতে গিয়ে আমারই মাঝে মাঝে ভয় হয়।'

ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে কোথা থেকে সিগারেট এনে ঠোঁটে চেপে, আনাড়ী ধরনের দেশলাই ধরিয়ে কাশতে কাশতে আমায় দিয়ে বললে, 'ভালো না লাগলে ফেলে দিয়ো।'

এ দুর্দিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার মিশরী সিগারেট পেল কোথায়?

বললে, 'জানেমন্ তিন মাস অন্তর অন্তর তিন তিন হাজার করে মিশর থেকে আনায়। আমাকে ধরাবার চেষ্টা করেছিল—পারে নি। কিন্তু কেউ খেলে সিগারেটের গন্ধ আমার ভালোই লাগে। ন্যাকরা করে ওয়াক্, থুঃ বলতে পারি নে।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ। এই সুপার স্পেশাল সিগারেট যিনি খান তাঁর জন্যে তুমি এনেছিলে আমার সেই ওঁচা সিগারেট।'

বললে, 'আমার বন্ধুর সিগারেট। জানেমন্ দুটো ধরিয়ে একটা আমাকে দিয়ে বললে, এ সিগারেট খেতে তো তোর আপত্তি হবে না।'

আমি শঙ্কিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কি বলেছিলে?'

'নির্ভয়ে বলেছিলুম, "শব্-সুখ্-তে !" পোড়ার ঠোঁটো, পোড়ার মুখো, যা খুশি বলতে পার। ওই পোড়ার সিগারেট খেয়ে খেয়ে জানেমন্ তার ঠোঁট মভ্ করে ফেলেছে, দেখ নি ?'

আমি শুধালুম, 'তন্ময় হয়ে কি পড়ছিলে ? "গুড্ বাই টু ক্রীডম্" ?'

বললে, 'সে কি ? বরঞ্চ তোমার লীলা খেলা বন্ধ হল। কিন্তু আগে বলি, তোমার নিশ্চয় হাসি পাচ্ছে, একই কনেকে দু' দু' বার বিয়ে করছ বলে ? আমারও পাচ্ছিল।—হঠাৎ মনে পড়ল, তোমাকে বলেছিলুম, তুমি দ্বিচারী—তুমি বাস্তবে আমাকে আদর কর, আর স্বপ্নে আরেক জনকে। আল্লাতালা তাই একই শব্নমের সঙ্গে তোমার দু' দু'বার বিয়ে দিয়ে তোমাকে দ্বিচারী বদনাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্বপ্নের শব্নম আর বাস্তবের হিমিকা এক হয়ে গেল। না ?'

আমি বললুম, 'অতি সূক্ষ্ম যুক্তিজাল। কিংবা বলব হৃদয়ের ন্যায়-শাস্ত্র—নব্য 'নব্য-ন্যায়'। তোমাকে তো বলেছি,হৃদয়ের যুক্তি তর্কশাস্ত্রের বিধিবিধানের অনুশাসন মানে না। আকাশের জল আর চোখের জল একই যুক্তি কারণে ঝরে না।'

আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এ কথাটা তুমি আমাকে ককখনো বল নি। এ ভারী নূতন কথা।'

আমি বললুম, 'হবেও বা, কারণ কোন্‌টা আমি তোমাকে বলি আর কোন্‌টা নিজেকে বলি এ দুটোতে আমার আকছারই ঘুলিয়ে যায়।'

আমার হাঁটুর উপর চিবুক রেখে শব্নম অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম, শব্নম কি গিরগিটি ? সে যেমন দেহের রঙ বদলায় সেই রকম শব্নম চোখের রঙ ঘড়ি ঘড়ি বদলাতে পারে। আলোর ফেরফারে তো এতবেশি অদলবদল হওয়াব কথা নয়। এখন তো দেখছি, শ্যাওলার ঘন সবুজ, অথচ এই অল্প কিছুক্ষণ হল দেখেছি একেবারে স্বচ্ছ নীল। তবে কি ওব হৃদয়াবেগ, চিন্তাধারাব সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের রঙও বদলায়। স্থির করলুম, লক্ষ্য করে দেখতে হবে।

আমি মাথা নিচু করে, দু'হাত দিয়ে তার মাথা তুলে, তার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখলুম। আমার চোখ দুটি তার চোখের অতি কাছে এসে নিবিড় দৃষ্টিতে তার চোখের অতলে পৌঁছে গিয়েছে। শব্নম অজানা আবেশে চোখ দুটি বন্ধ করলে।

কতক্ষণ চলে গেল কে জানে ? বুকের ঘড়ি যেন প্রতি মুহূর্তে প্রহরের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। হিমিকাকে এই আমার প্রথম চুম্বন।

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় একশ' বছর পরে, শব্‌নম তার ঠোঁট যতখানি সামান্যতম সরালে কথা বলা যায় সেটুকু সরিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'চুমো খাওয়া তোমাকেই সাজে। সেই নদীপাড়ে প্রথম হার মানার পর আমি মনস্থির করেছিলুম, সব জিনিস আমি দেব, আর তুমি নেবে। চুমো খাব আমি, আলিঙ্গন করব আমি, আর তোমাকে যে তোমার ছেলেমেয়ে দেব আমি, সে তো জানা কথা। এখন দেখছি, তা হয় না। চুমো খাওয়া পুরুষেই সাজে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি যদি বলি, তুমি যখন আমাকে চুমো খাও তখন আমার কাছে সেটা অনন্তগুণ মধুময় বলে মনে হয়?'

'বাঁচালে'—বলে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চাপ দিলে নিবিড় আবেশে।

জানি নে, কতক্ষণ, বহুক্ষণ পরে দেখি, শব্‌নম আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। বললে, 'আমার খোঁপাটা খুলে দাও।'

তার পর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে আবার উড়ে গিয়ে ফিরে এল ফিরোজা রঙের চীনা কাচের একটি ডিকেণ্টার হাতে করে। কাচের ফিকে রঙের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কড়া লালের বেগনী আভা।

বললে, 'পার্দনে মোয়া, মঁশেয়্—মাপ কর দোস্ত্—একদম ভুলে গিয়েছিলুম, তুমি আমার গালের টোল ভরে শীরাজী খেতে চেয়েছিলে।'

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে বললুম, 'করেছ কি? এটা যোগাড় করতে গিয়ে জানাজানি হয় নি?'

শব্‌নম হেসে ফেটে আটখানা। বললে, 'তুমি কি ভেবেছ, তুমি মোল্লাবাড়িতে বিয়ে করেছ? রাজা তিমুর থেকে আরম্ভ করে বাবর, হুমায়ুন—কে শরাব খেয়ে টং হয় নি বল তো? এ বাড়িতে আমার ঠাকুর্দা পর্যন্ত। তাঁর জমানো মাল এখনও নিচে যা আছে তা দিয়ে তিন পুরুষ চলবে।'

আমি বললুম, 'আমার দরকার নেই। আমি হাফিজের চেলা। তিনি বলেছেন,

"শর্করা মিঠা, আমারে ব'ল না, হিমি! আমি তাহা জানি"—' সঙ্গে সঙ্গে শব্‌নম গেয়ে উঠল,

"তবু সবচেয়ে, ভালবাসি ওই, মধুর অধরখানি।"

আমি বললুম, 'তুমি যে এত আলো জালিয়েছ তারও দরকার নেই:—

"বলে দাও, বাতি না জালায় আজি, আমাদের নাহি সীমা"—'

সেই আঁকশির উল্টো দিক দিয়ে আলো নেবাতে নেবাতে গুনগুন করে শব্‌নম বার বার গাইলে,

"আজ প্রেয়সীর মুখচন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা।"

তারপর ঘরের কোণ থেকে সেতার এনে আমার কোলের উপর বসে তার খোলা চুল আমার বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে সমস্ত গজলটি বার বার অনেকবার গাইলে। তন্ময় হয়ে শেষের দুটি ছত্র অনেকক্ষণ ধরে কখনও গুনগুন করে, কখনও বেশ একটু গলা চড়িয়ে গাইলে,

"প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফিজ! ছেড় না অধর লাল
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব কাল!"

আমি একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'তোমার এত গুণ! তোমাকে আমি কোথায় রাখি। সুন্দর ইউসুফ শুধু যে সে-যুগের সব চেয়ে সুপুরুষ ছিলেন তাই নয়, তাঁর মত দূরদৃষ্টি নিয়ে জন্মেছিল অল্প লোকই, এবং সব চেয়ে বড় ছিল তাঁর চরিত্রবল। তাই তাঁর মা'র কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিলে, সেই সুদূর মিশরের রাজ-সিংহাসনে।'

শব্‌নম বললে, 'হ্যাঁ। আর তাই মাতৃভূমি কিনানের স্মরণে,

"মিশর দেশের সিংহাসনেতে বসিয়া ইসুফ্‌ রাজা
কহিত, হায়রে! এর চেয়ে ভাল কিনানে ভিখারী সাজা।"'

দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল দক্ষিণের দেয়ালের দিকে। থিয়েটারের পরদার মত একখানা মখমলের পরদা ছিল ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঝোলানো। একটানে সেটা সরাতেই সামনের খোলা পৃথিবী তার অসীম সৌন্দর্য নিয়ে আমাকে একেবারে বাক্যহারা করে দিল।

দু'খানা চেয়ার পাশাপাশি রেখে আমায় শুধালে, 'শীত-করছে?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই পুস্তিনের একখানা ফারকোট দু'জনার জানু থেকে পা অবধি জড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

এ সৌন্দর্য শুধু শীতের দেশেই সম্ভবে।

সমুদ্রের জল আর বেলাভূমির বালুর উপর পূর্ণিমার আলো-প্রতিফলিত হয়ে যে জ্যোৎস্না চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এখানে যেন তারই পৌনঃপুনিক দশমিক—এখানে শত শত যোজন-জোড়া নিরন্ধ্র সর্বব্যাপী ধবলতম ধবল বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে এক পক্ষের পূর্ণচন্দ্র যেন শত পক্ষের জ্যোতিঃ আহরণ করেছেন, হিমানী-যোগিনী উমারাণীর এক বদন-ইন্দু-চৌষট্টি যোগিনীর মুখেন্দীবর দীপান্বিতায় রূপান্তরিত হচ্ছেন।

দূরে পাগমান পর্বতের সানুদেশ, চূড়া—তারও দূর দিগন্তে হিন্দুকুশের অর্ধ-

গগনচুম্বী শিখর, কাছে শিশির ঋতুর নিদ্রাবিজড়িত বিসর্পিল কাবুল নদী, আরও কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা, পল্লবহীন নগ্ন বৃক্ষ, হৃতপত্র শাখা-প্রশাখা, উদ্বাহু মিনার-মিনারিকা, বিপরীতার্ধভিম্ব গম্বুজ, গোরস্তানের শায়িত সারি সারি কবরের নামলাঞ্ছন-প্রস্তর-ফলক—সর্ব সৌন্দর্য সর্ব বিভীষিকা, সর্ব সর্বাধিকারীর অলঙ্কার, সর্ব সর্বহারার দৈন্য, ভদ্রাভদ্র সকলের উপর নির্বিচারে প্রসারিত হয়েছে তুষারের আস্তরণ। আকাশের মা-জননী যেন এক বিরাট শুভ্র কম্বল দিয়ে তাঁর একান্নপরিবারের ধনী দরিদ্র রাজা-প্রজা তাঁর সর্বসন্তানসন্ততিকে আবরিত করে তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

কী নৈঃশব্দ্য, নৈস্তব্ধ্য! রাজপথের দ্বিতীয়যামের মন্ত্যানুরাগী, সখা, কদ্রূপ সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই একই প্রিয়ার গভীর আলিঙ্গন-সোহাগে সুষুপ্ত—সে প্রিয়া গৃহকোণের তপ্ত শয্যা। রাজপ্রাসাদের দুর্গ প্রাকারের প্রহর ডিণ্ডিম নিস্তব্ধ। কল্য ঊষার মধুর-কণ্ঠ মুআজ্জিন অদ্য নিশার নিদ্রাস্তরণে আকণ্ঠ বিলীন।

গম্ভীর প্রহেলিকাময় এ দৃশ্য। কে বলে একা, একটিমাত্র রঙ দিয়ে ছবি আঁকা যায় না? কে বলে একা একমাত্র সা স্বর দিয়ে গান গাওয়া যায় না? কে বলে একা একটি ফুল ভুবন পুলকিত করতে পারে না? এই সর্বব্যাপী শুভ্রতা-সৌরভে যে সঙ্গীত মধুরিমা আছে সে তো মানুষের সর্বচৈতন্যে প্রবেশ করে তাকেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মদেহ করে দেয়। সৃষ্টিরহস্য তখন তার কাছে আর প্রহেলিকা থাকে না—সে তখন তারই অংশাবতার। আমার হৃদয় তখন সে সৌন্দর্যে অবগাহন করতে করতে হিন্দুকুশ পেরিয়ে আমু দরিয়া তাশকন্দ ছাড়িয়ে বৈকালী হ্রদের কূলে কূলে সন্তরণ করছে।

আমাদের মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র। এতক্ষণে আমার চোখ থেকে টেবিল ল্যাম্পের শেস জ্যোতিঃকণার রেশ কেটে গিয়েছে। দেখি, প্রখর চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে' শব্‌নমের সিত ভালে, স্ফুরিত নাসিকারন্ধ্রে, ঈষতার্দ্র ওষ্ঠাধরে, সমুন্নত কঞ্চুলিকা শিখরাগ্রে। বেলাতটের নীলাভ ক্ষুদ্রাম্বুর মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্তব্ধ্য। গিরিকুমারীর মরালগ্রীবা, হিন্দুকুশ গিরির মতই ধবল শুভ্র। এতদিনে বুঝতে পারলুম অক্ষতযোনি গৌরীকে কেন গিরিরাজতনয়া বলে কল্পনা করা হয়েছে।

পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'হে কম্‌রুল কওকাব্! এই কম্‌রুন্নিসাকে আশীর্বাদ কর। হে ইন্দুবর—না, না,—হে ইন্দুমৌলি, তুমি একদা গিরিকুমারীর শুভ্রশুচিতার চরম মূল্য দিয়েছিলে। আজ এই কাবুলগিরিকন্যাকে

তুমি তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দেখাও। আমাদের বাতায়ন প্রান্তে এসে তোমার ইন্দীবর নয়ন উন্মীলন করে দেখ, এই কুমারীর কটিতট তোমারই মত, হে নটরাজ, তোমারই ডমরুকটির মত ক্ষীণচক্র—

"হেন ক্ষীণ কটি এ তিন ভুবনে নটরাজে শুধু রাজে
এ হিমা প্রতিমা আমারে বরিয়া নাহি যেন মরে লাজে।" '

শব্‌নম আবার সেই প্রথম দর্শনের দীর্ঘ স্মিতহাস্য দিয়ে ঘরের ভিতর চন্দ্রালোক এনে শুধালে, 'আমার নূর-ই-চশ্‌ম্—'আঁখির আভা'—কি ভাবছ?'

আমি বললুম, 'গিরিরাজ হিন্দুকুশকে বলছিলুম, তোমার মঙ্গল কামনা করতে।'

'সে কি বুৎ-পরস্তী—প্রতিমাপুজার শামিল নয়?'

'আলবত নয়। আমি যখন আমার বন্ধুকে বলি, আমার মঙ্গল কামনা কর, তখন কি আমি তার পুজো করি? আমি যখন গিয়াস-উদ্-দীন চিরাগ-দিল্লির কবরে গিয়ে বলি, "হে খাজা, তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর," তখন কি আমি তাকে খদা বানাই? অজ্ঞজন যখন মনে করে ওই গোরের কোনো অলৌকিক শক্তি আছে, অর্থাৎ গোরেই আল্লার অংশ বিরাজ করছে তখনই হয় বুৎ-পরস্তী।'

আপন মনে একটু হেসে নিয়ে বললুম, 'আর এই বুৎ-পরস্তী আরম্ভ হয় তোমাদের দেশেই প্রথম। আজ যে অঞ্চলের নাম জালালাবাদ তারই নাম সংস্কৃতে গান্ধার—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। মনে পড়েছে। এখনও জালালাবাদের বকরী-ছাগলকে কাবুল-বাজারে বলে বুজ্-ই-গান্ধারী। তারপর বল।'

'আলেকজাণ্ডারের গ্রীক সৈন্যরা যখন সেখানে থাকার ফলে বৌদ্ধ হয়ে গেল তখন তারাই সর্বপ্রথম গ্রীক দেব দেবীর অনুকরণে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে তাঁর পুজো করতে লাগল—ভারতবর্ষের আর সর্বত্র তখনও বুদ্ধের মূর্তি গড়া কড়া মানা, এমন কি বুদ্ধকে অলৌকিক শক্তির আধার রূপে ধারণা করে তাঁকে আল্লার আসনে বসানো বৌদ্ধদের কল্পনার বাইরে। সেই গ্রীক বৌদ্ধমূর্তি হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়বার পর, পরবর্তী যুগে সেই আর্টের নাম হল গান্ধার আর্ট।'

ভারি খুশি হয়ে বললে, 'ওঃ! আমরা মহাজন।'

আমি আরও খুশি হয়ে বললুম, 'বলে! এখনও কাবুলীরা আমাদের টাকা ধার দেয়।'

গম্ভীর হয়ে বললে, 'সেকথা থাক।' আরেকদিন এ কথা উঠলে পর শব্‌নম

বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ভারত আফগান উভয় সরকারে মিলে এ বদনামি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

'আর তোমাদের মেয়ে গান্ধারী আমাদের ছেলে ধৃতরাষ্ট্রকে বিয়ে করেছিল। তাদের হয়েছিল একশ'টা ছেলে আর একটি মেয়ে।'

'ক'টি বললে ?

'একশ' এক।'

আমার হাঁটুতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'হায়, হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি স্থির করেছিলুম, আমিই তোমাকে একশ'টা আণ্ডা-বাচ্চা দেব। এখন কি হবে ?'

আমি আনমনে বাঁ হাত তার গ্রীবার উপর রেখে চুলে পাক মেরে ডান হাতে ডগাগুলো পাকের ভিতর ঢুকিয়ে চাপ দিতেই খাসা এলো-খোঁপা হয়ে গেল।

শব্‌নম আপন জীবন মরণ সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে, ফার্ কোটের ঢাকনা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুধালে, 'তিনসত্যি করে বল, তুমি ক-জন মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে দিয়ে এ রকম হাত পাকিয়েছ ?'

আমি অপাপবিদ্ধ স্বরে বললুম, 'মায়ের হাত জোড়া থাকলে আমাকে খোঁপাটা শক্ত করে দিতে বলতেন।'

আস্তে আস্তে ফের পাশে বসে বললে, 'যাক্! তোমার উপস্থিত বুদ্ধি আছে।'

অর্থাৎ বিশ্বাস করল কি না তার ইস্‌পার-উস্‌পার হল না।

আমি বললুম, 'তুমি সেদিন আমার হাত টিপতে টিপতে বললে, আমার হাত বড্ড নরম। আমি সরল ইমানদার মানুষ—কই আমি তো শুধাই নি, তুমি ক-জন পুরুষের হাত টিপে টিপে এ তত্ত্বটা আবিষ্কার করলে ?'

'বিস্তর। আব্বা, জানেমন্—এ যাবৎ। টিপে দেব আরও বিস্তর। তোমার আব্বা—বল তো ভাই, তোমার জানেমন্ ক'জন ?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে, 'ছিঃ। শওহরের সঙ্গে প্রথম রাত্রে তর্ক করতে নেই। তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না, কি বই পড়ছি, যখন ঘরে ঢুকলে ? আমার এক সখী বইখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিলেন। "শব্-ই-জুফ্‌ফাফ্" —"বাসররাত্রি"। আল্লা-রসুলের দোহাই দিয়ে বিস্তর ভালো কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ বইয়ের লেখক একটা উপদেশ দিয়েছে পঞ্চাশ বার—"শওহরের ভালো মন্দ বিচার করতে যেয়ো না। তিনি আল্লার দেওয়া উপহার।" '

আমি পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, 'এ লেখক শতায়ু হন, সহস্রায়ু হন। আমি নিশ্চিন্ত হলুম—কারণ আমি—'

বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি একটু চুপ কর তো। আমি তোমাকে যে-কথা বলবার জন্য জানলার কাছে নিয়ে এসেছিলুম সেইটের আখেরী সমাধান করতে চাই —এ নিয়ে যেন আর কোনোদিন কোনো বাক্-বিতণ্ডা না হয়।'

আমি সত্যই ভয় পেয়ে বললুম, 'আমি যে ভয় পাচ্ছি, হিমিকা।'

'আবার! শোনো। ওই যে পূর্ণচন্দ্র তাকে সাক্ষী রেখে বলছি,—'

আমি জুলিয়েটের মত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না, না, ওকে না। বরঞ্চ তুমি ফজরের আজানের পূর্বেকার শব্‌নম হিমিকার নাম করে—'

'তা হলে তোমার প্রিয় গিরিরাজ হিন্দুকুশের উপর যে চির হিমিকা বিরাজ করছে, প্রচণ্ডতম নিদাঘেও যার ক্ষয়ক্ষতি হয় না—তাকে সামনে রেখে বলছি, তার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আত্মাবমাননা কেরো না, নিজেকে লঘু করে দেখো না। কুমারী কন্যা যে রকম প্রহরের পর প্রহর ধরে বছরের পর বছর আপন দয়িতের স্বপ্ন দেখে, মাতা যে রকম প্রথম গর্ভের কণিকাটিকে সোহাগ-কল্পনায় প্রতিদিন রক্তমাংস দিয়ে গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি আমি তোমাকে তৈরি করেছি, সেই-দিন আমি প্রথম বুঝলুম, আমি অসম্পূর্ণ, আমি নিদ্রিতা শাহ্‌জাদী, আমি অন্ধ প্রদীপ, আমার দয়িত রাজপুত্র দূরদূরান্ত আমার প্রতীক্ষা-দিনান্তের ওপার থেকে এসে আমাকে সঞ্জীবিত করবে, অশ্রুজল সিঞ্চন করে করে আমি যে প্রেমের বল্লরী বাড়িয়ে তুলেছি, তারই করুণ করস্পর্শে পুষ্পে পুষ্পে মঞ্জরিত হবে সে একদিন—আকাশ-কুসুম চয়ন করে করে রচেছি তার জন্য আমার শব্-ই-জুফ্‌ফাফের ফুলশয্যা, প্রার্থনা করেছি, সে রাত্রে যেন পূর্ণচন্দ্র গিরিশিখরের মুকুটরূপে আকাশে উদয় হয়। সূর্যের প্রেম পেয়ে সে হয় ভাস্বর, আমার অন্ধবদনও তেমনি জ্যোতির্ময় হবে আমার বঁধুর ওষ্ঠাধরের সামান্যতম ছোঁয়াচ লেগে।

'তাই যখন তোমাকে প্রথম দেখলুম তখন আপন চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি।

'আমি আমার হৃদয়ে ঝাপসা ঝাপসা যে স্কেচ এতদিন ধরে এঁকেছিলুম এ যেন হঠাৎ ভাস্করের হাতে পরিপূর্ণ নির্মিত মূর্তি হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চিন্ময় মৃদু সৌরভ যেন মৃন্ময় নিকুঞ্জবনের কুসুমদামে রূপান্তরিত হল।

'টেনিস কোর্টে তাই অত সহজে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছিলুম কিন্তু সমস্তক্ষণই ভাবছিলুম অন্য কথা—

'মৃন্ময় চিন্ময় হয় সে আমি জানি। কি যেন এক ফলের কয়েক ফোঁটা রসকে শুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে করা হল ধুঁয়ো। তারই আড়াই পাক মগজের সেলকে আলতো আলতো ছুঁতে না ছুঁতেই পথের অন্ধ ভিখারী দেখে, সে রাজবেশ পরে শুয়ে আছে বেহেশ্‌তের হুরীর কোলে মাথা দিয়ে। প্রণয়পীড়ায় ব্যথিত আতুর ক্রন্দসী-প্রেয়সী হুরীরানী তারই দিকে তাকিয়ে আছে, করুণ নয়নে, পথের ভিখারীর মত, যেন অভাগিনীর প্রেম-নিবেদন পদদলিত না হয়।

'অতদূর যাই কেন, আর এ তো নেশার কথা।

'একটি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ কালো তিল। শীরাজবাসিনী তুর্কী রমণী সাকীর গালে সেইটি দেখে হাফিজ তন্মুহূর্তেই তার বদলে সমরকন্দ্‌ আর বুখারা শহর বিলিয়ে দিয়ে ফকীর হয়ে গোরস্তানে গিয়ে বসে রইলেন।

'কিন্তু চিন্ময় মৃন্ময় হয় কি করে?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি। পরে বুঝেছি, আরও ভালো করে, মর্মান্তিকরূপে—কান্দাহারে। আমার হৃদয়-বেদনা তো সম্পূর্ণ চিন্ময়। তারই পেয়ালা যখন ভরে যায় তখন সে উপচে পড়ে আঁখি-বারিরূপে। তুমি সুন্দর বলেছ, "আকাশের জল আর চোখের জল একই কারণে ঝরে না"; আমি তাতে যোগ দিলুম—তাদের উপাদানও সম্পূর্ণ আলাদা, একটা মৃন্ময় আরেকটা চিন্ময়, একটা বাঙ্ময়—সারা আকাশ মুখর করে তোলে, আরেকটা নৈস্তব্ধ্যে বিরাজ করে সর্ব মনময়।'

আমি স্থির করেছিলুম, কিছু বলব না। শব্‌নমের আত্মপ্রকাশের আকুবাকু আমার স্পর্শকাতরতাকে অভিভূত করে দিলে। আস্তে আস্তে বললুম, 'আমাদের এক কবি বলেছেন, তুমি আমার প্রিয়, কারণ "আমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির"।'

বললে, 'সুন্দর বলেছেন। কিন্তু আজ আমি কবিতার ওপারে।

'বিশ্বাস করবে না, ডান্‌স্‌ হলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তোমাকে ভালো করে না দেখে হোটেলের বেয়ারা ভেবে যখন হুকুম দিয়েছিলুম, গাড়ি আনতে, তখনও ভেবেছিলুম এ কি রকম বেয়ারা—এর তো বেয়ারার বেয়ারিঙ নয়—ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আজ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছি, যত বর্ণনা পড়েছি, যত ছবি দেখেছি এর বেয়ারিঙ তো তাদের একটার সঙ্গেও মিলছে না। তারপর কে যেন আমার বুকের ভিতরে ছবির খাতা মোচড় মেরে মেরে পাতার পর পাতা খুলে যেতে লাগল—তাতে ব্যথা—কিন্তু কী আনন্দ—এক এক বার তোমার দিকে তাকিয়ে দেখি আর ছবির দিকে তাকাই—কী অদ্ভুত—হুবহু মিলে যাচ্ছে। পথে

যেতে যেতে, তোমার বাহুতে যখন আমার বাহু ঠেকল, খেলার জায়গায়, নদী পাড়ে, তোমার ঘরে—এখনও দেখেই যাচ্ছি, দেখেই যাচ্ছি, এ দেখা আমার কখনঃ ফুরবে না। যেমন যেমন পাতা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে আরও নঃ নয়া তসবীর আঁকা হয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ সে হাঁটু গেড়ে আমার দুই জানু আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে কাতর কঃ বললে, 'ওগো, তুমি কেন ভাব, তুমি অতি সাধারণ জন? তোমার ওই একটিমাঃ জিনিসই আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় এনে আমার বুকের বরফ ধুনরীর মত তুলে পেঁজা করে দেয়। আমার অসহ্য কষ্ট হয়। তুমি কেন আমার দিকে আতুরে মত তাকাও, তুমি কেন তোমার যা হক্ক তার কণাটুকু পেয়েও ভিখারীর মত গদ্‌গ হও? তুমি কেন বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হতে না হতেই সদম্ভে কাঁচি এনে আমা জুল্‌ফ কেটে দাও না, তুমি কেন আমার মুখের বসন দু' হাত দিয়ে টুকরো টুকরে করে ছিঁড়ে ফেল না—সিংহ যে রকম হরিণীর মাংস টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁে খায়?'

আমি নির্বাক।

চাঁদ বহুক্ষণ হল বাড়ির পিছনে আড়াল পড়েছে। আবছায়াতেও শব্‌নমে চোখ জলজল করছে।

হঠাৎ মধুর হেসে সুধীরে তার মাথাটি আমার জানুর উপর রেখে বললে, 'ন গো', না। সেইখানেই তো তুমি। তোমার অজানতে তোমার ভিতর একজ আছে যাকে আমি চিনি। সে বলে, "আমার যা হক্কের মাল আমার কাছে তা এসেছে—আমার তাড়া কিসের!" আর জান, তুমিই একমাত্র লোক যে আমা প্রতি মুহূর্তে কবিতা উদ্ধৃতি শুনে কখনও শুধায় নি, তুমি বাস্তবে বাস করো, ন কাব্যলোকে? তুমিই একমাত্র যে বুঝেছে যে কাব্যলোকে বাস না করলে বাস কি করব ইতিহাস-লোকে, না দর্শনলোক না ডাক্তারদের ছেঁড়া-খোঁড়ার শবলোকে আর এ সব কোনও লোকেই যদি বাস না করি তবে তো নেমে আসবও সে লোকে—গাধা গরু যেখানে ঘাস চিবোয় আর জাবর কাটে।

'কিন্তু এসব কিছু নয়, কিছু নয়। আসল কথা, সে তোমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেম আমি সুজাতা, সুচরিতা, সুস্মিতা আর আমার প্রেম যেন নববসন্তের মধু নরগিস— তোমার প্রেম জরা-নিদাঘের বিরহরসঘন দ্রাক্ষাকুঞ্জ। তারই ছায়ায় আমি জিরবে তারই দেহে হেলান দিয়ে আমি বসব, সেই আঙুর আমি জিভ আর তালু মাঝখানে আস্তে আস্তে নিষ্পেষিত করে শুষে নেব। এই যে রকম এখন করছি।'

আমার মুখ কাছে টেনে নিল।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠে শুধালে, 'বল দেখি মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেতে পারে না কেন?'

'কি করে বলব বল।'

'দু' মিনিট মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না বলে। কথা কইতে ইচ্ছে যায়। আর শোন, জানেমন্ আমাকে ডেকে কি বললে, জান? বললে, তুমি নাকি আমার আঁধার ঘরের অনির্বাণ বিজলি। তোমার বুকের ভিতর নাকি বিদ্যুৎবহ্নি। আমরা একশ' বছর বাঁচলেও নাকি তোমার প্রেম ক্ষণে ক্ষণে চমক দিয়ে আমাকে নিত্য নবীন করে রাখবে। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথা কি বলেছে, জান? বলেছে, আমি যেন তোমার কাছ থেকে ভালবাসতে শিখি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'তার মানে তুমি আমাকে বেশি ভালবাস। তাঁকে অবিশ্বাস করি কি করে? চোখের রোশনী নেই বলে তিনি হৃদয় দেখতে পান।'

আমার আহ্লাদের দুকূল প্লাবিত হয়ে গেল। শব্‌নমকে বুকে ধরে বললুম, 'বন্ধু, তোমার ক্ষুদ্রতম দীর্ঘনিশ্বাস আমাকে কাতর করে। কিন্তু এখন যে দুশ্চিন্তায় তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সেটা দীর্ঘতর হোক।'

কান্না হাসিতে মিশিয়ে বললে, 'আমি স্বামীসোহাগিনী।'

কাবুল নদীর ওপারে সার-বাঁধা পল্লবহীন দীর্ঘ তম্বঙ্গী চিনার গাছের দল দাঁড়িয়ে আছে বরফে পা ডুবিয়ে। যেন নগ্না গোপিনীর দল হর্ম্যসারির পশ্চাতে লুক্কায়িত রাধামাধব চন্দ্রের কাছ থেকে বস্ত্র ভিক্ষা করছে। তাদের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। চন্দ্রাভা পাণ্ডুর।

'এ কি?' বলে উঠল হঠাৎ হিমিকা। 'এ কি? এদিকে বলছি স্বামীসোহাগিনী, ওদিকে তার আরাম সুখের খেয়ালই নেই আমার মনে। তোমার ঘুম পায় নি?'

আমি বললুম, 'না তো। তোমার?'

'আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন সমস্ত জীবন ঘুমিয়ে এইমাত্র জেগে উঠলাম।'

উঠে গিয়ে আলমারি খুলে আমার জন্য পাজামা কুর্তা নিয়ে এল। বললে, 'দেখ দিকি মোটামুটি ফিট হয় কি না। আমি আন্দাজে সেলাই করেছি।'

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গেল, 'আমি তাকে নিয়ে যাব, আমার মায়ের বাড়িতে। মা আমায় শিখিয়ে দেবে। আমি তাকে পান করতে দেব সুগন্ধি মদিরা—আমারই ডালিম নিংড়ে বের করা রসের সুরভি মদিরা। তার বাম হাত

রইলে আমার মাথার নিচে আর তার ডান হাত দিয়ে সে আমায় আলিঙ্গন করবে। আমার অনুরোধ, আমার আদেশ, অয়ি জেরুজালেম-বালা-দল আমার প্রেমকে চঞ্চলিত করো না, তাকে জাগ্রত করো না, যতক্ষণ সে না পরিতৃপ্ত হয়।...আমি তাকে নিয়ে যাব আমার মায়ের ঘরে—যে ঘরে আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আমি তাকে পান করতে দেব আমারই ডালিম নিংড়ে—'

চার হাজার বৎসরের পুরাতন বাসর রাত্রি গীতি।

পুরাতন।

## ॥ আট ॥

তপ্ত শয্যায় শব্‌নমের গায়ে ঈষৎ শিহরণ। অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণীর কম্পন?

মোতির মালাটি গলাতেই আছে। আমি সেটি দানা দানায় অল্প অল্প ঘোরাতে ঘোরাতে একটা লকেটে হাত ঠেকল। বললুম, 'এর ভিতরে কিছু আছে?'

চুপ।

আমি মালা ঘোরানো বন্ধ করে তার বুকের উপর হাত রেখে চুপ করে রইলুম।

হঠাৎ লেপ সরিয়ে উঠে পড়ল ঘরের কোণের অতিশয় ক্ষীণ শিখাটির দিকে। আমি দেখতে পেলুম, যেন ঝড়ে উড়ে গেল একটি গোলাপ ফুল, তার দীর্ঘ ডাঁটাটির চতুর্দিকে আলুলায়িত, হিল্লোলিত অতি সূক্ষ্ম, অতি ফিকে গোলাপী মসলিন? ক্ষীণালোকে তার প্রতিটি অঙ্গ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছেও না।

আলো জোর করে দিয়েছে। এখন প্রতি অঙ্গ—। আমি চোখ বন্ধ করলুম।

আমার পাশে শুয়ে লকেটটি খুলে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'এই আমার শেষ গোপন ধন। এবারে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

খুলে দেখি আমারই একটি ছোট্ট ফটো! অবাক হয়ে শুধালুম, 'এ তুমি কোথায় পেলে?'

বললে, 'চোখের জলে নাকের জলে।'

'সে কি?'—এত দিনে বুঝলুম, শব্‌নম কেন কখনও আমার ছবি চায় নি।

'আব্বা ইংরেজী কাগজ নেন—হিন্দুস্থানী। জশ্‌নের কয়েকদিন পরে তারই একটাতে দেখি পরবের সময় ব্রিটিশ লিগেশনে আর কাবুল টিমে যে ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল তারই খান দুই তিন ফটো। কান্দাহার থেকে লিখলুম ওই কাগজকে

ছবিটার কন্টাক্ট্ প্রিন্ট পাঠাবার জন্য। মূল্যস্বরূপ পাঠালুম, এ দেশের কয়েকখানা বিরল স্ট্যাম্প—বিদেশে পয়সা পাঠানো যে কী কঠিন সেই জ্ঞান হল চোখের জলে নাকের জলে। সান্ত্বনা এই, যে লোকটার হাতে চিঠিখানা পড়েছিল, সে নিশ্চয়ই স্ট্যাম্প বোঝে। আমাকে অনেক আবোল-তাবোল ছবির মাঝখানে ওই ছবিও পাঠালে খান তিনেক। তোমার ছবি তুলে নিয়ে লকেটে পুরে দিলুম। হল ?'

আমি কি বলব ? আমি তার মুক্তামালারুদ্রাক্ষের শেষ প্রান্তের ইষ্টমন্ত্র।

দিনযামিনী সায়ম্প্রাতে শিশিরবসন্তে বক্ষলগ্ন হয়ে এ শুনেছে শবনমের আকুলতা ব্যাকুলতা—প্রতি হৃদয়স্পন্দনে। একে সিক্ত করে রেখেছে শবনমের অসহ্য বিরহশর্বরীর তপ্ত আঁখিবারি।

আমি কল্পনা করে মনে মনে সে ছবি দেখছি, না শবনম কথা বলছে ? দু'টার মাঝখানে আজ আর কোনো পার্থক্য নেই। কিংবা তার না-বলা-ব্যথা যেন কোন্ মন্ত্রবলে শব্দতরঙ্গ উপেক্ষা করে তার হৃদ্স্পন্দন থেকে আমার হৃদ্স্পন্দনে অব্যবহিত সঞ্চারিত হচ্ছে। কণ্ঠাশ্লেষে বক্ষালিঙ্গনে চেতনা চেতনায় এই বিজড়ন অন্য রজনীর তৃতীয় যামে আমা দোঁহাকার জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞান, অপূর্বলব্ধ বৈভব।

কত না সোহাগে কত না গান গুনগুন করে শবনম সে রাত্রে আমাকে কানে কানে শুনিয়েছিল। লায়লী মজনূঁর কাহিনী।

বাঙালী কীর্তনিয়া যে রকম রাধামাধবের কাহিনী নিবেদন করার সময় কখনও চণ্ডীদাস, কখনও জগদানন্দ, কখনও জ্ঞানদাস, কখনও বলরাম দাস, বহু পুষ্প থেকে মধু সঞ্চয় করে অমৃতভাণ্ড পরিপূর্ণ করে, শবনম ঠিক তেমনি কখনও নিজামী, কখনও ফিরদৌসী, কখনও জামী, কখনও কিগানী থেকে বাছাই বাছাই গান বের করে তাতে হিয়ার সমস্ত সোহাগ ঢেলে দিয়ে আমাকে সেই সুরলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল যেখানে সে আর আমি দু'জনা, যেখানে কপোতী কপোতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ঊর্ধ্বতর প্রেম গগনাঙ্গনে।

কপোত-কপোতী দিয়েই সে তার কীর্তন আরম্ভ করেছিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণে মুকুলিকা লায়লী পুষেছিল কপোত-কপোতী। যৌবন দেহলি-প্রান্তে সে কপোত-কপোতীকে দেখে আধো আধো বুঝতে শিখলে প্রেমের রহস্য।

দেহ তখন আর লায়লীর সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারছে না। ওষ্ঠাধর বিকশিত হয়ে ডেকে এনেছে প্রথম উষার নীরব পদক্ষেপে গোলাপী আলোর অবতরণ। তারই দু'পাশে শুভ্র শর্করার মত তার বদন ইন্দুর বর্ণচ্ছটা, কিন্তু কপোল দুটির লালিম

হার মানিয়েছে বর্ষণ শেষের রক্তাক্ত সূর্যাস্তকে। রক্ত কপোল আর শুভ্র বদনপ্রান্তের মাঝখানে একটি কজ্জল-কৃষ্ণ তিল, যেন হাবশী বালক লাল গালের গোলাপ বাগানের প্রান্তদেশে খুলেছে শুভ্র শর্করার হাট। সে বালক তৃষিত। তারই পাশে লায়লীর গালের টোলটি। সে যেন আব্-ই-হায়াৎ, অমৃতবারির কূপ—অতল গভীর হতে উৎসারিত হচ্ছে অমৃতসুধা। স্মিত হাস্যের সামান্যতম নিপীড়নে উৎস-মূলে যে আলোড়ন সৃষ্ট হয় তারই সৌন্দর্য প্লাবিত করে দেয় তার গুল্-বদন, ফুল্ল বল্লরী। সমুদ্র-কুমারীর চোখের জল জমে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেয় যে মুক্তা সে-ই এসে আলোর সন্ধান পেয়েছে লায়লীর ওষ্ঠাধরের মাঝখানে। সে ওষ্ঠে আমন্ত্রণ, অধরের প্রত্যাখ্যান—মজনূঁর ওষ্ঠাধর যেদিন এদের সঙ্গে সম্মিলিত হবে সেদিন হবে এ-রহস্যের চূড়ান্ত সমাধান।

তরুণ রাজপুত্র কয়েস দূর হতে প্রথম দর্শনেই অভিভূত হয়ে আকুলি-বিকুলি করে কি ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে তার বাল্যসখাও বুঝতে পারে নি। সর্পদষ্টাতুরকে আত্মজন যে রকম স্বগৃহে নিয়ে আসে, সখা সেইরকম কয়েসকে নিয়ে গেল আপন দেশে।

অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্যম্পশ্যা লায়লীকে প্রেমের পুকার, হৃদয়ের আহ্বান পাঠাবে কয়েস কি করে?

এখানে এসে শব্নম যে কাহিনী বর্ণনা করল তার সঙ্গে আমাদের নল-দময়ন্তী কাহিনীর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে হৃদয়ের কন্দর্পভার ধারণে অসমর্থ নলরাজ কুসুমায়ুধের অগ্রদূত রূপে পাঠিয়েছিলেন বন্য-হংসকে, আর শব্নমের কাহিনীতে কয়েস লায়লীর নবশ্যামদূর্বাদল-বক্ষতলে পালিত কপোতকে বন্দী করে তার ক্ষীণপদে বিজড়িত করে পাঠিয়েছিল প্রেমের লিখন।

কি উত্তর দিয়েছিল লায়লী? কে জানে? কিন্তু আরব ভূমিতে আজও তাবৎ দরদী-হিয়া, শুষ্ক-হৃদয়, সবাই জানে, সেই দিন থেকে লায়লীর চোখে দেখা দিল এক অদ্ভুত জ্যোতি—ক্ষণে ক্ষণে কারণে অকারণে তার চোখে হিল্লোলিত হতে লাগল এক অদৃষ্ট-পূর্ব বিদ্যুল্লেখা।

রাজপ্রাসাদ থেকে যে দেওদার সারি চলে গেছে মরুভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত তারই শেষে ছিল ঝরনা-ধারা। এ দেওদার সুদূর হিমালয় থেকে আনিয়েছিলেন লায়লীর এক পূর্বপুরুষ। কিংবদন্তী বলে, শস্যশ্যামল-সজল বনভূমির শিশু দেবদারু একমাত্র তাঁরই সোহাগ-মাতৃস্তন্য পেয়েছিল বলে এই অগ্নিতপ্ত খরভূমিতে পল্লবঘন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।

আর সেই ঝরনার জল আনতে যেত নগরিকার কুমারীগণ।

যুগ যুগ ধরে তরুণ প্রেমিক দেওদার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেণুরবে, কখনও বা গানে গানে প্রেমের আহ্বান পাঠিয়েছে প্রেমিকাকে।

দেবদারু অন্তরালে মরুভূমির সুদূর প্রান্তে ধীরে ধীরে উঠছে পূর্ণচন্দ্র। দীর্ঘ দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় যেখানে আলোছায়ার কম্প্রমান বেপথু আলিঙ্গন তারই পাশে গা মিশিয়ে দিয়ে মজনূঁ উদ্বাহু হয়ে ধীর স্থির কণ্ঠে লায়লীকে আহ্বান জানাচ্ছে অদৃশ্য গীতাঞ্জলি স্তবকে স্তবকে নিবেদন করে।

এ আহ্বান জনগণের সুপরিচিত কিন্তু আজ সন্ধ্যার এ আহ্বান যে রহস্যময় মন্ত্রশক্তি নিয়ে বসন্ত সমীরণের চঞ্চলমুখরতা মৌন করে দিল, দেবদারুপল্লবদল স্তম্ভিত করে দিল সে যেন ইহলোকবাসী মর মানবের ক্ষণমুখর হৃৎপিণ্ড স্পন্দনজাত নয়। গৃহে গৃহে বাতায়ন বন্ধ হল। হর্ম্যশিখর থেকে নাগর নাগরী দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধেরা মক্কার উদ্দেশে মুখ করে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে প্রার্থনায় রত হলেন।

কার ওই ছায়াময়ী অশরীরী দেহ? কার হৃদয় ছুটে চলেছে দেহের আগে আগে—ওইখানে, যেখানে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত উৎসধারা বিগলিত আলিঙ্গনে সিক্ত করে দিচ্ছে দেবদারুদ্রুমকে?

চৈতন্যের পরপারে অজরামর অন্তহীন আলিঙ্গন।

বেহেশ্‌ৎ ত্যাগ করে ফিরিশতাগণ তাঁদের চুম্বনের মাঝখানে এসে আপন চিন্ময়রূপ বিগলিত করে দিলেন।

সংস্কারমুক্ত-জনও প্রিয়াসহ তাজমহল দর্শনে যায় না। যমুনা পুলিনের কিংবদন্তী বলে, হংস-মিথুন পর্যন্ত বৃন্দাবন বর্জন করে—তাজমহলের উৎসজল এক সঙ্গে পান করে না। যমুনা বিরহের প্রতীক। অপিচ বাসরঘর প্রথম মিলনকে চিরজীবী করে রাখতে চায়। সেখানে বিরহ-গাথার ঠাঁই নেই। শব্‌নম অতি সংক্ষেপে ক্ষীণ কাকলিতে লায়লী মজনূঁর সে কাহিনী ছুঁয়ে গেল—কনিষ্ঠা যে রকম ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে তার কনিষ্ঠতম ভীরু অঙ্গুলি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাগ্রজের কপালে তিলক দেয়।

বর্ষাভোরের ঘন মেঘ হঠাৎ কেটে গেলে যে রকম শত শত বিহঙ্গ বনস্পতিকে মুখরিত করে তোলে ঠিক সেই রকম অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হল শব্‌নমের আনন্দ গান!

মর্ত্যের ধুলার শরীর আর মৃত্যুঞ্জয় প্রেমকে ধরে রাখতে পারল না। দিগলম্ব-

প্রান্ত থেকে যে রামধনু উঠেছে মধ্য-গগনের স্বর্গদ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত তারই উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে লায়লী মজনূ চলেছে অমর্ত্যলোকে। কখনও গহন মেঘমায়া, কখনও তরল আলোছায়ার মাঝে মাঝে, কখনও চূর্ণ স্বর্ণরেণু সূর্যরশ্মি কণা আলোড়িত করে, কখনও ইন্দ্রধনুর ইন্দুনিভ বর্ণবন্যায় প্রবহমান হয়ে তারা পৌছল স্বর্গদ্বারে। জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে বেহেশ্‌তের আনন্দাঙ্গনে। পরিপূর্ণ প্রণয়-প্রতীক স্বর্গ হতে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেখানে প্রত্যাবর্তন করছে অনিন্দ্য, নবজন্ম নিয়ে, মরজীবনের জীর্ণ বাস ত্যাগ করে, সুরলোকের অসম্পূর্ণতা সর্বশ্রীময় করে দিতে।

সে কী ছবি! চতুর্দিকের হুরী ফিরিশতাগণের চোখে পলক পড়ছে না। দিব্যজ্যোতি ধারণ করে লায়লী মজনূ বসে আছেন মুখোমুখি হয়ে। ফিরিশতা-প্রবীণ জিব্‌রইল তাঁদের সম্মুখে ধরেছেন পানপাত্র—আল্লাতালা কুরান শরীফে যে শরাবুনতহুরা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন তাই জিব্‌রইলের হাত থেকে তুলে নিয়ে লায়লী এগিয়ে ধরেছেন মজনূঁর সামনে। দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই সুধাপাত্র হতে।

চতুর্দিকে মধুর হতে মধুরতর সঙ্গীত:

হে প্রেম, তুমি ধন্য হলে লায়লী মজনূঁর বক্ষমাঝে স্থান পেয়ে!

হে প্রেম, তুমি অমরত্ব পেলে লায়লী মজনূঁর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে!

খুদাতালার সিংহাসন থেকে ঐশীবাণী উচ্চারিত হল:

হে সুরলোকবাসীগণ! প্রেমের দহন দাহে দগ্ধ হয়ে অর্জন করেছ তোমরা সুরলোকের অক্ষয় আসন।

হে মর্ত্যবাসীগণ! সর্বচৈতন্য সর্বকল্পনার অতীত যে মহান সত্তা তিনি তাঁর বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপের একটি মাত্র রূপ স্বপ্রকাশ করেছেন মর্ত্যলোকে—তাঁর প্রেমরূপ।

## ॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

## ॥ এক ॥

যে মানুষ ছেলে-বয়স থেকে অন্ধের সেবা করেছে তার সেবা হয় নিখুঁত। এতখানি পাওয়ার পরও যে আমি শব্নমের সেবার দিকে খুঁতখুঁতে চোখে তাকিয়েছিলুম একথা বললে নিজের প্রতি অপরাধ করা হয়। আমি দেখেছিলুম, অনুভব করেছিলুম তার সেবা নৈপুণ্য, আর্টিস্টের মডেল যে রকম ছবিটি যেমন যেমন এগোয় তাকে মাঝে মধ্যে সন্তুষ্ট নয়নে দেখে যায়।

ভোরবেলা অনুভব করলুম, চতুর্দিকে লেপ গুঁজে দেওয়ার সময় তার হাতের ভীরুস্পর্শ।

সকালবেলা সামনে যে ভাবে চায়ের সরঞ্জাম সাজালে তার থেকে বুঝলুম, কান্দাহারে যে হাত বুলবুল-গুলের মাঝখানে বিচরণ করেছে সে মাটিতেও নামতে জানে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, শব্নবের চোখ দুটি লাল! আমার হাতের পেয়ালা ঠোঁটে যাবার মাঝপথে থমকে দাঁড়াল।

শব্নম বুঝেছে। বললে, 'আজ অতি ভোরে বাবা কান্দাহারে চলে গিয়েছেন। তোপল্ খান এসে খবর দিলে, আমান উল্লা তাঁকে তাঁর শেষ ভরসার মালিকরূপে চিনতে পেরেছেন। বাবা জানেন, আমান উল্লার সব আমির-ওমরাহ্ তাকে বর্জন করেছেন, কুরবানীর ছাগলকেও মানুষ জল দেয়, তারা—থাক্‌গে।

'যাবার সময় বলে গেছেন, তুমি যেন সকালবেলাই ব্রিটিশ লিগেশনে নিজে গিয়ে আমাদের বিয়ের দলিল জিম্মা করে আসো।'

'আর কি বলেছেন ?'

'বলেছেন, সুযোগ পেলে তুমি একাই হিন্দুস্থানে চলে যেয়ো।'

'তুমি ? সেই তো ভালো।'

'না! তুমি।' তার মুখ খুশিতে ভরে গিয়েছে। বললে, 'জান, আব্বা এখন তোমাকে আমার চেয়েও বেশি ভালবাসেন। বললেনও, "কেন বেচারীকে আমাদের ঘরোয়া বিপদের ভিতর জড়ালুম!" এই প্রথম দেখলুম, বাবা কোনও কাজের জন্য অনুশোচনা করলেন। তখন আমি তাঁকে বললুম—অবশ্য আমি আগেই স্থির করে রেখেছিলুম, এক দিন না এক দিন জানেমন্‌কে দিয়ে বলাব—যে তোমাকে আমি আগের থেকেই ভালবাসতুম। আমাদের প্রথম শাদির কথাটা

কিন্তু বলি নি। সেটা বলব, যেদিন তাঁর কোলে তাঁর প্রথম নাতি দেব। বাবা ভারী খুশি হয়ে নিশ্চিন্ত মনে কান্দাহার গেছেন।'

আমি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলুম। শেষটায় বললুম, 'তোপলের সঙ্গে একবার দেখা হল না!'

বললে, 'সে আস্তে আস্তে তোমাকে দেখে গেছে। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। আর তোমাকে বলতে বলে গেছে, সব-কিছু চুকেবুকে গেলে তার আপন দেশ মজার-ই-শরীফে আমাকে নিয়ে যেতে।'

ছোট্ট বাচ্চাকে মা যে রকম জামা-কাপড় পরাতে ইচ্ছে করে দেরি করে, প্রতিপদ চড়াবার পর বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, শব্‌নম ঠিক সেই রকম আমাকে জামা-কাপড় পরালে। যখন আমার জুতোর ফিতে বাঁধতে গেল মাত্র তখনই বাধা দিয়েছিলুম।

শব্‌নমের মুখে হাসি-কান্না মাখানো। তার পিছনে গাম্ভীর্য। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বললে, 'বেশি দেরি করো না।'

তার পর কানে কানে বললে, 'তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

বয়স্করা বেরুচ্ছে না—বাচ্চারা রাস্তায় খেলা করছে ঠিকই।

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, 'দেবদূত যেখানে যেতে ভয় পান, মূর্খেরা সেখানে চিন্তা না করে ঢোকে।' এর উল্টোটাও ঠিক। মৃত্যুভয় শুধু মূর্খের, তাই বয়স্করা রাস্তায় বেরুচ্ছে না। বাচ্চারা দেবশিশু, তারা নির্ভয়ে খেলছে। যেটা খেলছে সেটা শুধু এই সময়েই এবং শীতের দেশেই সম্ভব। কাবুলের অষ্টাবক্রপৃষ্ঠ রাস্তার জায়গায় জায়গায় জল জমে যায়—সে কিছু নূতন কারবার নয়—সেই জমা জল ফের জমে গিয়ে বরফ হয়ে দিব্য স্কেটিং-রিঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। সাবধানী পথিকও সেখানে পা হড়কে দড়াম করে আছাড় খায়। বাচ্চাদের সেইটেই স্বর্গপুরী। অন্যত্র বলেছি, কাবুলীরা পয়জারে শত শত লোহার পেরেক ঠুকে নেয় বলে তার তলাটা সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে হয়ে যায় পিছল। বাচ্চারা শুকনো মাটিতে একটুখানি দৌড়ে এসে সেই বরফের উপর নিজেকে ব্যালানস্ করে সামনের দিকে একটু ভর দেয় এবং সাঁই করে বরফের অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। আমরা দেশে যে রকম নদীর ঢালু পাড়েতে জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে সুপুরির খোল দিয়ে আসন বানিয়ে হড়হড় করে নিচে নেমে যাই।

মাঝে মাঝে দেউড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও মা ছেলেকে গালিগালাজ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ডাকে—'আয় পিদর-সুখ্‌তে—ওরে পিতৃদহ ( বাপকে যে পুড়িয়ে মারে ), তোর বাপ নির্বংশ হোক—তোর যম বাড়ির ভিতরে না বাইরে? এখ্‌খুনি ভিতরে আয় বলছি।'

'মাদর-সুখ্‌তে' বা 'মাতৃদহ' কখনও শুনি নি। বোধ হয় উড়ো খইয়ের মত নরকাগ্নিকুণ্ডও 'জনকায় নমঃ'।

ব্রিটিশ লিগেশনের যে কর্মচারীর সঙ্গে আমার শ্বশুরমশায়ের কথাবার্তা হয়েছিল তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমি কিছু বলার পূর্বেই আমাকে অভিনন্দন জানালেন, মিষ্টিমুখ করালেন। ইনি পেশাওয়ারের লোক। তবে কি কৌটিল্য ওই অঞ্চলের লোক? গুপ্তচর বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে দাক্ষিণ্য পেয়েছেন? কিন্তু লোকটি চমৎকার। বিয়ের দলিলখানা লোহার সিন্দুকে তুলতে তুলতে বললেন, 'অনবদ্য হাতের লেখা। মনে হয়, দলিল নয়, ছন্দে গাঁথা অভিনন্দন পত্র। আমি যত শীঘ্র পারি বাচ্চাই সকাওকে কথাচ্ছলে জানিয়ে দেব যে হিন্দুস্থানে আফগানিস্থানে যুগ যুগ ধরে যে 'আঁতাঁৎ কর্দিয়াল'—'হার্দিক রাখীবন্ধন'—গড়ে উঠেছে, এই বিয়ের মারফতে তারই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল।'

যিনি এতখানি সহৃদয় তাঁকে ওকীব-হাল করতে হয়। তবু একটু চিন্তা করে বললুম, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান আজ ভোরে কান্দাহার চলে গেছেন।'

চমকে উঠে বললেন, 'সে কি!' একটু ভেবে বললেন, 'নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে।'

আরও কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'এটা কি ভালো করলেন? আমি অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক চালের কথা ভাবছি নে, আমি ভাবছি, তিনি এই দুর্দিনে সবাইকে কার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অবশ্য তেমন কিছু দুশ্চিন্তা করার নেই।'

এই ভদ্রলোক আমাকে সাধারণত সহজে ছাড়তে চান না। আজ অবশ্য দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

আমাদের দেশেই যখন বহু পাখি শীতকালে হাওয়া বদল করতে যায় তখন এই শীতের দেশে লতাগুল্ম কীটপতঙ্গহীন ঋতুতে থাকবে কে? তবু হঠাৎ দেখি, একজোড়া ক্ষুদে পাখি একে অন্যকে তাড়া করছে, বরফে লুটোপুটি খাচ্ছে, ফুরুৎ ফুরুৎ করে পালক থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়ছে। আমাকে দেখে উড়ে গিয়ে

গাছের একটি ন্যাড়া ডালে বসল।

আমি জানি এসব পাখি মানুষের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে, এবং শুধু জৈনরাই পিঁপড়েকে চিনি খাওয়ায় তাই নয়, কঠোরদর্শন কাবুলী খানসাহেবকে আমি জোব্বার জেব থেকে শুকনো রুটি বের করে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিতে দেখেছি।

আমি গাছটার কাছে আসতে আবার উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশের আরেক গাছে বসল। আমার পকেটে কিছু ছিল না বলে বড় দুঃখ হল। কাবুল শহরে না পৌঁছানো পর্যন্ত এরা উড়ে উড়ে আমাকে সঙ্গ দিল।

শব্‌নমের যত কাছে আসছি আমার হৃদয়ের ক্ষুধা ততই বেড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে তাকে পেয়েছি পাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে। আর আজ এই ঘণ্টা দুয়ের বিচ্ছেদে প্রাণ এত ব্যাকুল হয়ে উঠল? এতদিন পরে বুঝতে পারলুম, লাখ লাখ যুগ ধরে হিয়ায় চেপে রাখলেও হিয়া জুড়োয় না।

এ কি? বাড়ির সদর দরজা খোলা কেন? কাবুলে তো এরকম হয় না—শান্তির সময়ে, দিন দুপুরেও।

একটু ইতস্তত করে বাড়িতে ঢুকলুম। এ কি! এত যে চাকর দাস-দাসী আঙ্গিনা ভর্তি করে থাকে, আজও সকালে বিয়ের পরের দিনের কি এক পরব তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল, তারা সব গেল কোথায়? জিনিসপত্র তেমনি ছড়ানো। সিঁড়ির মুখে একটা কলসী কাত হয়ে পড়ে আছে, তার জল জমা হয়ে খানিকটা বরফ হয়ে গিয়েছে। কাবুলীরা কি অমঙ্গল চিহ্ন চেনে না?

আমার বুকের ভিতর কি রকম করতে লাগল। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে।

কাকে ডাকি? আমি তো কারোরই নাম জানি নে।

হঠাৎ কি অজানা অমঙ্গল আশঙ্কা মনে জেগে উঠল। ছুটে গেলুম আমাদের বাসরঘরের দিকে। খোলা দরজা খাঁ খাঁ করছে।

'শব্‌নম', 'শব্‌নম'—চেঁচিয়ে উঠলুম। কোনও উত্তর নেই।

সব-কিছু সাজানো গোছানো। এক ট্রে চা পর্যন্ত। শুধু একদিকে একটি ছোট পেয়ালা চা—তার আধ পেয়ালা খাওয়া হয়েছে।

এঘর ওঘর সব ঘর খাঁ খাঁ করছে। সেই পাগলের মত ছুটোছুটির ভিতর একই ঘরে ক-বার এসেছি বলতে পারব না। এমন কি জানেমনের ঘরেও গেলুম। সেখানেও কেউ নেই।

আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। আঙিনায় নেমে শুষ্ককণ্ঠে চেঁচাতে লাগলুম, 'কে আছ, কোথায় আছ?' 'কে আছ, কোথায় আছ?'

কতক্ষণ কেটে গেল কে বলতে পারে।

আমার পিছন থেকে কে এসে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এ বাড়ির চাকর। আমি ভাঙা গলায় যতই তাকে প্রশ্ন করি সে আরও চিৎকার করে কাঁদে। সে বরফের উপর শুয়ে পড়ে গোঙরাতে আরম্ভ করেছে।

দেউড়ি দিয়ে আরও লোক ঢুকছে। বাড়ির দাসদাসী। আমাকে ঘিরে তারা চিৎকার করে সবাই কাঁদছে। বুক-ফাটা কান্না—জিগরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সবাই আমার পা, হাঁটু, জানু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

এই অর্ধচেতন অবস্থায় বুঝতে পেরেছি, নিদারুণ অমঙ্গল না হলে এতগুলো মানুষ এরকম মাথা খুঁড়তে পারে না।

এরই মাঝখানে ভিড় ঠেলে সেই কলেজের ছোকরাটি আমার কাছে এগিয়ে এল। সেও পাগড়ির লেজ দিয়ে মুখ নাক ঢেকে সেটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে আত্মগোপন করছে। প্রথমটায় আমিও তাকে চিনতে পারি নি। তার চোখে আতঙ্ক, ঘৃণা আর কান্না। পাড়া প্রতিবেশীর ভিতর একমাত্র সে-ই সাহস করে দুঃসংবাদ দিতে এসেছে। যত বড় দুঃসংবাদই হোক আমি সেটা শুনব। অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা থেকে হোক সেটা দুঃসহতর অসহ্য। কানের কাছে মুখ রেখে চেঁচিয়ে বললে, 'শব্‌নম বীবীকে বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের লোক নিয়ে গিয়েছে—।' আমার পায়ের তলায় যেন কিছু নেই। ছেলেটি আমার কোমর দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বললে, 'হুজুর, এ-সময়ে আপনি অবশ হবেন না। আপনার জ্যাঠা শ্বশুরমশাই তাঁর সন্ধানে আর্ক দুর্গে গিয়েছেন। আপনাকে বাড়িতে থাকতে বলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, আপনি যেন কিছুতেই না বেরোন।'

আমাকে ধরাধরি করে জানেমনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললে, 'আমি আর্কে চললুম খবর নিতে।'

কতক্ষণ কি ভাবে কেটেছিল বলতে পারব না। দাসদাসীরা কাঁদছে। দু-একজন যেন কথাও বলছে, কান্নার সঙ্গে সঙ্গে। কেন সর্দার আওরঙ্গজেব চলে গেলেন? তিনি থাকলে তো এরকম হত না। কেন তিনি কড়া মানা করে গেলেন, কেউ যেন ডাকুদের সঙ্গে লড়তে না যায়। তোপল্ থাকলে, হুকুম পেলে একাই তো বিশজনকে শেষ করতে পারতো। ওরা—নিজেরাও তো কিছু কাপুরুষ নয়। আরও অনেক ফরিয়াদ তারা করেছিল।

এদের ভিতর যে সবচেয়ে বৃদ্ধ সে আমাকে বিছানা থেকে তুলে একটা চেয়ারে বসালে। তার চোখ শুকনো। মনে হল সে কাঁদে নি, কথাও বলে নি। আমি কোনও কথা বুঝতে পারছি না দেখে আমাকে ধীর কণ্ঠে বললে, 'ছোট সাহেব, আপনি শক্ত হন। আপনি এ বাড়ির জোয়ান মালিক। আপনি ভেঙে পড়লে এই এতগুলো লোক পাগল হয়ে কি যে করবে ঠিক নেই। এরা প্রথমটায় প্রাণের ভয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে লুকিয়েছিল। এখন আবার ক্ষেপে গিয়ে কি করবে বলা যায় না। বাচ্চার ডাকুরা লুটপাট করে নি কিন্তু এখন আর সবাই আসবে বাড়ি লুট করতে। আমি কিছুই বলি নি! এ বাড়িটা রক্ষা করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ?'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'দেখুন হুজুর, এ বাড়ির কত সম্মান, কত বড় ইজ্জত। সর্দার আওরঙ্গজেব পরিবারের বাস্তুভিটে না হয়ে আর কারও হলে এতক্ষণে পাড়া প্রতিবেশীরাই এ বাড়ির দোর জানলা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেত!'

আমি তখনও কোন সাড়া দিচ্ছি নে দেখে হতাশ কণ্ঠে বললে, 'এই যে এতগুলো লোক, এদের জীবন মরণ আপনার হাতে। সর্দার হুকুম দিয়েছিলেন, বাচ্চার লোককে যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়। এখন অন্য লোক লুট করতে এসে এদের মেরে ফেলতে পারে—আপনি হুকুম না দিলে এরা পাগলের মত কি করে ফেলবে তার কোনও ঠিক নেই।'

ওই একই কথা বার বার বলে।

'আপনার শ্বশুরমশাই, জ্যাঠশ্বশুরমশাই আপনাদের প্রতি যে আদেশ রেখে গেছেন সেটা পালন করুন। শব্‌নম বীবীর জন্য যা করার সে তাঁর জানেমন্ করবেন।'

এবারে শেষ অস্ত্র ছাড়লো—'তিনি ফিরে এসে যদি শোনেন আপনি ভেঙে পড়েছিলেন তখন তিনি কি ভাববেন ?'

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ করলুম, ব্রিটিশ লিগেশনের সেই ভারতীয় কর্মচারীকে সব খবর দিয়ে আসতে। কি ভাবে কি হয়েছিল আমি এখনও জানি নে—লিখে জানাব কী ?

এইবারে তার চোখে জল এল। অস্ফুট কণ্ঠে আল্লার বিরুদ্ধে কি এক ফরিয়াদ জানালে। রওয়ানা হওয়ার সময় তবু তার মুখের উপর কি রকম যেন একটা প্রসন্নতা দেখা গেল। বোধ হয় ভেবেছে, তবু শেষটায় বাড়ির কর্ণধার পাওয়া গেল।

হায় রে কর্ণধার।

একজনকে আদেশ দিতে বাকিরা কি জানি কি ভেবে, অন্ধভাবে কি যেন অনুভব করে চলে গেল।

আমি শব্‌নমের—আমার—আমাদের, আমাদের মিলন রাত্রির ঘরে আর যাই নি।

শব্‌নম নাকি দাস-দাসীদের হাতিয়ার নিয়ে বাড়ি রক্ষা করতে দেয় নি। বোরকাটা পরে নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল। জানেমন্‌ ডাকাতদের বলেছিলেন, শব্‌নম বিবাহিতা রমণী। তাঁর কথায় কেউ কান দেয় নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হন। দু'জন লোক তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

আমাকে কি এঁরা বাড়ির তদারকির জন্যই রেখে গেলেন? আমি কি অন্য কোনও কাজের উপযুক্ত নই?

আমি যাব আর্কে? এ বাড়িতে আমার কি মোহ?

এই সময়ে লোকে চা খায়। দেখি, শব্‌নমের বুড়ি সেবাদাসী চা নিয়ে এসেছে।

আমাকে একটি চিরকুট এগিয়ে দিলে। বোধ হয় ভেবেছে, আমি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

দুটি মাত্র কথা। 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।'

আমি কাপুরুষ নই, আমি বীরও নই। এরকম অবস্থায় মানুষ ভানভণিতাও করতে পারে না। আমার ভিতরে যা আছে, তা ধরা পড়বেই।

বৃদ্ধকে বাড়িতে বসিয়ে যেতে পারতুম। আর কাউকে লিগেশনে পাঠালেই তো হত।

না, সর্দার হওয়ার মত ধাত দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

কিন্তু লিগেশনে খবর পাঠাবার মত সংবিৎমান লোক ওই তো একমাত্র ছিল। অন্য কাউকে পাঠালে যে দুশ্চিন্তা থাকত সে লোকটা খবর ঠিক জায়গায় মত পৌঁছিয়েছে কি না।

না, সর্দার হওয়ার মত ধাত দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েন নি।

শব্‌নমের কোনও কথা তো আমি কখনও অমান্য করি নি। অনেকে অনেক কথা বলবে, অনেকে অনেক উপদেশ দেবে, তাই সে যাবার সময় স্থির বুদ্ধিতে পাকা আদেশ দিয়ে গিয়েছে।

এখন না হয় সবাই আমাকে বাড়িতে থাকতে বলছে, কিন্তু যদি বিপদ কেটে

যায়, হাঁ, যদি বিপদ কেটে যায়, তবে একদিন সবাই ভাববে না যে আমি ভীরুর মত বাড়িতে হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছিলুম, সবাই যখন আর্কে।

হায়রে আত্মাভিমান! সবাই যেন বোঝে আমি বীরপুরুষ।

কার কাছে আত্মাভিমান? শব্‌নম কি এতদিনে জানে না, আমি বীর না কাপুরুষ। সে তো প্রথম দিনে—না, প্রথম মুহূর্তেই—আমাকে চিনে নিতে পারে নি?

লোকজনদের সবাই এখন আমার বাড়ি চেনে। একজনকে ডেকে বললুম, 'যাও তো, আব্দুর রহ্‌মানকে ডেকে নিয়ে এস।'

হে খুদাতালা, তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমার আনন্দের দিনে তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে তোমাকে স্মরণ রাখতে—আজ এই চরম সঙ্কটের দিনে সেই অনুগ্রহ কর, মহারাজ। আমি তোমাকেই স্মরণ করছি।

খবর এল আব্দুর রহ্‌মান আমার ছাত্রের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রতিবেশী কর্নেলের ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে আর্কে চলে গেছে।

তারপর আমার মতিভ্রম আরম্ভ হল।

স্বপ্ন দেখি নি, সে আমি ঠিক ঠিক জানি। যেন স্পষ্ট, স্পষ্ট কেন, স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতর দেখতে পাচ্ছি, আমি মায়ের এক জানুতে, শব্‌নম অন্য জানুতে বসে আছে আর মা কলাপাতার সামোসাতে মোড়া ধান দূর্বা আমাদের মাথার উপরে রেখে আশীর্বাদ করছেন। জাহানারা আর কুটি মুটি মাটিতে শুয়ে সকলের আগে নূতন চাচীর মুখ দেখবার চেষ্টা করছে।

সংবিতে ফিরেছিলুম বোধ হয় মায়েরই পুণ্যবলে, তাঁরই আশীর্বাদের ফলে।

মনসূর সামনে দাঁড়িয়ে। সেই কলেজের সহৃদয়, বীর ছেলে।

নতমস্তকে বললে, 'আপনার জ্যাঠশ্বশুর সোজা নূতন-বাদশা বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দরবারে চলে যান। সে আর্কে ছিল না। তিনি মোল্লাদের উদ্দেশ করে জাফর খান এবং তার দলবলকে চিৎকার করে অভিসম্পাত দিতে থাকেন। তাঁকে একটা ছোট কুটুরিতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললুম, 'তুমি আমার অনেক উপকার করলে। এর চেয়ে মহত্তর কোনও গুরুদক্ষিণা নেই।'

রাস্তায় নেমে বললুম, 'এবারে তুমি বাড়ি যাও।'

বাড়ির লোক আবার অট্টরোল করে উঠেছে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে আমাকে বার বার যেতে মানা করছে, আর বলছে সেখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

আশ্চর্য! ওদের কথা, ওদের অনুনয় আমি ঠিক মত শুনি নি কিন্তু নেক্তা চিনার গাছের ডগায় যে ষোড়শীর চাঁদ উঠেছে সেটা ঠিক লক্ষ্য করেছি। বুকে যেটুকু রক্ত ছিল সেও যেন জমে গেল। কাল রাত্রে শব্‌নম এই চাঁদের—

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। আর্কে ঢোকে কার সাধ্য। ঘোড়সওয়ার অনেক। তারা বেপরোয়া মানুষের ভিতর দিয়ে, উপর দিয়ে, তাদের জখম করে চলেছে আরও বেপরোয়া হয়ে আর্কের দিকে, আর আর্কের ভিতর থেকে আরেক বিরাট জনধারা বেরিয়ে আসতে চাইছে শহরের দিকে। দু'দিক থেকেই জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই এবং দুই জনোচ্ছ্বাস মিলে গিয়ে যে খণ্ড খণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে কোন দিকেই কেউ এগুতে পিছোতে পারছে না। অথচ চাপ দু'দিক থেকে বেড়েই যাচ্ছে ক্রমাগত। কেউ যেন আপন সংবিতে নেই।

এই প্রথম আমি আমার আপন সংবিতে ফিরে এলুম।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, এ জনতা ভেদ করে মনহুরের আসতে সময় লেগেছিল কেন?

হঠাৎ দেখি, দূরে তিন জন ঘোড়সওয়ার জনতার উপর মাথা তুলে আর্ক থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে আসছে। তাদের গতি অতি মন্থর, কিন্তু দৃঢ়। মাঝখানে সওয়ার নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্বেগে বসে আছে। দু'পাশের দুই সওয়ার বল্লম না কি দিয়ে যেন নির্মমভাবে উন্মত্ত জনতাকে খোঁচা দিচ্ছে, পথ করে দেবার জন্য।

চাঁদের আলো মুখে পড়েছে। এ কি? এ তো জানেমন্।

চিৎকার করে উঠেছিলুম, 'জানেমন্, জানেমন্, জা—।'

কে শোনে?

আমার শরীরে হাতির বল থাকলেও আমি তাঁর দিকে এগুতে পারতুম না। জনতরঙ্গের যে সামান্যতম গতিবেগ সে আমাকে নিয়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে।

নিরঙ্কুশ দুর্ভাগ্য সারি বেঁধে আসছে দেখে নিপীড়িত জন পাছে অজ্ঞান হয়ে সর্ব যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায় তাই ব্যঙ্গরাজ কিস্মতাধিপতি মাঝে মাঝে অভাগার কপালেও লক্ষ্মীর অঞ্চল বুলিয়ে দেন। আমি জনপীড়ায় অনিচ্ছায় সরছি শহরের দিকে, জানেমনের গতিও সেদিকে—যদিও তিনি অনেক দূরে। একটুখানি কম ভিড়ে পৌঁছতেই আমি নেমে গেলুম রাস্তার পাশের বরফ জমা নয়ানজুলিতে। সেখানে তাঁর পৌঁছতে লাগল যেন অনন্তকাল। চার-পাঁচজন লোক তাঁর ও অন্য দুই ঘোড়সওয়ারের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলেছে—এদের দলেরই হবে। এদেরই একজন আমাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানেমন্‌ক

ডেকেছিলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় নি।

জানেমনের মুখের দিকে আমি এক লহমার তরে তাকিয়েছিলুম।

বিকৃত, বিকট, বীভৎস—যেন এর কোনটাই নয়—কিংবা সব কটাই—তিনি কিন্তু সেগুলো যেন সংহরণ করে নিয়েছেন রুদ্রবাজ পুষণের মত। এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝরে বাম গালে জমে আছে।

তিনি নেমে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারি নি। শুনেছি, যোগীরা নাকি স্বেচ্ছায় সেটা বন্ধ করে দিতে পারেন। মনে হল, তিনি স্বেচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে।

ঘোড়সওয়াররা আর্কের দিকে ফিরে গেল। সঙ্গীরা পিছনে পিছনে এল। তাদেরই একজন শুধু বার বার বিড়বিড় করে বলছে, 'আমার কোনও দোষ নেই।'

জানেমন্ আমাকে হাতে ধরে নিয়ে যে ভাবে দৃঢ়পদে চলেছেন তাতে আমাকেই জ্যোতিহীন বলে মনে হবে। তিনি কোনও কথা বলছিলেন না। তবু বুঝলুম, তিনি আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে শুধু আমার ডান হাতখানা তাঁর বুকের উপর চেপে ধরছিলেন। আমার অশান্ত ভাব দেখে শেষটায় বললেন, 'শব্‌নম আর্কে নেই। তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

বাড়িতে ঢুকলে আবার কান্নার রোল পড়ল। শব্‌নমের বাড়ি ফেরার ক্ষীণতম আশাটুকুও আমাদের গেল।

সেই বৃদ্ধ লিগেশন থেকে ফিরে এসেছে।

## ॥ দুই ॥

জানেমন্ বললেন, 'বাছা, এবার নমাজের সময় হয়েছে। তুমি ইমাম হও।'

বয়োজ্যেষ্ঠ সচরাচর নমাজের ইমাম—অধিপতি—হন। বিকলাঙ্গ হন না। আমি আপত্তি জানাতে তিনি উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, 'আর, নমাজের শেষে দোওয়া মাঙ্‌বার সময় কোনও কিছু চেয়ো না। ওঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তাই দেব।'

আল্লার উপর অভিমান।

মনস্থরের কাছে সব শুনলুম।

বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ছিল না—জানেমন্ যখন সেখানে পৌঁছন। বাচ্চার খাস কামরার দিকে তিনি রওয়ানা হলে কেউ বাধা দেয় নি।

মনসুর বললে,

'আপনি জানেন না, হুজুর, এদেশের লোক বড়সাহেবকে কি সম্মানের চোখে দেখে। শুধু কি বাচ্চার জন্মভূমি?--ময়মনা ছিনাতে, মজার বদখশানে সর্বত্রই লোকে জানে তিনি সূফী, তিনি আল্লার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ডাকাতদের ভিতরও জাফর খান কি সহজে অত লোক জড় করতে পেরেছিল সারা শহরময় বীবীকে ধরে—' ঢোক গিলে বললে, 'আমি বলছি, নিয়ে যেতে!' এবং তারাও কি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে?'

'বড়সাহেব বাচ্চার খাসকামরার শব্দ শুনে বুঝলেন, মোল্লারা সেখানে জমায়েৎ। এরা কাবুল শহরের সব চেয়ে অপদার্থ। আমান উল্লার আমলে এরা প্রায় ভিক্ষা করে জিন্দেগী চালাচ্ছিল। এদের কোন্ গোসাঁই বড়সাহেবের নুন-নেমক খায় নি—তিনি তো দানের সময় পাত্রাপাত্র বিচার করেন না।

'বড়সাহেব সেখানে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন।

'সে আমি আপনাকে বলতে পারব না, হুজুর, এ তো গালগালাজ, চিৎকার চেঁচামেচি নয়। তিনি শান্ত, দৃঢ়, উচ্চকণ্ঠে যেন আল্লার হয়ে পৃথিবীর সব নরাধম পশুকে তাদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছিলেন।

'হঠাৎ তাঁর বন্ধ চোখ ফেটে রক্ত বেরল। আমার শোনা কথা, যৌবনে চোখের অপারেশন প্রায় শুকিয়ে গিয়ে জ্যোতি ফিরে পাবার মুখে তাঁর গলায় কি আটকে গিয়ে তিনি বিষম খান। তখন ব্যাণ্ডেজের উপর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই হয় সর্বনাশ। আজ আমি দেখি, কোনও কিছু না, হঠাৎ বন্ধ চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

'পাপ পুণ্যের কি জানি, হুজুর? আপনার কাছেই তো শিখছি। জানি কুমারী, বিধবা কোনও অবলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া পাপ—আর ইনি তো বিবাহিতা রমণী। মোল্লারা, ওই অপদার্থ মোল্লারা—'

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'সব মোল্লাই কি—?'

বললে, 'সে আমি জানি, হুজুর। আপনিও তো একদিন ক্লাসে নিজেকে মোল্লা বংশের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আমিও মোল্লা, মোল্লার বেশে ওইখানে গিয়েছিলুম বলে।

'সেই মোল্লাদের প্রবীণ যিনি, তাঁর আদেশে বড়সাহেবকে একটা কুঠরিতে নিয়ে বন্ধ করে রাখা হল। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর সে বললে, "কি বলতে কি বলে ফেলবেন ইনি। হাজার হোক নূতন বাদশাকে চটিয়ে লাভ কি?" হয়তো এরা

সত্যাই আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিল।

'ফরসা লোকও ভয়ে পাংশু হয়—নির্লজ্জও লজ্জা পায়।

'সে সব কথা থাক।

'সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ খবর এল—কি করে, কোথা থেকে জানিনে, শব্‌নম বীবী জাফর খানকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন।

'হুজুর, আপনি শক্ত হন।

'আর জাফরের যে দেহরক্ষী শব্‌নম বীবীকে বন্দী-খানায় নিয়ে যাচ্ছিল সে ও শব্‌নম বীবী দু'জনেই অন্তর্ধান করেছেন।'

আমি বেরবার জন্য তৈরী ছিলুম। বললুম, 'বৎস, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। এখন তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি সন্ধানে বেরই।'

সে বললে, 'আপনি সব কথা শুনে নিন। বড়সাহেব সেই হুকুম করেছেন।

'যে রক্ষী শব্‌নম বীবীকে নিয়ে যাচ্ছিল সে এখন বড়সাহেবের পা ধরে কাঁদছে। তাকে ডাকব, না আমি বলব? আদেশ করুন।'

আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

বললে, 'ওর বাপদাদা সাহেবের নুন খেয়েছে কান্দাহারে। সে ডাকাত হয়ে বাচ্চার দলে ভিড়েছে। সে যা বলেছে তার মূল কথা শব্‌নম বীবীকে প্রথমটায় একটা কুঠরিতে বন্ধ করে রাখা হয়। সন্ধ্যার দিকে জাফর তাকে ডেকে পাঠায়। জাফর সে ঘরে একা ছিল। ভিতরে কি হয়েছিল কেউ বলতে পারবে না একমাত্র শব্‌নম বীবী ছাড়া। হঠাৎ একটি মাত্র গুলি ছোড়ার শব্দ হল। দেহরক্ষীর দল যা দেখবে ভেবেছিল, দেখল তার উল্টোটা। জাফর খান ভুঁয়ে লুটিয়ে আর শব্‌নম বীবীর হাতে পিস্তল। হাসান আলী—আমাদের এই রক্ষী—বললে, সে কিছুই জানত না। আর পাঁচজন রক্ষীর সঙ্গে ছুটে গিয়ে সে এই প্রথম দেখলে তার মনিবদের ঘরের মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে।

'হাসান আলী ডাকাত—আহাম্মুখ নয়। সে তখন নাকি শব্‌নম বীবীকে বন্দীখানায় নিয়ে যাওয়ার ভান করে আর্কের দেউড়ির দিকে রওয়ানা দেয়।'

মনে পড়লো, শান্তির সময়ও জানতুম না, শব্‌নমকে কোথায় খুঁজতে হবে।

'ইতিমধ্যে বাচ্চা-ই-সকাও আর্কে ফিরেছেন এবং তার কিছুক্ষণ পর হাজার হাজার লোক, এবং শত শত ঘোড়া-গাধা-খচ্চর চড়ে গাঁয়ের লোক এসেছে নূতন বাদশাকে অভিনন্দন জানাতে—সোজা ফার্সীতে বলে, ইনাম, বকশিশ, লুটেরা হিস্তা কুড়োতে। এরা একবার আর্কে ঢুকতে পারলে বেশ কিছুটা খণ্ড-যুদ্ধ লেগে যাওয়া

বিচিত্র নয়। জাফর খান তাই আগেই হুকুম দিয়ে রেখেছিল, জনতা দুর্গে ঢোকবার চেষ্টা করলে তাদের যেন ঠেকানো হয়। লেগে গেল ধুন্ধুমার। আপনি তার শেষটুকু দেখেছেন, হুজুর—বুঝুন তখন কি হয়েছিল।

'বাচ্চা ফিরতেই মোল্লারা তাকে সব-কিছু বলে শব্‌নম বীবীকে ছেড়ে দিতে বলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাকি খবর আসে জাফর খান খুন হয়েছে। এবং আশ্চর্য, শব্‌নম বীবীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চার হুকুমে সমস্ত আর্ক তন্ন তন্ন করে তালাশ করা হয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'হাসান আলী কি বলে?'

'ওই এক কথা—"আমার কোনও দোষ নেই, আমার কোনও কসুর নেই।" ভিড়ের চাপে নাকি একে অন্যের কাছ থেকে ছিটকে পড়ে।'

'সে কতক্ষণ হল?'

'ঘন্টা দুই হবে। আপনি তো সে ভিড়ের এক আনা পরিমাণ দেখলেন।'

'হাসান আলীকে ডাক।'

এল। আমার যা জানার সব চেয়ে প্রয়োজন সে কি আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে জিজ্ঞেস করি নি! ওই এক কথা। হাসান আলী হঠাৎ দেখে, শব্‌নম বানু তার কাছে নেই—ওই এক কথা।

আমি মনসুরকে বললুম, 'চল।'

দেউড়িতে এসে মনসুর শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হুজুর?'

তাই তো। কোথায় যাব? 'চল, আর্কে। না। চল, আব্দুর রহ্‌মান কোথায় দেখি।'

কর্নেলের বাড়ি পৌঁছতে মনসুর সেখানে খবর নিলে। যখন ফিরলো তখন তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারলুম, কোনও খবর নেই। মনসুর কিছুক্ষণ পরে বললে, 'কর্নেলের বীবী আপনাকে বলতে বললেন, শব্‌নম বীবীকে লুকোবার প্রয়োজন হলে তিনি প্রস্তুত আছেন। তাঁদের গাঁয়ের বাড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ।' তারপর মনসুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কর্নেলের মত সজ্জন লোক মারা গেলেন যুদ্ধে—আর বেঁচে রইল ডাকাতরা।' তারপর বিড়বিড় করে স্কুলপাঠ্য বই থেকে বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করলে, "তন্বঙ্গী কুমারী লজ্জা নিবারণের ট্যানা নেই বলে বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না, আর ওদিকে বড়লোকের কুকুর মখমলের বিছানায় শুয়ে আছে। হে সংসার, আমি তোমার মুখের উপর থুথু ফেলি।"

আমি কি বলব, কি ভাবব। মনসুরের দার্শনিক কাব্যাবৃত্তি আমার ভালোও

লাগে নি মন্দও লাগে নি।

মনসুর শেষ কথা বললে, 'কিন্তু দেখুন হুজুর কর্নেলের স্ত্রী ভেঙে পড়েন নি।'

আমি গুরু সে শিষ্য।

মনে নেই, হয়তো কোনও দিন ক্লাসে চরিত্রবল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলুম।

আব্দুর রহ্‌মান বাড়ি ফেরে নি।

কাবুল নদীর পোলের উপর তার সঙ্গে দেখা। গায়ে ওভারকোট নেই। বাকি জামা-কাপড় টুকরো টুকরো। মনসুর তার সঙ্গে কথা বললে। বলার শোনার কিছু নেই। আব্দুর রহ্‌মান দশটা দিনেক ওই জনসমুদ্র মন্থন করেছে। গালে, বাজারে, হাটের কাছে জপমগ্ন তার দেখতে পেলুম। কোনও গতিকে পা টেনে টেনে চলে আসছিল। কিছুতেই বাড়ি যেতে রাজী হল না।

আর্কের সামনে দু-টি একটি লোক। সেখানে মার্শাল ল। পাঁচজনের বেশি একত্র দেখলে সান্ত্রীদের গুলি চালানোর হুকুম। জায়গাটা এখন প্রায় ফাঁকা।

আব্দুর রহ্‌মান মনসুরকে বললে, 'হুজুরকে বলুন, এ জায়গার সব তন্ন তন্ন করে দেখেছি। এই পেয়েছি।'

তাকিয়ে দেখি আমার পাঞ্জাবির—আমারই হবে—এক পাশের ছেঁড়া কাপড়ের সঙ্গে একটি পকেট। এদেশে এরকম সাইড পকেটওয়ালা পাঞ্জাবি হয় না। এটা শব্‌নম আমার কাছ থেকে নমুনা হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল, একদিন ওইটে আমার ঘরে পরেছিল।

এইটে পরেই কি সে আর্কে এসেছিল?

দয়াময়, দয়া কর।

অনেকক্ষণ পর মনসুর মৃদুস্বরে ফের শুধালে, 'কোথায় যাবেন, হুজুর।'

'তোমার বাড়ি।'

ভারি খুশি হয়ে বললে, 'তাই চলুন হুজুর।' আমি তাকে খুশি করার জন্য প্রস্তাবটি করি নি। তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। নেমক-হারামী? হ্যাঁ। কিন্তু আমি একা, একবার নিজের সঙ্গে একা হতে চাই।

আব্দুর রহ্‌মানকে নিয়েও বিপদ। শেষটায় যখন বললুম, কর্নেলের ছেলেকে বসিয়ে রাখার হক্ক আমাদের নেই—তার মা ওদিকে হয়তো ব্যাকুল হচ্ছেন তখন সে রাজী হল। বাড়িতে ঢোকবার সময় হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটল। কেন? হায় রে! যদি বীবী সায়েবা ওই বাড়িতে ওঠেন!

মনস্থর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, সে জানে, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নি। আগের রাত্রে কতখানি খেয়েছিলুম, সে পাশে বসে দেখেছে— সে তো বরের খাওয়া!

তার প্রত্যেকটি কথা আমার বুকে বিঁধছিল। কেন সে কাল রাত্রের কথা আমাকে স্মরণ করায়? আমি বললুম, 'বাবা, আমি এখন কিছু খেতে গেলে বমি হবে।'

কোথায় যাই? কোথায় সন্ধান করি? কোথায় গেল সে? একটা মানুষ কি করে হঠাৎ অদৃশ্য হতে পারে? কেন দেখা দিচ্ছে না? জাব্বরকে খুন করল কাদের ভয়ে? খবর পাঠাচ্ছে না কেন? আমাকে জড়াতে চায় না বলে। কিংবা—কিংবা—না, না, আমি অমঙ্গল চিন্তা করব না।

এই দুপুর রাত্রে কার কাছে গিয়ে আমি সন্ধান নিই? কড়া নাড়লে তো কেউ দরজা খুলবে না। নিশ্চয়ই ডাকাত—বাচ্চার ডাকাত। গৃহস্থ গুলি ছুড়তে পারে। তো ছুড়ুক।

মাত্র একটি প্রাণীর কথা মনে পড়ল। শব্‌নম বিয়ের রাতে বলছিল—না পরে?—'আমার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে—যে তার সখীদের সে ভুলে গিয়েছে। তখন একজনের নাম ও করেছিল। সে-ই তা হলে সব চেয়ে তার প্রিয় সখী। বাড়িটা আবছা-আবছা চিনি—স্বামীর নাম থেকে। তখন শুনেছিলুম কান না দিয়ে। সেখানেই যাই। আর্কের অতি কাছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আশ্রয় নিতে হলে সে-ই তো সবচেয়ে কাছে।

আর্কের কাছে এসেছি। ক্লান্তিতে পা দু'খানা অবশ হয়ে এসেছে—না শীতে। হঠাৎ মনে হল, শব্‌নম যদি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে থাকে? হে খুদা! পাগলের মত ছুটলুম বাড়ির দিকে।

বাড়ি থেকে আবার বেরিয়েছি। কেউ ছাড়তে চায় নি। জানেমন্ শুধু বলেছিলেন,—'বে-ফায়দা, বে-ফায়দা!' কিন্তু ঠেকাবার চেষ্টা করেন নি।

বাঁচালে। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। রাত কটা হল? ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি। চাঁদটা কাল রাতের কথা বড্ড বেশি স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন আমার আপন মন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে কিছু কসুর করছে!

কাবুলে দিনদুপুরেও অপরিচিতজনকে কেউ কোনও বাড়ি বাতলে দেয় না। কে জানে তুমি কে? হয়তো রাজার গুপ্তচর তার বিপদ ঘটাতে এসেছে! বন্ধুজন যদি হবে তবে তো বাড়ি তোমার চেনা থাকার কথা।

এ-রাস্তা আবার ডাকু। বেধড়ক লুটপাট হচ্ছে। তার উপর রাত দুপুর। তিনটেও হতে পারে।

তবু বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলুম। দরজাও খুলেছিল।

শব্‌নমের নববর গভীর রাতে নিজের থেকে এসেছে—যার সঙ্গে কোনও চেনা-শোনা নেই। আনন্দোল্লাস হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরা আর সব খবর ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। শোকে আনন্দে মিশিয়ে তারা আমাকে যা অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সে-রকম ধারা অপরিচিতের বাড়িতে কেউ কখনও পায় আমি কল্পনাই করতে পারি নি। মুরুব্বীরা কেমন যেন অপরাধীর মত ম্লান হাসি হেসে আমাদের একা রেখে চলে গেলেন। সখীর স্বামী বয়সে কম হলেও বিচক্ষণই লোক। আমাকে সখী—গুল্‌-বদন বানুর কাছে বসিয়ে কি একটা অছিলা করে উঠে গেলেন।

সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি—শাস্ত্রে নিশ্চয়ই বারণ—তবু সে আমাকে একা পাওয়া মাত্রই আমার হাত দু'খানা নিজের হাতে তুলে চোখে ঠেকিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিয়ে সে কত সুখস্বপ্ন দেখেছিল সে-কথা বলতে বলতে বার বার তার গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আর কখনও বা হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

'কোথায় যেতে পারে? তাকে কে না স্থান দেবে? কিন্তু আমার বাড়িতে না এসে সে অন্য কার বাড়িতে যাবে? আমার শ্বশুর তার জ্যেঠার বিশেষ বন্ধু।'

হঠাৎ তার কি খেয়াল গেল জানি না। বলে উঠল, 'তাই হয়তো হবে, হ্যাঁ, তাই।' যেন আপন মনে চিন্তা করছে। আমি কোনও কথায় বাধা দিই নি। পাছে সামান্যতম কোনও দিক্‌নির্দেশ তারই ফলে কাটা পড়ে যায়, এবং পরে সেটা তার স্মরণে না আসে।

বললে, 'তাই বোধ হয় সে তার অতি অল্প চেনা কোনও লোকের বাড়িতে গিয়েছে।' একসঙ্গে দু'জনাতে বলে উঠলুম, 'তাহলে খোঁজ নেব কোথায়?'

গুল্‌-বদন বানুর শোক, দুশ্চিন্তা উদ্বেগের গভীরতা আমার ভাগ্য নিপীড়নের কাছে এসে দাঁড়াল যেন একাত্মদেহ সখার মত। এ তো সান্ত্বনা নয়, প্রবোধ-বাণী নয়, এ যেন আমার হয়ে আরেকজন আমার সমস্ত দুর্ভাবনা আপন কাঁধে তুলে নিয়ে দূর দুরান্তে তাকিয়ে দেখছে, কোথায় গিয়ে সে ভার নামানো যায়।

'কিন্তু খবর পাঠাচ্ছে না কেন? ধরা পড়ার ভয়ে, সুযোগ পায় নি বলে। কেউ তাকে আটকে রেখে সুযোগ দিচ্ছে না বলে?'—আপন মনে গুল্‌-বদন বানু কথা বলে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার হাত দু'খানা আপন হাতে তুলে নিচ্ছে।

'এই আমাদের প্রথম দর্শন—আর শব্‌নম কাছে নেই।'

এবার সে কেঁদে ফেললে।

তার স্বামী আপন হাতে খুঞ্চায় করে রুটি-গোস্ত নিয়ে এসেছেন। চাকরের মত হাত ধোবার জাম-বাটি ধারাযন্ত্র নিয়ে এলেন তারপর। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ওঁকে শান্ত করবে, না, তুমিই ভেঙে পড়ছ।' অতি শান্তকণ্ঠে, কোন অনুযোগ না করে।

আমি বললুম, 'আমার বমি হয়ে যাবে।'

সেই কণ্ঠেই বললে, 'তা যাক্। যেটুকু পেটে রইবে সেইটুকুই কাজে লাগবে।'

পাশে বসে বাঁ হাত দিয়ে পিঠে হাত বুলতে বুলতে ডান হাত দিয়ে খাবার মুখে তুলে দিয়েছিলেন। গুল্-বদন সামনে এসে হাঁটু গেড়ে খাড়া গোড়ালির উপর বসে সামনে তোয়ালে ধরে দাসীর মত সেবার অপেক্ষা করছিল।

এরা বড়লোক। সেবা করার সুযোগ পেলে এরা জন্মদাসকে হার মানায়

আমি বললুম, 'এবার উঠি।' আমার সব শোনা হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে গুল্-বদন বাঁ জানুর উপরে কাগজ রেখে পরিষ্কার গোটা-গোটা অক্ষরে শব্‌নমের সম্ভব-অসম্ভব সব পরিচিতদের ফিরিস্তি তৈরী করেছেন। স্বামী মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করলেন। গুল্-বদন বার বার আমাকে বললে, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। এসব জায়গায় আমার শওহর—স্বামী—যাবেন।' তার স্বামী স্বল্পভাষী। বললেন, 'এ বাড়িতে আমার কোনও কাজ নেই। আমি ছোট ছেলে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার কোনও ত্রুটি হবে না। আমানুল্লার পরিত্যক্ত যেসব সত্যকার ভালো গোয়েন্দা ছিল তারাই আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কঠিন কাজ। আমি শব্‌নম বীবীকে চিনি। তিনি যদি মনস্থির করে থাকেন কেউ যেন তাঁর খবর না পায়, তবে তিনি এমনই পরিপাটিরূপে সেটা করবেন যে সে গিঁট খোলা বড় কঠিন হবে।'

আমি ধন্যবাদ জানাই নি। উঠে দাঁড়ালুম। গুল্-বদন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ রাতে আপনি কোথায় যাবেন? ঝড় উঠেছে।'

তার স্বামী বললেন, 'চলুন।' চকমেলানো বাড়ির চত্বরে নামতে দেখি, উপরের বহু ঘরে আলো জ্বলছে। মুরুব্বীরা জেগে আছেন।

চত্বরেই বুঝলুম ঝড় কত বেগে চলেছে। যদিও চতুর্দিক তিনতলা ইমারতে ইমারতে নিরন্ধ্র বন্ধ।

দেউড়ি খুলতেই আমরা ব্লিজার্ডের ধাক্কায় পিছিয়ে গেলুম। বরফের সাইক্লোন:

সামনে এক বিঘতও দেখা যায় না।

স্বামী বললেন, 'আপনি না দেখলে বিশ্বাস না করে ঘরের ভিতর শুধু ছটফট করতেন। এবারে চলুন। ঘরে গিয়ে আলো নেবাই। না হলে মুরুব্বীরা জেগে রইবেন।'

প্রথম আঘাতে মানুষ বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর আসে ভাগ্যবিধাতার উপর দিগ্বিদিক্‌শূন্য অন্ধ ক্রোধ। তারপর নির্জীব অসাড়তা।

কিন্তু সে জাড্যে নিদ্রা আসে না।

দেশের মেঘলা ভোর তবু বোঝা যায়। এ দেশে বরফের ঝড়ের পিছনে সূর্যোদয় পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত ষড়যন্ত্রযোগে অনুভব করতে হয়।

ওরা বাধা দেয় নি। ঝড় থেমেছে কিন্তু যেভাবে একটানা বরফ পড়ছে তার ভিতর আমি কিছুতেই বাড়ির পথ খুঁজে পেতুম না। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, পথপ্রদর্শক আমাকে ঠিক উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য! এমন জিনিসও মানুষ এসময় ভোলে। গুল্-বদনের ফিরিস্তি সঙ্গে আনি নি!

আমি কোথায় পৌছলুম?

## ॥ তিন ॥

বিরহের দিনে শব্‌নম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।' আমি তার সে আদেশ পালন করেছি। বিধাতা ঘাড় ধরে করিয়েছিলেন।

যখন চিরন্তন মিলনের সুখ স্বপ্ন সে দেখেছিল তখন সে বলেছিল—ওই তার শেষ কথা এখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—'তুমি আমার মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না।' এ কথা স্মরণ হলে ভাগ্য-বিধাতার মুখ ভেংচানি দেখতে পাই।

কিন্তু শব্‌নম তার কথা রাখে নি। সে তার শেষ আদেশ দিয়ে গিয়েছিল, আমি যেন বাড়িতে থাকি, সে ফিরে আসবে। সে আসে নি।

ক' বছর হল, আব্দুর রহমান?

কাবুল শহর আর তার আশপাশের গ্রামে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। লিগেশনের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে বার বার পরিষ্কার বললেন, সে আর্কের ভিতর নেই। আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর গুপ্তচর তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। আমার সামনেই তাকে তিনি ক্রস করলেন। এমন সব অসম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন

জিজ্ঞেস করলেন যেগুলো কখনও আমার মাথায় আসত না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, অনুসন্ধানে কণামাত্র ত্রুটি হয় নি।

তার কিছুদিন পর তিনি একজন একজন করে তিনজন চর পাঠালেন। এরা কাবুল শহর ও উপত্যকার সব কটা গ্রাম ভালো করে দেখে নিয়েছে। ওগুলো আমি নিজে অনুসন্ধান করেছি বহুবার। কোনও কোনও গ্রামে আমার আপন ছাত্র আছে। মনসুরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খানা-তালাশী হাট মাঠ তালাশী সব-কিছু করেছে, কিন্তু আমার সামনে আসে নি—মনসুরকে নিষ্ফলতা জানিয়ে গিয়েছে। আমাকে তাদের গ্রামে, তাদের গৃহে অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে দেখে তারা আমাকে কোথায় বসাবে, কি সেবা করবে ভেবে না পেয়ে অভিভূত হয়েছে। তিন শ' বছর আগে ভারতবর্ষে গুরু তার শিষ্যগৃহে অযাচিত আগমন করলে যা হত এখানে তাই হল। তারও বেশি। গুরুপত্নীর অনুসন্ধানে গাফিলি করবে এমন পাষণ্ড আফগানিস্থানে এখনও জন্মায় নি। লিগেশনের সব ক'জন চরই একবাক্যে স্বীকার করলে তারা এমন কোনও জায়গায় যেতে পারে নি যেখানে আমি এবং আমার চেলারা তাদের পূর্বেই যায় নি।

এত দুঃখের ভিতরও মনসুর একদিন একটি হাসির কথা বলেছিল। তার ক্লাসের সব চেয়ে দুর্দান্ত ছেলে ছিল ইউসুফ। মনসুর বললে, 'এই কাবুল উপত্যকার প্রথম চোর, প্রথম নাসপাতি—তা সে যেখানেই থাকুক না কেন—খায় ইউসুফ! শবনম বীবী ইউসুফের আড়ালে বেশিদিন থাকতে পারবেন না। এ শহরের সব ছুঁদে ছেলের সর্দার সে-ই। ওদের নিয়ে সে লেগেছে। কোন বাড়িতে কে বীবীকে লুকিয়ে রাখতে পারবে আর ক'দিন?'

আমি শুধালুম, 'আর সবাই আমাকে দেখতে এল, সে এল না?'

'সে বলেছে খবর না নিয়ে সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।'

আমি যে অবস্থায়, তখন আমার কাছে সম্ভব অসম্ভব কোনও পার্থক্য নেই। তবু জানি, উপত্যকার বাইরে এখন কেউ যেতে পারে না, এবং বাইরের লোক আসতে পারছে না বলেই খাওয়া-দাওয়ার অভাবে গরীব দুঃখীদের ভিতর দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছে। সিগারেট তো কবে শেষ হয়েছে ঠিক নেই—চালান আসে হিন্দুস্থান থেকে—এ বাড়ি ও বাড়িতে তামাকের জন্য হাত পাতা-পাতি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাবুলের পূর্বদিকের গিরিপথ বরফে সম্পূর্ণ বন্ধ। পশ্চিমের পথে গজনীর ডাকাতরা বসে আছে, বাচ্চা একটু বেখেয়াল হলেই উপত্যকায় ঢুকে

লুটপাট আরম্ভ করবে এবং তারপর শহরের পালা। এই পশ্চিমের পথ দিয়েই আব্দুর রহমান গিয়েছে আওরঙ্গজেব খানকে খবর দিতে। যাবার সময় সে দরবেশের পোশাক পরে নিয়েছিল, এ ছাড়া আর কোনও মানুষ ডাকাতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

উত্তরের পথে বাচ্চা-ই-সকাওর গ্রাম। সে পথে তারই লোকজন ছাড়া কেউ আসা-যাওয়া করে না। দক্ষিণ দিকে পথ নেই, যেটুকু আছে তার উপর কত ফুট বরফ কে জানে!

পুরুষের পক্ষে বেরনো অসম্ভব, দরবেশবেশী আব্দুর রহমানও শেষ পর্যন্ত কান্দাহার পৌঁছবে কি না সে নিয়ে সকলেরই গভীর দুশ্চিন্তা, মেয়েছেলের তো কথাই ওঠে না। এই কাবুল উপত্যকাতেই শবনম আছে, কিংবা—?

রাস্তায় যেতে যেতে একদিন সম্পূর্ণ অজানা লোককে কথা বলাবলি করতে শুনেছিলাম। একজন বললে, 'আওরঙ্গজেব খানের মেয়ে বোধ হয় কোনও বাড়িতে—গ্রামেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি—আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বোধ হয় খুন হয়েছেন।'

অন্যজন শুধালে, 'তাঁকে খুন করবে কেন?'

সে বললে, 'বাচ্চার ভয়ে, জাফরের সঙ্গী-সাথী আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে। ধরা তো পড়বেই একদিন। তখন তার উপায় কী?'

আমি জানতুম বাচ্চা শবনম বীবীর সন্ধানের জন্যে কোনও হুকুম দেয় নি। জাফরের আত্মীয়স্বজনের তার জন্য রক্তের সন্ধানে বেরবার কথা; তারাও বেরোয় নি।

কোন্ ভরসায় তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলুম সে কথা বলতে পারব না। আপন পরিচয় দিয়ে তাদের করজোড়ে শুধিয়েছিলুম, তারা আমাকে কোনও নির্দেশ দিতে পারে কি না? দু'জনাই অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বার বার মাফ চেয়ে বললে, তারা সত্যই কোনও খবর জানে না—চা-খানায় আলোচনার খেই ধরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল মাত্র। দ্বিতীয় লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিকবার বললে, 'আমার বাড়িতে যদি কোনও মেয়েছেলে একবার ঢুকে আশ্রয় নিতে পারে, তবে আমি খুন না হওয়া পর্যন্ত তার দেখ-ভাল করব।'

কোনও খবরের সন্ধানে মানুষ এ-দেশে যায় সরাইয়ে কিংবা বড়বাজারে। বাজার বন্ধ। সরাইয়ে নূতন লোক তিন মাস ধরে আসে নি। পুরনোরা আটকা পড়ে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাচ্ছে। সরাইয়ের মালিক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত

হওয়া সত্ত্বেও আমাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করলে। বললে, 'ইউসুফ প্রায়ই এসে খবর নেয় নূতন কোনও মুসাফির কোনও দিক দিয়ে শহরে ঢুকতে পেয়েছে কি না। ওকে আমরা সবাই খুব ভাল করে চিনি। আগে এলে আমাদের ভিতর সামাল সামাল রব পড়ে যেত। এখন এসে একবার সকলের দিকে তাকায়, নূতন কেউ এসেছে কি না আমাকে দু' একটি প্রশ্ন শুধায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে যায়। এই যে আমার চত্বরে বরফজল জমেছে, আগে হলে ইউসুফ স্কেটিং করে করে এখানে পুরো দিনটা কাটিয়ে দিত।'

আমি তাকে শুধালুম, 'তার কি মনে হয়, শব্‌নম কোথায়?'

অনেক চিন্তা করে বললে, 'দেখুন, আমি সরাই চালাই। তার পূর্বে আমার বাবা সরাই-ই চালাতেন। আমার জন্ম ওই উপরের তলার ছোট্ট কুঠরিতে। চোর-ডাকু, পীর-দরবেশ, ধনী-গরীব দুবদরাজের মুসাফিরদের উপর কড়া নজর রেখে তাদের দেখ-ভাল করে আমার দাড়ি পাকল। আমাকে সব খবরই রাখতে হয়। আমি অনেক ভেবেছি। এই সরাইয়ে শীতের রাতে আগুনের চতুর্দিকে বসে দুনিয়ার যত গুণী-জ্ঞানী ঘড়েল-বদমাশরা এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে, কিন্তু সবাই হার মেনেছে।'

তারপর অনেকক্ষণ ভেবে বললে, 'একমাত্র জায়গা কোনও দরবেশের আস্তানা। সেখানে অনেক গোপন কুঠরি গুহা থাকে। রাজনীতির খেলায় কেউ সম্পূর্ণ হার মানলে হয় পালায় মক্কা-শরীফে—সময় পেলে—না হয় আশ্রয় নেয় দরগা-আস্তানায়।'

আমি প্রত্যেক আস্তানায় একাধিকবার গিয়েছি।

আবার ভেবে বললে, 'তা-ই বা কি করে হয়? বয়স্ক লোকদের ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু বাচ্চাদের কাছ থেকে কোনও জিনিস গোপন রাখা অসম্ভব। ইউসুফ যখন লেগেছে তখন—? না, সে হয় না। আপনিও প্রত্যেক দরগায় গিয়েছেন। পীর দরবেশরা অন্তত আপনাকে তো গোপন খবরটা দিয়ে আপনার এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেন। দরবেশও তো মানুষ। দরবেশ হলেই তো হৃদয়টা আর খুইয়ে বসে না।'

বিদায় দেবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বার বার সহৃদয় নিশ্চয়তা দিলে, যে-কোনও সময়ে কোনও দিকে যদি সে খবর পায় তবে নিজে এসে আমায় খবর দিয়ে যাবে।

জীবনই অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতাই জীবন। অভিজ্ঞতাসমষ্টির নাম জীবন আর জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে এক-একটি অভিজ্ঞতা। এক-একটি অভিজ্ঞতা যেন এক এক ফোঁটা চোখের জলের রুদ্রাক্ষ। সব কটা গাঁথা হয়ে যে তসবী-মালা হয় তারই নাম জীবন।

একটি অক্ষ দিয়েই আমার সম্পূর্ণ মালা।

সেই অক্ষবিন্দুতে দেখলুম প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বহু জনের মুখ। এরা কেন এত দরদী? এদের কী দায়, আমি শব্‌নমকে খুঁজে পেলুম কি না? আল্লা আমাকে মারছেন। তাই দেখে তো ভয় পেয়ে এদের উচিত আমার সঙ্গ বর্জন করা। কই, তারা তো তা করছে না! হাঁ, হাঁ, মনে পড়ল এদের এই অঞ্চলের একটি কাহিনী :—

বাচ্চারা পেয়েছে বাদাম। ভাগাভাগি নিয়ে লেগেছে ঝগড়া। পণ্ডিত নসর উদ্‌দীন খোজা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে করতে আল্লার প্রশংসাধ্বনি (হাম্‌দ্‌) উচ্চারণ করছিলেন। ছেলেরা তাঁকে মধ্যস্থ মানলে ভাগ-বখরা করে দেবার জন্য। তিনি হেসে শুধালেন, 'আল্লা যে-ভাবে ভাগ করে দেয় সেই ভাবে, না মানুষের মত ভাগ করে দেব?' বাচ্চারাও কিংবা বলব বাচ্চারাই আল্লার গুণ মানে বেশি, সমস্বরে বললে, 'আল্লার মত।'

খোজা কাউকে দিলেন পাঁচটা, কাউকে দুটো, কাউকে একটাও না। বাচ্চারা অবাক হয়ে শুধালে, 'একি? একে কি ভাগ করা বলে?' খোজা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখ, আল্লা মানুষকে কোনও-কিছু সমান সমান দিয়েছেন কি না। সে-রকম সমান ভাগাভাগি শুধু মানুষই করে।'

তাই বুঝি করুণাময় আমার প্রতি অকরুণ হয়েছেন দেখে মানুষ সেটা সহানুভূতি দিয়ে পুষিয়ে দিতে চায়। তাই বুঝি তিনি যখন বিধবার একমাত্র শিশুকে কেড়ে নেন তখন স্বপ্নদেবী তাকে বার বার মা-জননীর কোলে তুলে দেন। তাই বুঝি সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিতে বার বার অসম্পূর্ণতা রেখে দেন—মানুষ যাতে করে সেটাকে পরিপূর্ণ করে তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু আমার গুরু, আমার একমাত্র সাহেব. মুহম্মদ সাহেব যে বার বার বলেছেন, তিনি আল্লার পরিপূর্ণতা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন, শঙ্কর যে বলেন তিনিই পরিপূর্ণ সত্য, অন্য সব মিথ্যা—তার কী?

আমার এই দুঃসহ বিরহ-ভার আর অসহ অনিশ্চয়তা?

মিথ্যা।

মানলুম। কিন্তু এই যে এতগুলো লোকের অন্তরের দরদ তাদের ক.ায় ভাষায়, তাদের চোখের জলে টলটল করছে?

মিথ্যা।

মানি নে। আল্লা যদি তাঁর পরিপূর্ণতা কোনও জায়গায় প্রকাশ করে থাকেন তবে সেটা দরদী হৃদয়ে। সৃষ্টির সঙ্গেকার সেই প্রাচীন কথা আজ কি আমাকে নূতন করে বলতে হবে, 'বরঞ্চ আল্লার মসজিদ ভেঙে ফেল কিন্তু মানুষের হৃদয় ভেঙো না।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, বাসর রাতে লায়লী-মজনূ কাহিনী শেষ করেছিল শব্নম ওই কথা বলে, পরমেশ্বর এ সংসারে স্বপ্রকাশ হয়েছেন একটিমাত্র রূপে—সে প্রেমস্বরূপ।

আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরেছিলুম।

জানেমনের ঘরে শব্নমের সখী।

তিনি বললেন, 'সেই ভালো। ওকে নিয়ে যাও সুফী সাহেবের কাছে।'

পাগলকে মানুষ নিয়ে যায় সাধুসন্তদের কাছে। আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি?

সখীর বর সঙ্গে চললেন। সখী অনুযোগের সুরে বললে, 'কোথায়; না তুমি জ্যোতিহীন বৃদ্ধ চাচাশ্বশুরের সেবা করবে, না তিনি তোমার চিন্তায় ব্যাকুল।'

স্বামী বললে, 'থাক্ না এসব কথা।'

এই প্রথম একটি লোক পেলুম, যিনি আমাদের কথা কিছুই জানেন না।

সব কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার চাচাশ্বশুর জানেন না, এমন কি কথা আমার আছে যা তোমাকে আমি বলব? তিনি সংসারে থেকেও বৈরাগী। তিনি 'সুফ' ( পশম ) না পরলেও সুফী।'

আমি অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললুম, 'তিনি আমাকে কিছু বলেন নি।'

বললেন, 'তিনিই বা বলবেন কী, আমিই বা বলব কী? আমরা যা-কিছুই বলি না কেন, তুমি তো সেটা বোঝবার চেষ্টা করবে তোমার মন দিয়ে। সেই মন কী, তুমি তাকে চেন? এ যেন একটা কাঠি দিয়ে কাপড় মেপে দেখলে বারো কাঠি হল। যদি সেই কাঠিটা কতখানি লম্বা সেটা তোমার জানা না থাকে তবে কাপড় মেপে বারো বার না বাইশ বার জেনে তো লাভ হল না। নিজের মন

হচ্ছে মাপকাঠি। সেই মনকে প্রথম চিনতে শেখ।'

সখী বললে, 'সে মন চেনা যায় কী প্রকারে?'

সূফী সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম।

বললেন, 'মনকে শান্ত করতে হবে। বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে বনানী প্রতিবিম্বিত হয় না।'

আমি শুধালুম, 'আরম্ভ করতে হবে কী করে?'

কণামাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'সূফী-রাজ ইমাম গজ্জালী সকল সূফীদের হয়ে বলেছেন, "মন্দ আচরণ থেকে নিজেকে সংহত করে, বাহ্য জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, নির্জনে চক্ষু বন্ধ করে, অন্তর্জগতের সঙ্গে আত্মার সংযোগ স্থাপন করে, হৃদয় থেকে আল্লা আল্লা বলে তাকে স্মরণ করা।" '

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি এখন আল্লার উপর বিরূপ। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বিরূপ ভাব তাঁর প্রেমকে ছাড়িয়ে যেতে পারে—এ তার দম্ভ। কিন্তু সে-কথা এস্থলে অবান্তর। তুমি সে 'দকে মন দিতে চাও না, তবে আপন আত্মার দিকে সমস্ত চৈতন্য একাগ্র কর। সেই আত্মা—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত। হদীসে আছে, "মন্ অরফা নফ্‌সহু ফকদ্ অরফা রব্বাহু।" যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে।'

আরেক বার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল।

'মন সর্বক্ষণ অন্য দিকে যায়? তাতেই বা ক্ষতি কী? যাকে তুমি ভালবাস তার সঙ্গে যদি একাত্ম দেহ হয়ে গিয়ে থাক তবে নিজের আত্মার দিকে, না তার দিকে মন রুজু করেছ তাতে কী এসে-যায়। সে তো শুধু নামের পার্থক্য।'

বেদনা আমার জিহ্বার জড়তা কেটে ফেলেছে। বললুম, 'একাত্ম দেহ হতে পারলে তার বিরহে বেদনা পেতুম না, তার চিন্তা অসহ্য হত না।'

গভীর সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় নেই। ঠিক পথে চলেছ। একাধিক সূফী বলেছেন, আল্লার দিকে মন যাচ্ছে না আত্মার দিকে মন যাচ্ছে না—? না-ই বা গেল। তোমার কাছে সব চেয়ে যা প্রিয় তাই নিয়ে ধ্যানে বস। সে যদি সত্যই প্রিয় হয় তবে মন সেটা থেকে সরবে কেন?—আর মূল কথা তো মনকে একাগ্র করা, অর্থাৎ মনকে শান্ত করা।

'আসলে কী জান, মন গঙ্গাফড়িঙের মত। খনে সে এদিকে লাফ দেয়, খনে ওদিকে লাফ দেয়। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে চায় না। কিংবা বলতে

পার, কাবুল উপত্যকার চাষার মত ছায়ায় জিরোচ্ছে, কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতে-যেতেই রৌদ্রে গিয়ে কাজ করছে, ফের ছায়ায় ফিরে আসছে, ফের রৌদ্র ফের ছায়া।

'তার গায়ে জ্বর—তোমার মত। তাকে এক নাগাড়ে সমস্ত দিনই ছায়ায় শুইয়ে রাখতে হবে। তবে ছাড়বে তার জ্বর।

'তোমার মন হবে শান্ত।'

সুফী সাহেব থামলেন। আমি সব-কিছু ভুলে গিয়ে শুধালুম, 'তারপর?'

ইচ্ছে করে অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'তার পর আর কি বাকী রইল? তখন মালিক যা করার করবেন। তুমি তখন শান্ত হলে—মালিক তাঁর ছায়া ফেলবেন। তোমার অজ্ঞেয় অগম্য কিছুই থাকবে না।'

হেসে বললেন, 'তাঁকে তো কিছু-একটা করবার দিতে হয়। সব দুর্ভাবনা কি তোমার?'

আমি সেই পুরাতন প্রশ্ন শুধালুম, যে প্রশ্ন আজ বীর, বহুকাল ধরে মনে জেগে আছে—'বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা যখন চিন্তা করি, কল্পনাতীত অন্তহীন দূরত্বের পিছনে বিরাটতর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ যখন বৈজ্ঞানিকেরা দেয় তখন ভাবি, আমি এই কীটের কীট, আমার জন্য আর কে কতখানি ভাবতে যাবে?'

সুফী সাহেব বললেন, 'সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমার উপর।

'এই যে কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বললে—তুমি কল্পনা কর না কেন, তিনি আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তা হলেই তো তিনি সম্পূর্ণ একটা ব্রহ্মাণ্ড তোমার—একমাত্র তোমারই—দেখাশোনার জন্য মোতায়েন করতে পারেন। তা হলেই দেখতে পাবে লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা-দেবদূত তোমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব রাখছেন হাজার হাজার দেবদূত, তোমার প্রতিটি হৃদস্পন্দনের খবর লিখে রাখছেন লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা। আর তুমি যদি কল্পনা কর তোমার খুদা মাত্র দশটা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তা হলে অবশ্য তুমি অসহায়।

'কিন্তু তিনি তো অনন্ত-রাজ। সংখ্যাতীতের মালিক।

'কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড চাও, একমাত্র তোমারই তদারকি করার জন্য?'

আমি অভিভূত হয়ে তাঁর কথা শুনে যাচ্ছি এমন সময় তিনি আমাকে যেন সর্বাঙ্গ ধরে দিলেন এক ভীষণ নাড়া। বললেন, 'কিন্তু এ সব কথা বৃথা, এর কোনও মূল্যই নেই। কারণ গোড়াতেই বলেছি, আপন মনকে না চিনে সেই মন দিয়ে কোনও কিছু বোঝার চেষ্টা করা বৃথা। তার প্রমাণস্বরূপ দেখতে পাবে, বাড়ি

পৌঁছতে না পৌঁছতেই তোমার গাছতলার ছায়ার চাষা আবার রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করছে—তোমার মন আমার কথাগুলোর দিকে আর কান দিচ্ছে না। এবং এগুলো আমার কথা নয়—বড় বড় সূফীরা যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি আমি করেছি মাত্র।'

আমি নিরাশ হয়ে বললুম, 'তা হলে উপায় ?'

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'মনকে শান্ত করা। আর ভুলে যেয়ো না, সাধনা না করে কোন-কিছু হয় না। পায়লোয়ানের উপদেশ পড়ে মাংসপেশী সবল হয় না, হেকিমীর কেতাব পড়ে পেটের অসুখ সারে না। মনকেও শান্ত করতে হয় মনের ব্যায়াম করে।

'আর ঠিক পথে চলেছে কি না তার পরখ—প্রতিবার সাধনা করার পর মনটা যেন প্রফুল্লতর বলে মনে হয়। ক্লান্তি বোধ যেন না হয়। পায়লোয়ানরাও বলেছেন, প্রতিবার ব্যায়াম করার পর শরীরটা যেন হাল্কা, ঝরঝরেবলে মনে হয়।

'না হলে বুঝতে হবে, ব্যায়ামে গলদ আছে।'

আমাদের সামনে হালুয়া ধরে বিদায় দিলেন।

আমরা আসন ছেড়ে উঠেছি এমন সময় তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, তোমার একটি আচরণে আমি খুশি হয়েছি। গ্রামের চাষা তিন মাস রোগে ভুগে শহরে এসে হেকিমের কাছ থেকে দাওয়াই নিয়েই শুধায়, "কাল সেরে যাবে তো ?"—তুমি যে সে-রকম শুধাও নি, "ফল পাব কবে ?"

'ফল নির্ভর করে তোমার কামনার দৃঢ়তার উপর। দিল্‌কে একরুজু করে যদি প্রাণপণ চাও, তবে দেখবে নতীজা নজ্‌দিক্‌—ফল সামনে।'

ধর্মে ধর্মে তুলনা করার মত মনের অবস্থা আমার তখন নয়। তবু মনে পড়ে গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গুরুকে শুধিয়েছিলুম, 'অনায়াসে সংস্কৃত কাব্য পড়তে পারব কবে ?' তিনি বলেছিলেন, ' "তীব্র সংবেগানাম্‌ আসন্নঃ" অর্থাৎ "আবেগ তীব্র থাকলে ফল আসন্ন।" '

তারপর বলেছিলেন, 'শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই এটা প্রযোজ্য—পতঞ্জলি বলেছেন 'যোগসূত্রে', সাধনার ক্ষেত্রে।'

## ॥ চার ॥

আমার মন শান্ত হয় নি, অশান্তও থাকে নি। আমার মানস সরোবরের জল-জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

ওদিকে কাবুলের বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। কাবুল উপত্যকার উত্তর-পূব-পশ্চিম গিরিপথে সঞ্চিত পর্বত প্রমাণ তুষারস্তূপও গলতে আরম্ভ করেছে। এবার জনগণের গমনাগমন আরম্ভ হবে। যে সব পণ্যবাহিনী এখানে আটকা পড়েছিল তারা হন্যে হয়ে উঠেছে গন্তব্যস্থলে পৌছবে বলে। কাবুল উপত্যকার বাইরে যারা আটকা পড়েছিল তারাও যে-করে হোকই শহরে ঢোকবার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতিরও মরসুম গরম হয়ে উঠবে। বাচ্চার বাহুবল কাবুল উপত্যকার বাইরে সম্প্রসারিত নয়। কাজেই দু'দলে লড়াই লাগবে মোক্ষম। তার কারণ দেশের ডাকাত আর বণিকে তফাত কম। যে দু'দিন পূর্বে বণিক ছিল সে কিছুটা পয়সা জমিয়ে ডাকাতের দল গড়েছে। আবার যে দু'দিন পূর্বে ডাকাত ছিল সে কিছুটা পয়সা করে আজ পণ্যবাহিনী তৈরি করেছে এবং এর পরও অন্য এক শ্রেণীও আছে। এরা দুটো একসঙ্গে চালায়। পণ্যবাহিনী নিয়ে যেতে যেতে সুযোগ পেলে ডাকাতিও করে।

কিন্তু এ সবেতে আমার কী ?

আমার স্বার্থ মাত্র এইটুকুই—কাবুল উপত্যকা তো তন্ন তন্ন করে দেখা হয়ে গিয়েছে। এবার যদি বাইরের থেকে কোনও খবর আসে।

আব্দুর রহ্‌মান এখনও কান্দাহার থেকে ফেরে নি। তার থেকেই আমার বোঝা উচিত এখনও গমনাগমন অসম্ভব।

জানেমনের সেবা করতে গিয়ে বার বার হার মানি।

তিনি ডান হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকে কি যেন খুঁজলেন। আমি শুধালুম, 'জানেমা (আমাদের জান্), কী চাই ?'

'না বাচ্চা, কিছু না।'

পীড়াপীড়ি করি। নিমকদান—লবণের পাত্র।

শব্‌নম জানত।

তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন; আমি প্রত্যুত্তর দিতে পারি নে।

প্রতি পদে ধরা পড়ে সেবার কাজে আমার অনভ্যাস, অপটুত্ব। অথচ ঠিক সেই কারণেই আমি তাঁর কাছে পেলুম আরও বেশি আদর-সোহাগ। শিশুর আধো-আধো কথা শুনে পিতামাতা যে রকম গদ্‌গদ হয়, আমার আধো-আধো সেবা তেমনি তাঁর হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে যেন বান ডাকালে।

এক রকম লোক আছে যারা সর্বক্ষণ কথা বলে যাওয়ার পর দেখা যায়, তারা

কিছুই বলে নি। অন্য দল সংখ্যায় কম। এদের নীরবতা যেন বাঙ্ময়। এঁরা সেই নীরবতা দিয়ে এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেন যে, শুভ মুহূর্তে সেই ঘন বাষ্পে তাঁরা একটি ফোঁটা বাক্-বারির ছোঁয়াচ দেওয়া মাত্রই আকাশ-বাতাস মুখর করে ঝরঝর ধারে বারিধারা নেমে আসে।

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে আমি তাঁকে শুধালুম, 'আপনি আমার শ্বশুর মশাইকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। আমাকে বলুন তো, তিনি কান্দাহার যাওয়ার সময় বাড়িতে কেন হুকুম রেখে গেলেন, ডাকাতদের যেন কোনও বাধা না দেওয়া হয়?'

জানেমন্ বললেন, 'আওরঙ্গজেব সাধারণ সেনাপতি নয়। প্রকৃত সেনাপতি যে রকম যুদ্ধ জয় করতে জানে, ঠিক সেই রকম জানে কখন আর জয়াশা করতে নেই। সেই সময় সে যতদূর সম্ভব স্বল্প ক্ষয়ক্ষতি হতে দিয়ে সৈন্যবাহিনী রণাঙ্গন থেকে হটিয়ে আনে।

'আওরঙ্গজেব জানত, বাধা দিলে এ বাড়ির কেউই প্রাণে বাঁচবে না। ওদিকে শব্‌নমের উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। এ-সব ব্যাপারে সে যে-কোনও পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, শব্‌নম যদি অল্প কিছুক্ষণ জাফর খানকে আটকে রাখতে পারত তা হলেই তো ততক্ষণে বাচ্চার হুকুম পৌঁছে যেত যে তাকে যেন নিরাপদে আপন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

'সূফীদের অনেকেই তাই পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় বিশ্বাস করেন। সৎকর্ম, অসৎকর্ম, প্রয়োজনীয় কর্ম, অপ্রয়োজনীয় কর্ম যাই কর না কেন, তার ফলস্বরূপ উৎপাদিত হবে নূতন কর্ম—এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকে সেই কর্ম-জিঞ্জির—চেন্-অ্যাকশন। এই কিস্মতের অক্ষমালার কোনও জায়গায় তো গিট খুলতে হবে। না হলে এই অন্তহীন জপমালা তো ঘুরেই যাবে, ঘুরেই যাবে, এর তো শেষ নেই।

'অথচ এ-কথা আমি স্থির-নিশ্চয় জানি, শব্‌নম ঠাণ্ডা-মাথা মেয়ে। ক্ষণিক উত্তেজনায় সংবিৎ হারিয়ে উন্মাদ আচরণ সে করে না। নিশ্চয়ই কোন-কিছু একটা চরমে পৌঁছেছিল।'

আমি চিন্তা করে প্রত্যেকটি বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি এমন সময় দাসীরা কলরব করে ঘরে ঢুকে বললে, একজন বোরকা-পরিহিতা রমণীকে হিন্দুকুশের গিরি উপত্যকায় দেখা গিয়েছে মজার-ই-শরীফের পথে যেতে।

চিৎকার চেঁচামেচির মাঝখানে এইটুকু বুঝতে আমাদের অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল

আনেমন্ নীরব।

আমি তাড়াতাড়ি মনসুরকে চিঠি লিখলুম সে যেন পত্রপাঠ ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে আসে। অন্য লোক পাঠালুম সরাইখানাতে।

কিন্তু শব্‌নম আফগানিস্থানের উত্তরতম প্রদেশ সুদূরতম তীর্থ মজার-ই-শরীফের দিকে যাচ্ছে কেন? প্রাণ রক্ষার্থে? সে কি জানে না জাফর খানের খুনের জন্য বাচ্চা তার খুন চায় না?

ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর মনসুর এল। সহৃদয় সরাইওলাও স্বয়ং এসে উপস্থিত। ইউসুফ আসে নি। খবর পাঠিয়েছে, বহু বোরকাপরা রমণী বন্ধ জীপে একা একা যায়। এ রমণী কিছুতেই শব্‌নম বানু হতে পারেন না। আরও বলেছে, এ রকম গুজব এখন ঘড়ি ঘড়ি বাজারে রটবে—আমি যেন ও সবেতে কান না দিই।

মনসুর বললে, 'ইউসুফ তো আসবে না, পাকা খবর না নিয়ে। আমি এই গুজবটা শুনতে পাই কাল। সঙ্গে সঙ্গে গেলুম সরাইয়ে। তারা খবর পেয়েছে তার আগের দিন। তার পর গেলুম ইউসুফের কাছে। সে বললে, এ খবর পুরনো খবর। মিথ্যে—সে যাচাই করে দেখেছে। তার পর, হুজুর, আমাকে হিসেব করে দেখালে, কাবুল গিরিপথের বরফ গলতে যে সময় লাগে তার আগে মোটর চালিয়ে কেউ হিন্দুকুশ পৌঁছতে পারে না। ও মেয়ে হিন্দুকুশ অঞ্চল থেকেই বেরিয়েছে। আরও অনেক কি সব প্রমাণ দিলে যেগুলো আমি বুঝতেই পারলুম না।

সকলেই এক মত। ও মেয়ে কিছুতেই কাবুল থেকে বেরোয় নি। এর সন্ধান করতে যাওয়া আর চাঁদের আলোতে কাপড় শুকোতে দেওয়া—একই কথা।

আমি সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের যুক্তিহীন তর্ক, এবং তর্কহীন নীরবতা দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব তা সম্ভব হতে পারে বোঝাবার চেষ্টা করলে সবাই এমন সব অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট আপত্তি তুললে যে শেষটায় আমি রেগে উঠলুম। তখন সবাই একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ করে গেল।

আমি আমার আহাম্মুকি বুঝতে পারলুম। এদের না চটিয়ে এদের কাছ থেকে আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল, মজার-ই-শরীফ যাবার জন্য আমার কী প্রস্তুতির প্রয়োজন? এখন যখন শুধালুম, সবাই আশকথা পাশকথা বলতে বলতে বাড়ি চলে গেল।

কান্দাহার থেকে শব্‌নমের কোনও খবর না পেয়ে শেষটায় স্বপ্নে প্রত্যাদেশ ভিক্ষে করেছিলুম, কান্দাহার যাব কি না, আজ রাত্রে ঠিক তেমনি সমস্ত হৃদয় মন ঢেলে

দিয়ে নামাজ পড়লুম মাঝ রাত অবধি। বার বার কাতর রোদনে প্রভুকে বললুম, 'হে করুণাময়, আমাকে দয়া কর, আমাকে দয়া কর।'

সেবারে প্রার্থনান্তে যেন তাঁরই কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলুম, 'কান্দাহার যেয়ো না'—আমার তখন সেটা মনঃপূত হয় নি।

তাই কি করীম-করুণাময় আমাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন তাঁর কাহির-রুদ্ররূপে ?

সমস্ত রাত চোখে এক ফোঁটা নিদ্রা এল না।

সমস্ত দিন কাটল ওই ভাবে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে। ঘুমে প্রত্যাদেশ পাব আশা করে যেই শুতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব নিদ্রার অন্তর্ধান। তিন দিন পর যখন নির্জীব, ক্লান্ত দেহে প্রত্যাদেশের শেষ আশা ছেড়ে দিলুম সেদিন সুনিদ্রা হল। আশা ছাড়লে দেখি ভগবান সমঝে চলেন।

শব্‌নম যে রকম পুব-বাঙলার স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত—যখন-তখন পেশাওয়ার গিয়ে দিল্লি কলকাতা হয়ে পুব-বাঙলায় পৌঁছত, আমিও সে-রকম মজার-ই-শরীফের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতুম। প্রথম দিন সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সত্যই জান না, হজরৎ আলী (কর্রমল্লাহু ওয়াজহাহু—আল্লা তাঁর বদন জ্যোতির্ময় করুন) মারা যান আরবভূমিতে এবং তাঁর গোর সেখানেই! অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকের মত বিশ্বাস কর তাঁর কবর উত্তর আফগানিস্থানে!'

আমি বললুম, 'যেখানে এত লোক তাদের শ্রদ্ধা জানায়, সেখানে না হয় আমি সেই শ্রদ্ধাটিকেই শ্রদ্ধা জানালুম।'

অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, 'তা হলে কাবুলী মুটেমজুর যখন নূতন কোনও সোনা-বানানেওলা গুরুঠাকুর মুর্শীদবাবাজীর সন্ধান পেয়ে তার পায়ের উপর গিয়ে আছাড় খায় তখন তুমিও সেদিকে ছুট লাগাও না কেন? যত সব!'

আমি বললুম, 'মজার-ই-শরীফে কিন্তু ইরান-তুরান-হিন্দুস্থান-আফগানিস্থানের বিস্তর কবি জমায়েৎ হয়ে কবর-চত্বরে সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন—মুশাইরা সেখানে সুবো-শাম্‌।'

সঙ্গে সঙ্গে শব্‌নমের মুখ খুশিতে ভরে উঠল ; 'তাই নাকি? এতক্ষণ বল নি কেন? চল।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল। যেন তদ্দণ্ডেই আমাদের যাত্রারম্ভ!

শব্‌নমের কাছে কল্পনা বাস্তবে কোন তফাত ছিল না। না হলে সে আমাকে ভালোবাসল কি করে?

আসলে আমার লোভ হত, হিউয়েন সাঙ তথাগতের দেশ ভারতবর্ষে যাবার সময় যে পথ বেয়ে মজার-ই-শরীফের কাছের বাহ্‌লীক নগরী—আজকের দিনে বল্‌খ্‌—থেকে বামিয়ানের কাছে হিন্দুকুশ পেরিয়ে কপিশ—আজকের দিনে কাবুল শহর—এসে পৌঁছেছিলেন সেই পথটি দেখার। তখনকার দিনে তুষারভূমি ( আজকের তুখার-স্থান ) পেরিয়ে যখন বৌদ্ধ শ্রমণ বাহ্‌লীকে পৌঁছলেন তখনই তাঁর চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি তাঁর অসহ পথশ্রম সার্থক মেনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন একশত সঙ্ঘারাম, তিন শত স্থবির আর কত হাজার শ্রমণ-ভিক্ষু কে জানে? এরই কাছে কোথায় যেন এক ভারতীয় মহাস্থবির প্রজ্ঞাকরের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অভিধর্ম। আর বামিয়ানে পৌঁছে দেখেছিলেন, তারও বাড়া—হাজার হাজার—সঙ্ঘারাম—পর্বতগুহায়, সমতল ভূমিতে, উপত্যকায়। আর দেখেছিলেন পাহাড়ের গায়ে দণ্ডায়মান, আসীন, শায়িত শত শত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বুদ্ধ-মূর্তি। শ' দুশ' ফিট উঁচু!

তার পর তিনি পঞ্জশীর হয়ে পৌঁছেছিলেন কাবুল উপত্যকায়।

যবে থেকে এখানে এসেছি সেগুলোর সন্ধান করেছি এখানে। এখানে কীর্তিনাশা পদ্মা নদী নেই, এখানে কোনও-কিছুই সম্পূর্ণ লোপ পায় না। নবীন যুগের অবহেলা পেলে এখানে প্রাচীন যুগ মাটির তলায় আশ্রয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে, কবে নবীনতর যুগের লোক শাবল-কোদাল নিয়ে তাদের সন্ধানে বেরবে।

তারও আগের কথা। আমি বাংলাদেশের লোক। হিউয়েন সাঙের ভারততীর্থ-পরিক্রমার সর্বশেষ প্রাচ্য-প্রান্ত ছিল বাংলা। বগুড়ার কাছে মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন বল্‌খ্‌ থেকে হিউয়েন সাঙ—আর কয়েক শতাব্দী পরে সেখানেই আসেন ওই বল্‌খ্‌ থেকে দরবেশ শাহ সুলতান বল্‌খী—কত কাছাকাছি ছিল সেদিনের বল্‌খ্‌ আর বগুড়া।

সেই থেই ধরে ধরে দেখেছি, বিক্রমশিলা, নালন্দা। কাবুলে আসার পথে ট্রেন থেমেছিল এক মিনিটের তরে তক্ষশিলায়। সেখানে নামবার লোভ হয় নি একথা বলব না। তারপর পেশাওয়ার—কণিষ্কের রাজধানী। সেখানেও সময় পাই নি। গান্ধারভূমি জলালাবাদে শুধু আখ খেয়েই চিত্তকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, এই আখ খেয়েই হিউয়েন সাঙ শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন। ভেবেছিলুম পরবর্তী যুগে এই যে আখের গুড় চীনদেশে গিয়ে রিফাইন্‌ড হয়ে শ্বেতবর্ণ ধরে যখন ফিরে এল তখন চীনের স্মরণে এর নাম হল চিনি—তার পিছনে কি হিউয়েন সাঙ ছিলেন? একে উপহাস করেই কি আমাদের দেশে চীনের রাজার আম খাওয়ার গল্প হল?

আজ আবার এই সব কথা মনে পড়ছে। শব্‌নম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত—পুব বাঙলায় তার শ্বশুরের ভিটেয় পৌঁছবার পথে এগুলো পড়ে বলে।

কিন্তু যখন কাবুল ছেড়ে আচ্ছন্নের মত বেরলুম মজার-ই-শরীফের সন্ধানে তখন এসব কিছুই মনে পড়ে নি। কী কাজে লাগবে আমার এই 'পাণ্ডিত্যে'র মধুভাণ্ড। জরা-জীর্ণ অর্ধলুপ্ত বাড়ির নিচে লুকনো যে সোনার তাল আছে সেটা কি তার সামান্যতম উপকারে আসে? ওর শতাংশ' ব্যয় করে বাড়িটা মেরামত হয়, কলি ফেরানো যায়, সে তার সুপ্ত যৌবন ফিরে পায়। শব্‌নমই বলেছিল,

'এত গুণ ধরি কী হইবে বল দুরবস্থার মাঝে,
পোড়ো বাড়িটাতে লুকনো যে ধন লাগে তার কোনো কাজে?'

কবিতা আমার মুখস্থ থাকে না। শুধু শব্‌নমের উৎসাহের আতিশয্যে আমার নিষ্কর্মা স্মৃতিশক্তিও যেন ক্ষণেকের তরে জেগে উঠত। উর্দুতে বলেছিলুম,

দুর্দিনে, বল, কোথা সে সুজন হেথা তব সাথী হয়
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয়!

তঙ্গ-দস্তীমে কৌন কিস্‌কা সাত দেতা হৈ?
কি তারিকীমেঁ সায়াভী জুদা হোতা হৈ ইনসাসে।

আমার নিজের সামান্য জ্ঞান, কাবুলে ফরাসী রাজদূতাবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক যিনি জলালাবাদ-গান্ধার এবং বামিয়ানে খোঁড়াখুঁড়ি করে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি বের করেছিলেন—তাঁর দিনে দিনে দেওয়া অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান, আমার কোনও কাজেই লাগল না।

কাজে লাগল সে এক সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

কাবুল ছেড়ে আসার পর, হিন্দুকুশের চড়াই তখনও আরম্ভ হয় নি, এমন সময় —বেশ কিছুক্ষণ ধরে—ক্ষণে ক্ষণে আমার সেই আচ্ছন্ন অবস্থার ভিতরও আমার মনে হতে লাগল, এ জায়গায় আমি যেন পূর্বেও একবার, কিংবা একাধিকবার এসেছি। এ রকম অভিজ্ঞতা নাকি সকলের জীবনেই হয়—কেমন যেন স্বপ্নে না জাগরণে দেখা, আধচেনা-আধভোলা একটা জায়গা বা পরিবেষ্টনী এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হয় যে মানুষ পথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আর ভাবে, সামনের মোড় নেওয়া মাত্রই একেবারে সম্পূর্ণ এক চেনা জায়গায় এসে পৌঁছবে।

তাই আমি বিশেষ কোনও খেয়াল করি নি।

হঠাৎ মোড় নিতেই দেখি, হাতে ঝুলনো ট্রাউট মাছ নিয়ে একটা লোক আমার

দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—এ জায়গা আব্দুর রহ্‌মানের পঞ্জশীর।'

সামনেই বাজার। ঢুকেই বাঁয়ে দর্জীর দোকান, ডাইনে ফলওলা—তার পর মুদী—সর্বশেষে চায়ের দোকান। নিদেন একশ'বার দেখেছি। দোকানীর মেহদি-মাখানো দাড়ি, কালো-সাদায় ডোরাকাটা পাগড়ি আব্দুর রহ্‌মানের চোখ দিয়ে আমার বহুকালের চেনা আরেকটু হলেই তাকে অভিবাদন করে ফেলতুম। তার দৃষ্টিতে অপরিচিতের দিকে তাকানোর অলস কৌতূহলের স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে। এই চায়ের দোকানই আব্দুর রহ্‌মানের কার্পো, পেলিটি।

আব্দুর রহ্‌মান নিরক্ষর। ফার্সী সাহিত্যে তার কোনও সঙ্গতি নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস অজানা পরিবেশ যদি শুদ্ধমাত্র কয়েকটি অতি সাধারণ আটপৌরে শব্দের ব্যবহারে চোখের সামনে তুলে ধরাটা আর্টের সর্বপ্রধান আদর্শ হয়—বহু আলঙ্কারিক তাই বলেন—তবে আব্দুর রহ্‌মান অনায়াসে গোতি দোদে মমকে দোস্ত বলে ডাকবার হক ধরে। এ বাজারের প্রত্যেকটি দোকান আমার চেনা—আর এখানে দাঁড়ানো নয়, আব্দুর রহ্‌মান সাবধান করে দিয়েছিল—ওই যে-কাঁচা-পাকা দাড়িওলা লোকটা তামাক খাচ্ছে সে বিদেশীকে পেলেই জ্যাচর জ্যাচর করে তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।

চায়ের দোকান পেরোতেই বাঁ দিকে যে রাস্তা তারই শেষ বাড়ি আব্দুর রহ্‌মানদের। বাড়িতে সে নেই—কান্দাহারে। তার বাপকে আমি চিনি। ধরা পড়ার ভয় আছে।

সামনে খাড়া হিন্দুকুশ। আব্দুর রহ্‌মানদের মনে মনে সেলাম জানিয়ে একটু পা চালিয়ে তার দিকে এগোলুম।

হিন্দুকুশে এখনও বরফ তার সর্ব দার্ঢ্য নিয়ে বর্তমান। আসলে তার শরীর সাবুদানার চেয়েও সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি আর হিমকণারই মত নরম। কিন্তু সমস্ত সূর্যও একে গলাতে পারে নি। শক্তকে ভাঙা যায়, নরমকে ভাঙা শক্ত।

ঝড়-তুফানে দিশাহারা হয়ে আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে দেখেছি, তখন জানতুম না যে এখানে পথ মাত্র একটিই, নিরুদ্দেশ হবার উপায় নেই। বামিয়ানেও পৌঁছলুম। বিরাট বুদ্ধমূর্তি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বলেই চিনলুম, এ জায়গা বামিয়ান—না হলে কোনও জায়গার নাম আমি কাউকেও জিজ্ঞেস করি নি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে চেয়েছি, কেউ বোরকা-পরা একটি মেয়েকে একা একা মজারের পথে যেতে দেখেছে কি না? 'হাঁ', 'না', 'কাবুলের দিকে গিয়েছে', 'না, মজারের দিকে গিয়েছে', 'কোন্ এক সরাইয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে'—সব ধরনের উত্তরই

নেছি। দরদী জন আমাকে কাবুলে ফিরে যেতে বলেছে।

দেখি নি, দেখি নি, কিছুই দেখি নি। কয়েদীকে যখন পাঁচশ' মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কি সে কিছু দেখে? সাইবেরিয়া নির্বাসনে গিয়েছেন সেরা সেরা সাহিত্যিক—তাঁরা কিছুই দেখেন নি। না হলে শোনাতেন না?

হায় রে হিউয়েন সাঙ! স্মৃতির কপালে শুধু করাঘাত।

হিউয়েন সাঙ এ পথে যেতে ঝড়-ঝঞ্ঝার মৃত্যুযন্ত্রণায় একাধিকবার তাঁর জীবন কাতর রোদনে তথাগতের চরণে নিবেদন করেছিলেন। আমি করি নি। তার কারণ এ নয় যে আমি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠের চেয়েও অধিক বীতরাগ—দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন সুখে বিগতস্পৃহ—হয়ে গিয়েছিলুম। আমি হয়ে গিয়েছিলুম জড়, অবশ। ক্লোরোফর্মে বিগতচেতন রুগীর যখন পা কাটা যায় সে যে তখন চিৎকার করে না তার কারণ এ নয় যে, সে তখন কায়া-ক্লেশমুক্ত স্থিতধী মুনিপ্রবর। চিন্তামণির অন্বেষণে বিল্বমঙ্গল যা সব করেছিল সে সজ্ঞানে নয়—সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়। কী সুন্দর নাম চিন্তামণি! এ নাম বাঙালী মেয়ে অবহেলা করে কেন? অহল্যার মত 'অসতী' ছিল বলে? হায়! আজ যদি ওঁর শুদ্ধজ্ঞানের এক কণা আমি পেয়ে যেতুম!

ক্রমে আমার সময়ের জ্ঞান লোপ পেল। কবে বেরিয়েছি কবে মজার পৌঁছব কোনও বোধই আর রইল না।

সরাইয়ের এক কোণে ঠেসান দিয়ে বসে আছি। যে কাফেলার সঙ্গে আজ ভোরে যোগ দিয়েছিলুম তারা কুঠুরির মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলছে। এদের বেশির ভাগই আমুদরিয়া পারের উজবেগ। বাঙলা ভাষায় এদের বলে 'উজবুক'। এরা যে কি সরল বিশ্বাসে ট্যারচা চোখ মেলে তাকাতে জানে সে না দেখলে তুলনা শুনে বোঝা যায় না। এদের ভাষা আমার অজানা। কিন্তু এরা আমাকে ভালোবেসেছে। আজ সকালে একরকম জোর করেই আমাকে একটা খচ্চরের উপর বসিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ কানে গেল কে যেন বললে, 'জশ্‌ন্‌।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, স্বপ্নমায়া—মতিভ্রম কিছুই নয়, পরিষ্কার দেখতে পেলুম, জশ্‌ন্‌ পরবের রাত্রে ডান্‌স্‌ হলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে শব্‌নম। সে রাত্রে তার ছিল ভ্রূকুটিকুটিল ভাল, আজ দেখি সে ভ্রূবিলাসী, তার মুখে আনন্দ হাসি।

তার পরই জ্ঞান হারাই।

## ॥ পাঁচ ॥

চোখে মেলে দেখি, শব্‌নমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। শুচিস্মিতা শব্‌নম প্রসন্নবয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে।

হায়, এই সত্য হল না কেন? আস্তে আস্তে তার চেহারা মিলিয়ে গেল কেন?

এই 'বিকারে' কত দিন কেটেছিল জানি না। শব্‌নমকে কাছে পাওয়া, তার মুখে সান্ত্বনার বাণী শোনা যদি 'বিকার' হয় তবে আমি 'সুস্থ' হতে চাই নে। আমি সুস্থ হলুম কেন?

মজার-ই-শরীফে হজরৎ আলির কবর-চত্বরের এক প্রান্তে চুপচাপ বসে থাকি গভীর রাত্রি পর্যন্ত।

কাবুলের সূফী সাহেব আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে সেখানকার সরাইখানাতে আমার সন্ধান নিয়ে কিছুদিনের ভিতরই জানতে পারলেন, আমাকে মজারের পথে দেখা গিয়েছে। আমার কাবুল ফেরার মেয়াদ যখন ফুরিয়ে গেল তখন তিনি বেরলেন আমার সন্ধানে। আমাকে যখন পেলেন তখন আমি মজারের কাছেই। উজবেগদের সাহায্যে আমাকে অচৈতন্যাবস্থায় এখানে নিয়ে আসেন।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। মধ্যগগনে দশমীর চন্দ্র। হাওয়া আসছে উত্তর-পূব—আমুদরিয়া আর বল্‌খ্‌ থেকে। মসজিদচত্বরে পুণ্যার্থীরা এবার সমবেত উপাসনা শেষ করে এখানে ওখানে নৈমিত্তিক (নফ্‌ল্‌) আরাধনা করছে। সূফীরা স্থাণুর মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে, কিংবা মুদ্রিত নয়নে আপন গভীরে নিবিষ্ট। রাত গভীর হলে মজারের ছায়ায় কেউ বা মধুর কণ্ঠে জিক্‌র্‌ গেয়ে ওঠে।

এ সব রোজ দেখি, আবার রোজই ভুলে যাই। আমার স্মৃতিশক্তি কিছুই ধারণ করতে পারে না। প্রতিদিন মনে হয়, জীবনে এই প্রথম আঁখি মেলে এসব দেখছি। কোনদিন বা সরাই থেকে এখানে আসবার সময় পথ খুঁজে পাই না। শহরের লোক আমাকে চিনে গিয়েছে। কেউ-না-কেউ পথ দেখিয়ে রওজাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

আমি মজনূন, আমি পাগল—এ কথা আমি সরাইয়ে, রাস্তায় ফিসফিস কথাতে একাধিকবার শুনেছি। এ দেশে প্রিয়বিচ্ছেদে কাতর জনকে কেউ বিদ্রূপের চোখে দেখে না। শুনেছি, 'সভ্য' দেশের কেউ কেউ নাকি এদের এ দৃষ্টান্ত হালে

অনুকরণ করতে শিখছেন। এদের চোখে দেখি, আমার জন্য নীরবে মঙ্গল কামনা। দরগায় বসে বসেও যে আমি নমাজ পড়ি নে তাই নিয়ে এরা মোটেই বিচলিত নয়। 'মজনূনে'র উপর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর-একদিন শুনেছিলুম বোরকা-পরা দুটি তরুণীর একজন আরেক জনকে বলছে, 'কী তোর প্রেম যে, তাই নিয়ে হর-হামেশা আপসা-আপসি করছিস। ওই দেখ্ প্রেম কী গরল। শব-ই-জুক্‌কাকের ফুল শুকোবার আগেই এর প্রিয়া শুকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। হয়েছিস ওর মত তুই মজনূন—পাগল?'

আমি মাথা হেঁট করে এগিয়ে গিয়েছিলুম। প্রেম কি গরল? প্রেম তো অমৃত। আমার মত অপাত্রে পড়েছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে পাত্র চিড় খেল। আমার নামের মিতা আরবভূমির মজনূন তো পাগল হন নি। তিনি প্রেমের অমৃত খেয়ে পেয়েছিলেন দিব্য রূপ। সংসারের আর-কেউ সেটি খায় নি বলে ওঁর সে রূপ চিনতে না পেরে তাঁকে বলেছিল পাগল। যে দু-একটি চিত্রকর বুঝতে পেরেছিল, তারা ছবিতে সেই দিব্যজ্যোতি দেখবার চেষ্টা করেছে।

'সেরে উঠছি'। যদি এটাকে 'সেরে ওঠা' বলে। এতদিন অবশ ছিলুম, এখন এখানে ওখানে বেদনা পাচ্ছি। শব্‌নম এখন আর আমার সম্মুখে যখন-তখন উপস্থিত হয় না। হলেও তার মুখে বিষণ্ণ হাসি। সুফী সাহেবকে সেটা জানাতে তিনি ভারি খুশি হলেন। তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তিনি অতিপ্রাকৃতে এরকম বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, শোকে কাতর অপ্রকৃতিস্থ লোকের মনে শান্তি এনে তাকে সবল সুস্থ করতে পারা এ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অলৌকিক ঐশী শক্তি।

এ কথা আমিও মানি। কিন্তু এই যে শব্‌নম আমাকে এসে দেখা দিয়ে যায়, এটাকে তিনি এত সন্দেহের চোখে দেখেন কেন? স্বপ্নে মায়ায় শব্‌নমের এই যে দান এ তো সত্যকে অসম্মান করে না—সে তো তখন অবাস্তব, অসত্যের পরীর ডানা পরে এসে আকাশ-কুসুম দিয়ে আমার গলায় ইন্দ্রমাল্য পরায় না। কৈশোরে এক সঞ্চয়িতায় পড়েছিলুম, কে যেন এক চীনদেশীয় ভাবুক বলেছেন, 'স্বপ্নে দেখলুম, আমি প্রজাপতির শরীর নিয়ে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন জেগে উঠে আমার ভাবনা লেগেছে, এই যে আমি মানুষরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি কোনও প্রজাপতির স্বপ্ন নয়?—সে স্বপ্নে দেখছে যে সে মানুষের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?' সর্বসত্তা নিয়ে যেখানে সন্দেহ সেখানে তাঁর বিদ্বেষ আমার স্বপ্নের প্রতি।

সুফী সাহেব বললেন, 'জানেমন্ খবর পাঠিয়ে জানিয়েছেন, আমি কাবুল না

ফিরলে তিনি নিজে আমার সন্ধানে বেরবেন। তাঁর লোক উত্তরের জন্য বসে আছে।'

আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

তিনি আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'তার কোনও খবর নেই; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে ভাল আছে।'

আমি বললুম, 'চলুন।'

আব্দুর রহ্‌মানের পিতাকে এবারে আর ফাঁকি দেওয়া যায় নি। খেতখামারের কাজ করে বাকী সময় সে নাকি বাজারের চায়ের দোকানে বসে আমার প্রতীক্ষা করত। তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হলেও সমস্ত বাজার আমাকে দেখামাত্রই যে রকম হুলুধ্বনি দিয়ে উঠেছিল তা থেকেই বুঝেছিলুম, বিখ্যাত বা কুখ্যাত হওয়া যায় নানা পদ্ধতিতে, এবং কোনও চেষ্টা না করেও।

তার উপর সুফী সাহেব বুড়োর মুরশীদ বা গুরু।

শুনলুম, আমানুল্লা কর্তৃক ফ্রান্সে নির্বাসিত তাঁর সিপাহ্‌সলার বা প্রধান সেনাপতি নাদির খান বাচ্চাকে তাড়াবার জন্য গজনী পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। রঙরুটের অপেক্ষা না করে কান্দাহারেই আব্দুর রহ্‌মান তাঁর সৈন্যদলে ঢুকেছে।

শব্‌নমের কাছে শুনেছিলুম, ফ্রান্সের নির্বাসনে আমার শ্বশুরমশাই আর নাদির খানে তাঁদের পূর্বপরিচয় গভীরতর হয়েছিল। বহু যুগের পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিল বলেই একদিন যখন হঠাৎ মৈত্রী স্থাপিত হল তখন সেটা গভীরতম বন্ধুত্বের রূপ নিল। ফ্রান্সে সব মেয়েরই একটি করে গড-ফাদার থাকে, শব্‌নমের ছিল না বলে দুঃখ করতে নাদির নিজে যেচে তার গড্‌-ফাদার হবার সম্মান লাভ করেছিলেন —শব্‌নম বলেছিল। তবু আমার শ্বশুর আমানউল্লা আফগানিস্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত নাদিরের অভিযানে যোগ দেন নি।

আমার ভয় হল. বাচ্চা যদি জানেমনের উপর দাদ নেয়।

কুহ্‌-ই-দামন, জবল্‌-উস্‌-সিরাজ অঞ্চল পেরবার সময় দেখি বাচ্চার সঙ্গী ডাকাতরা তাকে ডেজার্ট করে পালাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অত্যাচারী মাস্টারের নিপীড়নে যখন নিরীহ শিশু ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে তখন করুণা হয়, কিন্তু সেই স্যাডিস্ট মাস্টার যখন হেড-মাস্টারের হুড়ো খেয়ে কেঁচোটি হয়ে যান তখন ঘেন্না ধরে, হাসি পায়। নিরীহ বাছুরের দুশমন শুয়োরকে বাঘ তাড়া লাগালে যেমন মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। রাস্তার উপরে, এদিকে ওদিকে ছড়ানো তাদের পরিত্যক্ত লুটের মাল, দামী দামী রাইফেল। নাদির-বাঘ আসছে, ওগুলো

ঘুড়োবার সাহস কারও নেই। শুনেছি কোনও শান্ত জনপদবাসী নাকি নিরপরাধ প্রশ্ন শুধিয়েছিল এক পলায়মান ডাকাতকে, সে কোন্ দিকে যাচ্ছে, আর অমনি নাকি ডাকাত বন্দুক ফেলে নিরস্ত্র পথচারীর পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ঐতিহাসিক খাফী খান তাহলে বোধ হয় খুব বেশি বাড়িয়ে বলেন নি যে, আবদালী দিল্লি আসছে শুনে মারাঠা 'সৈন্যরা' নাকি 'আইমা' 'কাইমা'—অর্থাৎ মায়ের স্মরণে—চিৎকার করতে করতে যখন দিল্লি থেকে পালাচ্ছিল তখন নাকি শহরের রাঢ়ী-বুড়ীরাও ধমক দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করে মালপত্র কেড়ে নিয়েছিল।

বিজয়ী নাদির কাবুলে প্রবেশ করলেন নগরীর পশ্চিম দ্বার দিয়ে।

পরাজিত আমি উত্তর দ্বার দিয়ে।

## ॥ ছয় ॥

কত মাস, কত বৎসর কেটে গিয়েছে কে জানে!

বাদশা এবং আমার শ্বশুরও হার মেনেছেন।

সে নেই, এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। নিশ্চিহ্ন নিরুদ্দেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ নির্দয়তর সন্দেহই মেনে নেব—আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা ছিল বলেই শব্‌নম অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করছে, কবে আমি তাকে গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত হব, কবে আমার বিরহ-বেদনা-বিক্ষুব্ধ সরোবর নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত হবে সেই শব্‌নম-কমলিনীকে তার বক্ষে প্রস্ফুটিত করার জন্য।

নিশ্চয়ই আমার প্রেমে কোনও অপরিপূর্ণতা আছে।

শব্‌নমকেই একদিন সংস্কৃতে শুনিয়েছিলুম, শত্রু বেদনা দেয় মিলনে, মিত্র দেয় বিরহে—শত্রু মিত্রে তা হলে পার্থক্য কোথায়? অথচ মিত্র যখন দূরে চলে যায় সে তো প্রিয়জনকে বেদনা দেবার জন্য যায় না। তবে কেন হাসিমুখে তাকে বিদায় দিতে পারি নে, তবে কেন হাসিমুখে তার পুনর্মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারি নে—শব্‌নম যে রকম কান্দাহারে ম্লান মুখে বিষণ্ণবদনে সন্ধ্যাদীপ জ্বালত সে রকম না, উজ্জ্বল প্রদীপ, উজ্জ্বল মুখ নিয়ে।

সূফী সাহেবও তো ওই কথাই বলেছিলেন—অন্যপ্রসঙ্গে। বলেছিলেন, প্রতিবার যোগাভ্যাসের পর দেহ মন যেন প্রফুল্লতর বলে বোধ হয়, না হলে বুঝতে হবে অভ্যাসের কোনও স্থলে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। প্রেম-যোগেও নিশ্চয়ই তা

হলে একই সত্য। সে যোগ, সে মিলনের পর যখন প্রিয়-বিচ্ছেদ আসে তখন আমার হৃদয় থেকে কাতর-ক্রন্দন বেরুবে কেন? আমি কেন হাসিমুখে মুহুর্মুহু বিরহ-দিনান্তের পানে তাকাতে পারব না, সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, সময় হলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হবেই হবে। আমি কি মূর্খ যে দাহন বেলায় ইন্দুলেখা কামনা করব। আমি হব সমাহিত জ্যোতিষীর ন্যায়, যে সূর্যগ্রাসের সময় বর্বরের মত সূর্য চিরতরে লোপ পেল ভয়ে বিকট অট্টরব করে ওঠে না। অবলুপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য তখন বিরাজ করেন তার জ্ঞানাকাশে। শব্‌নম আমারই বুকের মাঝে চন্দ্রমা হয়ে নিত্য তো রাজে। শব্‌নম-শিশিরকুমারী প্রাতে যদি অন্তর্ধান হয়ে থাকে তবে কি আজই সন্ধ্যায় পুনরায় সে আমার শুষ্কাধরে সিঞ্চিত হবে না?

আমি কেন হাসিমুখ দেখাব না? আমি কি শ্মশানে বৈরাগ্য-বিলাসী নন্দী-ভৃঙ্গী যে দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে ত্রিভুবন শঙ্কান্বিত করব? আমার মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের সঙ্গে হরিহরাত্মা আমিও মৃত্যুঞ্জয়—মধুমাসে আমার মিলনের লগ্ন আসবে, আমার ভালে তখন পুষ্পরেণু, বিরহ-দিগম্বর তখন প্রাতঃসূর্যরুচি রক্তাংশুক পরিধান করবে। না। আমি এখনই, এই মুহূর্তেই বরবেশ ধারণ করব—বিরহের অস্থিমালা চিতাভস্ম আমি এই শুভলগ্নেই ত্যাগ করলুম, আমার প্রতি মুহূর্তই শুভমুহূর্ত।

খৃষ্ট কি বলেন নি, উপবাস করলে ভণ্ডতপস্বীর মত শুষ্কমুখ দেখা দিয়ে না। তারা চায়, লোকে জানুক, তারা পুণ্যশীল। তুমি বেরুবে প্রসাধন করে, তৈলস্নিগ্ধ মস্তকে।

লোকে হাসবে, বলবে, এই যে লোকটা মজনূর মত পাগলপারা খুঁজেছে তার লায়লীকে, ঘূর্ণিবায়ু হয়ে প্রতি উটের মহ্‌মিলে, প্রতি সরাইয়ে, মজারে-কান্দাহারে খুঁজেছে তার শব্‌নমকে দুদিন আগে—সে কিনা আজই হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

তাই হোক, সেই আমার কাম্য।

শব্‌নম বলেছিল, 'তুমি আমার বিরহে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না'।

অভ্যস্ত সবাই হয়, আমিও হব, তাতে আর কী সন্দেহ?

ধর্মনিষ্ঠ অথচ বিত্তশালী এক গোস্বামীকে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ এসে একদিন কাঁদতে কাঁদতে দুঃসংবাদ দিলেন, তাঁদের নায়েব বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের সর্বস্ব অপহরণ করেছে। কালই তাঁদের রাস্তায় বসতে হবে। গৃহিণীর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে গোস্বামী আবার পুঁথিপাঠে মন দিলেন। তিনি কেঁদে বললেন 'ওগো, তুমি যে কিছু ভাবছ না, আমাদের কী হবে।'

গোস্বামী পুঁথি বন্ধ করে, হেসে বললেন, 'মুগ্ধে, আজ থেকে বিশ কিংবা ত্রিশ

বৎসর পরে তুমি এই নিয়ে আর কান্নাকাটি করবে না। তোমার যে অভ্যাস হতে ত্রিশ বৎসর লাগবে আমি সেটা তিন মুহূর্তেই সেরে নিয়েছি।'

আমি ওই গোস্বামীর মত হব।

তিন লহমায় গোস্বামী অভ্যস্ত হয়ে গেলেন—এর রহস্যটা কী ?

রহস্য আর কিছুই নয়। গোস্বামী শুধু একটু স্মরণ করে নিলেন বিত্ত যেমন হঠাৎ যায়, তেমনি তার চেয়েও হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। আরও হয়তো অনেক তত্ত্বকথা ভেবে নিয়েছিলেন, যথা, বিত্তনাশ সর্বনাশ নয়, বিত্তাবিত্ত সবই মায়া—কিন্তু ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। প্রথম আগত প্রথম কারণই যথেষ্ট।

তার চেয়েও বড় কথা—শব্‌নম আমার সাধারণ ধনজনের মত বিত্ত নয়। সে কী, সে কথা এখনও বলতেও পারব না। সাধনা করে তা উপলব্ধির ধন।

স্বীকার করছি, জ্ঞানী গোস্বামীর মত তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাই নি। সব জেনে-শুনেও আমাকে অনেক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হয়েছে—না-ফেলতে পেরে কষ্ট হয়েছে তারও বেশি। পাগল হতে হতে ফিরে এসেছি, সে শুধু শব্‌নমের কল্যাণে। পরীর প্রেমে মানুষ পাগল হয়। পরী মানে কল্পনার জিনিস। কিংবা বলব, প্রত্যেক রমণীর ভিতরই কিছুটা পরী লুকিয়ে থাকে। সেটাকে ভালবাসলেই সর্বনাশ। পুরুষ তখন পাগল হয়ে যায়। শব্‌নমের পরীর খাদ ছিল না। আমি পাগল হয়ে গেলে শব্‌নমের বদনামের অন্ত থাকত না।

আবার বলছি, তিন লহমায় আমি সে জিনিস পাই নি। ভালই হয়েছে। গোস্বামী হয়তো তিন লহমায় ত্রিশ বৎসরের পঞ্জীভূত যন্ত্রণা এক ধাক্কায় সয়ে নেবার মত শক্তি ধরেন। আমার কি সে শক্তি আছে।

আমি সাধারণ বিরহ-বেদনার কথা বলছি না। পায়ের শব্দ শুনে সে বুঝি এসেছে ভাবা, ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বার বার নিরাশ হওয়া, কারও হাতে কোনও চিঠি দেখলেই সেটা শব্‌নমের মনে করা, বাড়ি থেকে বেরুতে না পারা—হঠাৎ যদি সে এসে যায় সেই আশায়, আবার না-বেরুতে পেরে তার সন্ধান করতে পারছি নে বলে যন্ত্রণা ভোগ, যে আসে তার মুখেই বিষাদ দেখে হঠাৎ রেগে ওঠা এবং পরে তার জন্য নিজেকে শাস্তি দেওয়া—এসব তো সকলেরই জানা : যে জানে না, সে-লোকের সঙ্গে আমার যেন কখনও দেখা না হয়। সে সুখী।

জানেমন্ বয়েৎ বলতে বলতে এমন একটি কান্দাহারী শব্দ ব্যবহার করলেন যেটি ইতিপূর্বে আমি মাত্র একবার শব্‌নমেরই মুখে শুনেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার

সর্ব চৈতন্য যেন লোপ পেল। কে যেন আমার মাথায় ডাণ্ডশ মারলে—প্রথমটায় লাগে নি, তার পর হঠাৎ অসহ বেদনা, তারপর অতি ধীরে ধীরে সেটা কমল। ডাণ্ডশ যেন চেখে-চেখে আমার যন্ত্রণাবোধটা উপভোগ করলে। এমন তো সকলেরই হয়। এ আর নূতন করে কীই বা বলব?

জানেমন্ এখন কথা বলেন আরও কম। শব্‌নমের কথা আমিই তুলে অনুযোগ করলুম। এখন আমার সামনে তার কথা আর কেউ তোলে না—পাছে আমার লাগে, বোঝে না তাতে আমি ব্যথা পাই আরও বেশি—তাই আমাকেই তো তুলতে হবে তার কথা।

আমার হাত দুখানি তাঁর কোলে নিয়ে বললেন, 'বাচ্চা, শব্‌নম আমাকে দুঃখ দেবে কেন? আর দুঃখ যদি পেতেই হয় তবে তার হাতেই যেন পাই। যে বন্দীখানায় সোক্রাৎকে (সোক্রাতেস) জহর খেতে হয়েছিল তার কর্তা ছিলেন তাঁরই এক শিষ্য এবং বিষপাত্র সোক্রাৎকে এগিয়ে দেওয়া ছিল তারই কাজ। পাত্র আনবার পূর্বে তিনি কেঁদে বলেছিলেন, "প্রভু, আমাকেই করতে হবে এই কাজ?" সোক্রাৎ পরম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আহা! সেই তো আনন্দ। না হলে যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে সে যখন জিঘাংসা ভরে পৈশাচিক আনন্দে ক্রুর হাসি হেসে আমার দিকে বিষপাত্র এগিয়ে দেয় সেটা তো সবচেয়ে পীড়াদায়ক।" এই বেদনার পেয়ালা ভরা আছে শব্‌নমের আশীর্বাদ ও—'

আমার বুকে আবার ডাণ্ডশ। সেখানে যেন বিদ্যুৎ বিভাসে জ্যোতির্লোক হয়ে ফুটে উঠল শব্‌নম। তার দুঃখের মুহূর্তে আমাকে একদিন বলেছিল 'বহু আপন পল্লব নিংড়ে নিংড়ে বের করা আমার এই এক ফোঁটা আশিস্‌টি।' হায় রে কিস্মৎ! দুঃখের দিনেই তুমি বদ্‌-কিস্মতের স্মৃতিশক্তি প্রখর করে দাও!

শুনছি, জানেমন্ বলে যাচ্ছেন, 'সেই ভাল সেই ভাল।' ধীরে ধীরে আকাশের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে অজানার উদ্দেশে বললেন, 'সেই ভাল, হে কঠোর, হে নির্মম! একদিন তুমি আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছিলে। আমি অনুযোগ করেছিলুম। তারপর শব্‌নমরূপে সেটা তুমি আমায় ফেরত দিলে শতগুণ জ্যোতির্ময় করে—আমি তোমার চরণে লুটিয়ে কৃতদাসের মত বার বার তোমার পদচুম্বন করি নি? আজ যদি তুমি আবার সেই জ্যোতি কেড়ে নিতে চাও তো নাও—আমি অনুযোগ করব না, ধন্যবাদও দেব না। কিন্তু এই হতভাগা পরদেশী কী করেছিল, আমাকে বল, তাকে তুমি—'

দেখি, তাঁর চোখ দুটি দিয়ে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

একবার দেখেছি, একবারের কথা শুনেছি—এই তৃতীয়বার। এরপর আজ পর্যন্ত আর কখনও দেখি নি।

আমি আকুল হয়ে তাঁকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর চোখ মুছে দিতে দিতে মনে মনে শব্‌নমকে উদ্দেশ করে বললুম, 'হিমি, বিরহ-ব্যথায় যে আঁখি বারি ঝরে সেটা শুকিয়ে যায়—প্রিয়মিলনের সময় সেটা দেখানো যায় না। দেখাতে হলে সেটা বুকে করে বইতে হয়। তুমি যেদিন ফিরে আসবে সেদিন এই রক্তচিহ্ন দেখিয়ে তোমাকে বলব, 'জানেমন্ তোমার জন্য তাঁর বুকের ভিতর কী রকম রক্তরেখায় পদ্ম-আসন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, দেখ।'

আমি জানেমন্‌কে চুম্বন দিতে দিতে বললুম, 'আপনি শান্ত হন। আপনি জানেন না, আমার হৃদয় এখন শান্ত।'

আমি জানতুম, জানেমন্ শব্‌নম উভয়ই—অন্তত ক্ষণেকে তার শোক ভুলে যান—ঋষি-কবিদের বাণী শুনতে পেলে। বললুম, 'আপনি সোক্রাতের যে-কথা উল্লেখ করলেন, সেই বলেছেন, আমাদের কবি আব্দুর রহীমন্ খান-ই-খানান—

"রহীমন্! তুমি বলো না লইতে অনাদরে দেওয়া সুধা—
আদর করিয়া বিষ দিলে কেহ মরিয়া মিটাব ক্ষুধা।

রহীমন্! হমে না সুহায় অমি পিয়াওৎ মান বিন্।
জো বিষ দেয় বোলায় মান সহিত মরিব ভালো॥"

আমাকে, আরও কাছে টেনে এনে বললেন, 'সুন্দর! সুন্দর! দাঁড়াও, আমি ফার্সীতে অনুবাদ করি;—মুখে মুখেই বললেন,

"আয় রহীমন্, না গো মরা—"

## ॥ সাত ॥

অনেকক্ষণ যেন ধ্যানে মগ্ন থেকে আমাকে শুধালেন, 'তুমি পেয়েছ? কী পেয়েছ?'

'সে কি আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পেরেছি যে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। এর সাধনা তো আমৃত্যু, কিংবা হয়তো মৃত্যুর পরক্ষণেই বুঝব এতদিন শুধু বইয়ের মলাটখানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, বইটার নাম পড়েই ভেবেছি ওর বিষয়বস্তু আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তখন দেখব এতদিন কিছুই বুঝতে পারি নি। শব্‌নমই

আমাকে একদিন বলেছিল, সামান্য একটু আলাদা জিনিস :—

"গোড়া আর শেষ, এই সৃষ্টির

জানা আছে, বল কার?

প্রাচীন এ পুঁথি, গোড়া আর শেষ

পাতা কটি ঝরা তার।"

হিরণ্ময় পাত্রের দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হৃদয়ে কেটে গিয়েছে সমস্ত জীবন—ওর ভিতরকার সত্যটি দেখতে পাই নি। বিকলবুদ্ধি শিশুর মত এতদিন চুষেছি চুষিকাঠি—এই বারে পেলুম মাতৃস্তন্যের অনাদি অতীত প্রবহমান সুধা-ধারা। সেই যে শিশুহারা মা তার বাচ্চাকে কাঁদতে কাঁদতে খুঁজেছিল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি—চলার পথে যে ঝরে পড়েছিল তার মাতৃস্তন্যরস তাই দিয়েই তো দেবতারা তৈরী করলে, মিল্‌কিওয়ে—আকাশগঙ্গার ছায়াপথ।

'এ জীবনেই তো পৌঁছই . নি পাহাড়চুড়োয়, যেখান থেকে উপত্যকার পানে তাকিয়ে বলতে পারব, এই যে উপত্যকার কাঁটাবন খানাখন্দ, কাদা-পাথর, সাপ-জোঁকে ক্ষতবিক্ষত চরণে এখানে এসে পৌঁছেছি—এই উপত্যকাই কত সুন্দর দেখায় গিরিবাসীদের কাছে, যারা কখনও উপত্যকায় নামে নি—আমি কিছুটা উপরে এসেছি মাত্র, আর এর মধ্যেই কাঁটাবনকে নর্মকুঞ্জ বলে মনে হচ্ছে, কাদা-ভরা খালকে প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনী বলে মনে হচ্ছে। গিরিশিখরে পৌঁছলে সমস্ত ভুবন মধুময় বলে মনে হবে, এই আশা ধরি।

জানেমন্ স্মিতহাস্যে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু এইটুকুই পেলে কী করে?'

আমি বললুম, 'অদ্ভুত, সেও আশ্চর্য। মনে আছে মাসখানেক আগে সখী এসেছিল শব্‌নমের। ওর সঙ্গে দমকা হাওয়ার মত এল শব্‌নমের আতরের গন্ধ। গোয়ালিয়র না কোথা থেকে শব্‌নম আনিয়েছিল যে এক অজানা আতর, তারই সবটা দিয়ে দিয়েছিল তার সখীকে—মাত্র একদিন ওইটে মেখে এসেছিল আমার—আমাদের—না, আমাদের সক্কলের বাড়িতে আমাদের প্রথম বিয়ের দিনে—'

'সে কী?'

অজানতে বলে ফেলেছি। ভালই করেছি। আরও আগেই বলা উচিত ছিল।

কী আনন্দ আর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বৃদ্ধ যোগী শুনলেন আমাদের বিয়ের কাহিনী। হাসবেন, না, কাঁদবেন কিছুই যেন ঠিক করতে পারছেন না। খানাতে দোম্বা না মুর্গীর বিরিয়ানী ছিল সেও তাঁর শোনা চাই, তোপলের স্ত্রীধন নিয়ে আহাম্মুকির কথা

ভাল করে জানা চাই। এক কথা দশবার শুনেও তাঁর মন ভরে না। আর বার বার বলেন, 'ওই তো আমার শব্‌নম। কী যে বল, গওহর শাদ, কোথায় নূরজাহান!'

কতদিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তাঁর পরম মুখ-রোচক মজলিসের জৌলুস—আমাদের এই প্রথম বিয়ের কাহিনী।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'আচ্ছা বিয়ের পর তোমাতে ওতে যখন একলা-একলি হলে তখন সে প্রসন্ন হাসি হাসলে, না কাঁদলে?'

আমার লজ্জা পাচ্ছিল, বললুম, 'কাঁদলে।'

'জানতুম, জানতুম। আমারই স্মরণে কেঁদেছিল।' এবারে মুখে পরিতৃপ্তির উপর বিজয়-হাস্য। বললেন, 'এইটুকুনই জানতে চেয়েছিলুম। এইবারে বল, তোমার সেই আতরের কথা।'

'চেনা দিনের ভোলা গন্ধের আচমকা চড় খেয়েছিলুম, সেদিন। এর পূর্বে আমি জানতুম না, স্মৃতির অন্ধকার ঘরে সুগন্ধ আলোর চেয়েও সতেজ হয়ে মানুষকে কতখানি অভিভূত করতে পারে। আমি অনেকখানি মুহ্যমান হয়ে সুবাস-বন্যায় যেন ভেসে চলে গিয়েছিলুম। আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই—প্রীতিসম্ভাষণ দান-প্রদান হয়েছিল—আমি কিছুই শুনতে পাই নি।

এইখানেই আরম্ভ।

শ. একদিন আমায় শুধিয়েছিল, "যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়"—এটা আমি জানি কি না? আমি উত্তর দেবার সুযোগ পাই নি। আমাদের যে কবির এদেশে আসার কথা ছিল, তিনি ছন্দে বলেছেন,

> দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
> দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
> রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
> সেই ক্ষণে প্রাণ আপনার
> নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
> বাহির করিয়া আনে: অমৃতের কণা
> গ'লে আসে অশ্রুজলে;
> সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
> যে আপন পরিপূর্ণতায়
> আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।"

সঙ্গে সঙ্গে এক অবর্ণনীয় আনন্দ-মধুরিমা আমার সর্বদেহ-মনে ব্যাপ্ত করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল, পরীক্ষা পাসের জন্য মুখস্থ-করা বিস্তের একটা অংশ—সেটা তখন বুঝি নি, এখন সুগন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা জলজল করে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রাজপুত্র দারা শীকূহ্-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ তো আপনি পড়েছেন, কিন্তু সব উপনিষদ্ অনুবাদ করেন নি বলে বলতে পারব না বৃহদারণ্যক তাতে আছে কি না। তারই এক জায়গায় আমাদের দেশের এক দার্শনিক রাজা জনক গেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। ঋষিকে শুধালেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষের জ্যোতি কী—অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা, তার কাজকর্ম ঘোরাফেরা করা 'কিসের সাহায্যে হয়—কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "সূর্য।"

জনক শুধালেন, "সূর্য অস্ত গেলে ? অস্তমিত আদিত্যে ?"

"চন্দ্রমা।"

"সূর্য চন্দ্র উভয়েই অস্ত গেলে—অস্তমিত আদিত্য, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?"

"অগ্নি।"

"অগ্নিও যখন নির্বাপিত হয় ?"

"বাক্—ধ্বনি। তাই যখন অন্ধকারে সে নিজের হাত পর্যন্ত ভাল করে দেখতে পায় না, তখন যেখান থেকে কোন শব্দ আসে, মানুষ সেখানে উপনীত হয়।"

এইবারে শেষ প্রশ্ন।

জনক শুধালেন, "সূর্য চন্দ্র গেছে, আগুন নিবেছে, নৈঃশব্দ্য বিরাজমান—তখন পুরুষের জ্যোতি কী ?" সংস্কৃতটি ভারি সুন্দর, পদ্য ছন্দে যেন কবিতা। "অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?"

যাজ্ঞবল্ক্য, শেষ উত্তর দিলেন, "আত্মা।"

আমাদের কবির ভাষায় অন্তরের 'অন্তরতম পরিপূর্ণ আনন্দকণা।' আরবী ফারসী উর্দুতে যাকে আমরা বলি 'রূহ্'। এ সব তো আপনি ভাল করেই জানেন।

আমার ধোঁকা লাগল অন্যখানে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন চেনা জিনিস সূর্য থেকে আরম্ভ করে জনককে অজানা আত্মাতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন অগ্নি'কে জ্যোতি বলার

পর তিনি 'গন্ধ'কে মানুষের জ্যোতি বললেন না কেন? গন্ধ তো 'শব্দে'র চেয়ে অনেক বেশি দূরগামী। কোথায় রামগিরি আর কোথায় অলকা—কোথায় নাগপুর আর কোথায় কৈলাস—সেই রামগিরিশিখরে দাঁড়িয়ে বিরহী যক্ষ দক্ষিণগামী বাতাসকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই বাতাসে হিমালয়ের দেবদারু গাছের গন্ধ পেয়েছিলেন, হয়তো এই বাতাসই তাঁর অলকাবাসী প্রিয়াঙ্গীর সর্বাঙ্গ চুম্বন করে এসেছে;

"হয়ত তোমারে সে পরশ করি' আসে,
হে প্রিয়া মনে মনে ভাবিয়া তাই
সকল অঙ্গেতে সে বায়ু মাখি লয়ে
পরশ তব যেন তাহাতে পাই।"

ফার্সী এবং সংস্কৃত ছন্দে প্রচুর মিল আছে। জানেমন্ তাই আমাকে একাধিকবার মূল সংস্কৃতটা আবৃত্তি করতে বললেন।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
হে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।

আমি ভেবেছিলুম, এই খেই ধরে কাব্যালোচনাই চলবে কিন্তু জানেমন্‌ই বললেন, 'গন্ধের কথা বলছিলে।'

আমি বললুম, 'জী। আর যক্ষের সুবাসানুরাগ না হয় কবিত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আমি এমন গন্ধকাতর লোক দেখেছি, যে বেহারে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসের গন্ধ নিতে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বাতাসে বাংলা সাগরের নোনা গন্ধস্পর্শ। এটা কল্পনা নয়।

'তা সে যা-ই হোক, ঋষি গন্ধকে জ্যোতিরূপে বাকের চেয়ে ন্যূনতর মনে করেছেন, কারণ শব্দের সাহায্যে আমরা অন্ধকারে যে দিগ্‌দর্শন পেয়ে উৎপত্তিস্থলে পৌঁছতে পারি সুবাস দিয়ে অতখানি পারি নে, কিংবা হয়তো স্বীকার করেও সংক্ষেপ করেছেন—যেমন স্পর্শের কথাও বলেন নি।'

কিন্তু আসল কথা এই একটুখানি সৌরভেই আমি যদি মুহ্যমান, অভিভূত হয়ে যাই তবে তার পরের সোপান এবং সেটা তো সোপান নয়, সে তো মঞ্জিল, সে তো সাগরসঙ্গম, সেই তো আত্মন্—সে তো দূরে নয়, কঠিন নয়। সেই তো একমাত্র অনির্বাণ জ্যোতি, সেই তো নূর, ব্রহ্ম। সেই আলোতেই আমি অহরহ

শব্‌নমকে দেখতে পাব। সূর্যচন্দ্র যখন অস্তমিত, অগ্নি যখন শান্ত তখন যদি শব্‌নম সুরভিবাস দিয়ে আমাকে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত করে দিতে পারে তবে আর এইটুকুতে নিরাশ হবার কিছু নেই। বিশ্বাস করা কঠিন, তখন সে জ্যোতি পেলুম আমার অন্তরেই।'

আমি চুপ করলুম। জানেমন্ বললেন, 'এতে অবিশ্বাসের তো কিছুই নেই। আমি যেটুকু পেয়েছি, সেটুকু চোখের আলো হারানোর শোকে—এবং আপন অন্তর থেকেই, বহু সাধনার পর। তুমি পেয়ে গেলে অল্প বয়সেই—সে শুধু পিতৃপুরুষের আশীর্বাদের ফলে।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু চিরস্থায়ী নয় আমার এ সম্পদ। মাঝে মাঝে—'

জানেমন্ আমাকে কাছে টেনে এনে আমার মাথা তাঁর কোলের উপর রেখে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আমারও তাই। আমাদের বন্ধু সুফী সাহেবেরও তাই। তার পর বল। আমার শুনতে বড় ভাল লাগছে। শব্‌নম ফিরে এলে তার সামনে আবার তুমি সব বলবে।'

কী আত্মপ্রত্যয়! যেন শব্‌নম এক লহমার তরে আমাদের জন্য তৃষ্ণার জল আনবার জন্য পাশের ঘরে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ তাকে অরুন্ধতী তারা দেখাবার সুযোগ পাই নি বলে। এই যে আমি মজার-ই-শরীফ এলুম গেলুম—রাত্রি-বেলা একবারও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি নি—যে-কোনও তারা দেখতে পেলেই সব বেদনা আবার এক সঙ্গে এসে আমাকে মুষড়ে ফেলবে বলে।

যে রাতে আমি প্রথম জ্যোতি পেলুম, তারই আলোকে আমি নির্ভয়ে অরুন্ধতীর দিকে তাকালুম। তিনি আমায় হাসিমুখে বললেন, "স্বর্গে আসতেই দেবতারা আমায় শুধালেন, 'তুমি কোন পুণ্যলোকে যাবে?' তাঁরা ভেবেছিলেন, যে-স্বামীর কোপন স্বভাব পদে পদে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছে সেই কলহাস্পদ স্বামীর কাছে আমি যেতে চাইব না। কিন্তু আমি তাঁরই কাছে আছি। তুমি নিজের অসম্পূর্ণতার স্মরণে নিজেকে লাঞ্ছিত করো না। শব্‌নম আমারই মত তার বশিষ্ঠকে খুঁজে নেবে।"

সারা দিনমান কর্তব্যকার্য, নিত্যনৈমিত্তিক সব-কিছু করে যাই প্রসন্ন মনে, দাসী যে রকম মুনিব বাড়ির কাজকর্ম করে যায় নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে তার আপন কুঁড়েঘরে, আপন শিশুটিকে যেখানে সে রেখে এসেছে—তার দিকে। সন্ধ্যায় ত্বরিত গতিতে যায় সেই শিশুর পানে ধেয়ে—মাতৃস্তনের উচ্ছলিত-মুখ সুধারসপীড়িত ব্যাকুল বক্ষ নিয়ে—তার ওষ্ঠাধর নিপীড়নে জননীর সর্বাঙ্গে শিহরণের

সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি, তার আনন্দ-নির্বাণ।

আমিও দিবাবসানে ধেয়ে যাই আমাদের বাসগৃহের নির্জন কোণে। এখানেই আমার জন্ম, আর এ ঘরেই আমার সর্বস্ব লয়; তাই বহুকাল ধরে এ-ঘরের কথা ভাবতে গেলেই আমার দেহমন বিকল হয়ে যেত। এখন যাই সেই ঘরে, ওই মায়ের চেয়েও তড়িৎত্বরিত বেগে।

বিশ্বকর্মা যখন তিলোত্তমা গড়তে বসেছিলেন তখন সিংহ দিয়েছিল কটি, রম্ভা দিয়েছিল উরু, আর হরিণী যখন দিতে চাইলে তার চোখ, পদ্মকোরকও পেতে চাইলে সেই সম্মান, তখন নাকি বিশ্বকর্মা দুই বস্তুই প্রত্যাখ্যান করে, প্রভাতের শুকতারাকে দুই টুকরো করে গড়েছিলেন তিলোত্তমার দুটি চোখ। শব্‌নম যখন কান্দাহারে ছিল—'

জানেমন্ বললেন, 'বড় কষ্ট পেয়েছে সে তখন। অত যে কঠিন মেয়ে, সেও তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল। তারপর বল।'

আমি বললুম, 'আমাকে তখন বিশ্বকর্মার মত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ খুঁজে বেড়াতে হয় নি। তাকে স্মরণ করামাত্রই আস্তে আস্তে তার সমস্ত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। রাধার ধ্যান ছিল সহজ, কারণ তাঁর কালিয়া ছিলেন কালা, চোখ বন্ধ করা মাত্রই তাকে দেখতে পেতেন—আমার কালা যে গৌরী। কিন্তু বিশ্বকর্মার সঙ্গে আমি তুলনাস্পদ নই। কারণ তাঁর তিলোত্তমা গড়ার সময় তিনি সৃষ্টিকর, চিত্রকর। আমার চারুসর্বাঙ্গীকে গড়ার সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ। তবে হ্যাঁ, মূর্তি গড়ার সময় আমার সামনে বিলাতী ভাস্করের মত জীবন্ত মডেল থাকত না—খাঁটি ভারতীয় ভাস্করের মত প্রতিমালক্ষণানুযায়ী মূর্তিটি নির্মাণ করে সর্বশেষে তার সাম্মিলিত পদযুগলের দুই পদনখকণার উপর ধীরে ধীরে রাখতুম আমার দুই ফোঁটা চোখের জল। এই আমার বুকের হিমিকাকণা—শব্‌নম।

কিন্তু এবারে আর তা নয়। এবারে আমি মূর্তি গড়ি নে।

এবারে সে আমার মনের মাধুরী, ধ্যানের ধারণা, আত্মনের জ্যোতি।

এবারে আমার আত্মচৈতন্য লোপ পেয়ে কেমন যেন এক সর্বকলুষমুক্ত অখণ্ড সত্তাতে আমি পরিণত হয়ে যাই। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা সে নয়—অথচ সর্ব ইন্দ্রিয়ই সেখানে তন্মাত্র হয়ে আছে। কী করে বোঝাই! সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ায় বহু পরেও তাকে যখন স্মরণে এনে তার ধ্বনি বিশ্লেষণ করা যায়—এ যেন তারও পরের কথা। রাগিণী, তান, লয়, রস সব ভুলে গিয়ে বাকী থাকে যে মাধুর্য—সেই শুদ্ধ মাধুর্য। অথচ বাস্তব জগতে সেটা হয় ক্ষীণ—এখানে যেন জেগে ওঠে বানের

পর বান—গম্ভীর, করুণ, নিস্তব্ধ জ্যোতির্ময় ভূর্ভুবঃস্বঃ।

ওই তো শব্‌নম, ওই তো শব্‌নম, ওই তো শব্‌নম।

॥ আট ॥

শুধু দুটি কথা আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ জেগে থাকে।

একটি উপনিষদের বাণী :

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশো আনন্দো ন স্যাৎ।

আমার প্রথম আনন্দের দিনে হঠাৎ এটি আমার মনের ভিতরে এসেছিল—বহু বৎসর অদর্শনের পর প্রিয়জন আচমকা এসে আবির্ভূত হলে যে রকম হয়। তাকে কোথায় বসাব, কী দিয়ে আদর করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি নি। এই যে আকাশ-বাতাস, সে আনন্দে পরিপূর্ণ না থাকলে, কে একটি মাত্র নিশ্বাস নিতে পারত এর থেকে?

সেই রাত্রে আমি আমাদের বাসরঘরে যাই। শব্‌নম যেদিন চলে যায়, সেদিন কেন জানি নে তার কুরান-শরীফখানা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

প্রত্যাদেশের সন্ধানে অনেকেই কুরান খুলে যেখানে খুশি সেখানে পড়ে। আমার কোনও প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নেই। আমি এমনি খুলেছিলুম।

'ওয়া লাওলা ফদ্‌লুল্লাহি আলাইকুম্ ও রহ্‌মতুহু ফী দ্‌নিয়া ওয়াল আখিরা—'

'ভূলোক দ্যুলোক যদি তাঁর দাক্ষিণ্য ও করুণায় পরিপূর্ণ না থাকত তবে—'

তবে? সর্বকালের মানুষ সর্ব বিভীষিকা দেখেছে। তার নির্যাস—মানুষের অসম্পূর্ণতা তখন রুদ্রের বহ্নি (গজব) আহ্বান করে আনত, সৃষ্টি লোপ পেত।

মনে পড়ল, ছেলেবেলাকার কথা। দাদারা ইস্কুলে, আমার সে বয়স হয় নি। দুপুরবেলা মা আমাকে চওড়া লালপেড়ে ধুতি, তাঁরই হাতে-বোনা লেসের হাতাওয়ালা কুর্তা, আর জরির টুপি পরিয়ে সামনে বসিয়ে কুরান পড়ত। এই জ্যোতি অনুচ্ছেদটিই মার বিশেষ প্রিয় ছিল—বহু বহু বিশ্বাসীর তাই। আমার স্মরণে ছিল শুধু দুটি শব্দ 'ফদল' আর 'রহমৎ'—উচ্ছ্বসিত দাক্ষিণ্য ও করুণা। তখন শব্দ দুটির অর্থ বা অন্য কোন-কিছু বুঝি নি। আজও কি সম্পূর্ণ বুঝেছি?

*　　　　*　　　　*

আরও সহজে বলি।

বয়স তখন দশ কি বারো। চটি বাংলা বইয়ে গল্পটি পড়েছিলুম। বড় হয়ে এ গল্পটি আর কোথাও চোখে পড়ে নি।

এক ইংরেজকে বন্দী করে নিয়ে যায় বেদুইন দল। দলপতি খানদানী শেখ তার মেয়ের উপর ভার দেন বন্দীকে খাওয়াবার।

ভাষাহীন প্রণয় হয় দুজনাতে। তাই শেষটায় বল্লভের বন্দীদশা আর সে সইতে পারল না।—শবনমের লায়লী তো ওই দেশেরই মেয়ে। একদিন পিতা যখন পণ্যবাহিনী আক্রমণ করিতে বেরিয়েছেন তখন সে খাদ্য আর তেজী আরবী ঘোড়া এনে বল্লভের দিকে তাকালে। দুজনার পালানো অসম্ভব। যদি ধরা পড়ে তবে দুহিতাহরণকারীকে প্রাণ দিয়ে তার শোধ দিতে হবে—ওই একটিমাত্র আশঙ্কা ছিল বলে, সে সঙ্গ নিয়ে দয়িতের প্রাণ বিপন্ন করতে চায় নি। যাবার সময় ইংরেজ শুধু দুটি শব্দ বলে গিয়েছিল—'টম্' আর 'লণ্ডন'।

এক মাস পরে দলপতির অনুচরগণ খবর আনল, ইংরেজ বন্দরে পৌঁছতে পেরে জাহাজ ধরেছে।

সরলা কুমারী চেষ্টা করেছিল তাকে ভোলবার—বহুদিন ধরে—পারে নি।

পালিয়ে গেল সমুদ্রপারে। সেখানে প্রতি জাহাজের প্রত্যেককে বলে 'টম্'—'লণ্ডন' 'টম্'—'লণ্ডন'।

এক কাপ্তেনের দয়া হল। এ-বন্দর ও-বন্দর করে করে তাকে লণ্ডনে নামিয়ে দিল। ইতিমধ্যে মেয়েটি ওই দুটি শব্দ ছাড়া আর এক বর্ণ ইংরিজী শেখে নি—সে কাউকে সঙ্গ দিত না। ওর দিকে কেউ তাকালে কিংবা প্রশ্ন শুধালে ম্লান হাসি হেসে বলত, 'টম্'—'লণ্ডন'।

সেই বিশাল লণ্ডনের জনসমুদ্র। তার মাঝখান দিয়ে চলেছে একাকিনী বেদুইন-তরুণী। মুখে শুধু 'টম্'—'লণ্ডন'। কত শত টম্ আছে লণ্ডনে, কে জানে, কত কোণে, কিংবা অন্যত্র, কিংবা ফের বিদেশে চলে গিয়েছে আমাদের টম্।

হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে আসছে টম্। চোখোচুখি হল। দুজনা ছুটে গিয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করলে—সেই সদর রাস্তার বুকের উপর।

ঠিক তেমনি একদিন আসবে না শবনম?

সে কি আমাকে বলে যায় নি, 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।'

॥ তামাম্ শুদ্ ॥